# খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত

অমিয়ভূষণ মজুমদার

বাক্‌শিল্প
১৭সি, তেলিপাড়া লেন, কলকাতা ৭০০ ০৩১

জুন ১৩৭০

প্রকাশনা : তৃষ্ণা খাঁ
বাক্‌শিল্প
১৭-সি তেলিপাড়া লেন
কলকাতা ৭০০ ০৩১

মুদ্রণ : পৃথ্বীশ সাহা
অমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্প : বিপুল গুহ

এতে আছে

# ভালবাসার অন্ধকারে

জীবনে কোন মুহূর্তে হঠাৎ কী যে ঘটে যায়, আগে থেকে আঁচ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষ যেন আজীবন অন্ধকারে পথ হাঁটছে। আশপাশের অস্পষ্টতা থেকে তবু তো কিছু আন্দাজ করে নেওয়া যায় এবং সেইমতো জীবনটাকে গুছিয়ে নেওয়া চলে। কিন্তু সামনে অদূরে কী কাছে, কিছুই জানা নেই। হঠাৎ হয়তো খাদে পড়ে সে তলিয়ে যায় চিরকালের মতো।

গার্গীর জীবনে এক শরৎকালের দুপুরবেলায় সেই রকম একটা পতন ঘটে গেল। এই হঠকারিতার জন্য সে এতটুকু প্রস্তুত ছিল না। তাই আত্মরক্ষার সহজাত বোধকে সে কাজে লাগাতে পারল না। নিঃসহায় আত্মসমর্পণ করতে হলো তাকে একটা অনিবার্যতার কাছে।

অনিবার্যতা? পরে অবশ্য তাই মনে হয়েছিল গার্গীর। আরও অনেক কিছু মনে হয়েছিল। চোর পালালে গেরস্থের বুদ্ধি বাড়ে বলে একটা কথা আছে। কিন্তু তখন আর পস্তানিতে লাভ নেই। শুধু নিজের ওপর রাগে জ্বলে মরা ছাড়া কিছু করার নেই। অথচ ভালবাসার পথ এমনি পিছল যে আছাড় না খেয়েও নিস্তার নেই যেন।

নতুন টাউনশিপের শেষদিকটায় গঙ্গার ধারে ছড়ানো-ছিটোনো সব সরকারি কোয়ার্টার। নিচু বাঁধের ওপর গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের সূত্রে বনদফতর থেকে লাগানো গাছপালা জঙ্গল হয়ে আছে। খানিকটা দূরে পুরনো শিবমন্দির আর শ্মশান। গার্গীদের কোয়ার্টারটা বাঁধের কাছাকাছি। পেছনে এলোপাতাড়ি ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা ছাতিম গাছ দাঁড়িয়ে আছে। জানালা থেকে ছাতিম গাছটা দেখা যায়। সেই গাছের তলায় একা গৌতমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গার্গী একটু অবাক হয়েছিল।

এখানে আসার পর থেকে গার্গী গাছটার অনেক বদনাম শুনেছে। কোন এক পানু চক্কোত্তির বউ কবে ওই গাছে ঝুলে প্রাণ দিয়েছিল। রাতবিরেতে প্রেতিনী ঠাকরুনকে নাকি মাঝেমাঝে দেখা যায়। চাঁদতারণ সিঙ্গির মেয়ে বিনু নাকি দিনদুপুরেই তাকে দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর থেকে ঠাকরুনের ভূত তাকে পেয়ে বসেছে। অনেক ওঝা-হোমিওপ্যাথি করে শেষে গার্গীর স্বামী ঘনশ্যামের তাগিদে তাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘনশ্যাম এই কাঁটালিয়াঘাটে নতুন মানসিক হাসপাতালের ওয়েলফেয়ার অফিসার! বহরমপুর থেকে মাস তিনেক আগে এখানে বদলি হয়ে এসেছে সে। গার্গীকে সে পইপই করে সাইকোলজি বোঝায়। ভূতপ্রেত বলে কিছু থাকতে পারে না। এই রোগকে বলে হিস্টিরিয়া।

ঘনশ্যাম একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। শ্যামবর্ণ মাঝারি গড়নের সাধারণ চেহারা। রোগা দেখালেও হাড়ের কাঠামো শক্ত। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। গার্গীর চেয়ে প্রায় বছর দশেকের বড়। গার্গী ছিপছিপে গড়নের যুবতী। গায়ের রঙ ফর্সা। চোখে পড়ার মতো লালিত্য তাকে ঘিরে আছে। সে উত্তর কলকাতায় বড় হয়েছে। বারাসাতের ঘনশ্যামের মতো একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিয়ে এবং এই মফস্বলী জীবনযাত্রা তার স্বপ্নে ছিল না! কিন্তু গরিব স্কুলশিক্ষকের মেয়ের এটাই ভাগ্য। এই ভাগ্যকে সে কালক্রমে মেনে নিয়েছে। বিয়ের পর বহরমপুরে গিয়ে বছরখানেক মোটামুটি মন্দ লাগেনি। শহরের পরিবেশ ছিল। কিন্তু কাঁটালিয়াঘাট নতুন টাউনশিপ। এখনও এর গা থেকে গ্রামের গন্ধ ঘোচেনি। আর এই নিরিবিলি প্রত্যন্ত এলাকা। সরকারি কোয়ার্টারের বাসিন্দাদের মধ্যে পরস্পর কেমন যেন ঈর্ষা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতা থাকে। ঘনশ্যামের ডেজিগনেশনে 'অফিসার' শব্দটা থাকলেও সে এত সাদাসিধে আর অতিসাধারণ মানুষ, দরকার ছাড়া তাঁকে কেউ পাত্তা দেয় না বিশেষ। আর গার্গী যে মন খুলে কারও সঙ্গে মিশবে, তাতে বাধা তার নিজেরই স্বভাব। প্রতিবেশিনীদের কথাবার্তা চালচলন তার একটুও পছন্দ হয় না। সবাই টিভি, ফ্রিজ, শাড়ি, গয়না এবং স্বামীদের সরকারি গাড়ির গৌরবে আটখানা। গার্গীর গোপন দুঃখ এখানেই। ঘনশ্যাম একটু কিপটে স্বভাবের লোক। কিস্তিতেও অন্তত একটা টিভি কিনতে পারত। সে সারাদিন হাসপাতাল অফিসে থাকবে এবং তার বউ কেমন করে সময় কাটাবে, এ নিয়ে তার চিন্তাভাবনা আছে বলে মনে হয় না। ওই একটা ট্রানজিস্টার কবে কিনেছিল। সেটাই জানালার ধারে বসে বাজায় গার্গী। এতোল-বেতোল ভাবনা ভাবে।

এদিন দুপুরে ছাতিমতলায় গৌতমকে দেখে সে ট্রানজিস্টারের শব্দ কমাল। গৌতম অন্যদিকে ঘুরে সিগারেট টানছে। গৌতমকে এতদিন ধরে দেখে আসছে গার্গী, অথচ যেভাবে দেখল, এটা যেন একটা আবিষ্কার। ফিল্মের হিরোরা ঠিক ওই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে—কিন্তু ঠিক এই বোধটা নয়, হঠাৎ মনে হলো গার্গী একটা অপার্থিব সৌন্দর্য দেখছে। প্রকৃতি মানুষকে কাছে পেলে কি এমনি করে বদলে দেয়? গার্গীর মনে একটা চাপা ছটফটানি জাগল। কেন এদিকে তাকাচ্ছে না গৌতম?

গৌতমের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ঘনশ্যামই। তার হাসপাতালের বস সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তারের একমাত্র ছেলে। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ে। এটা তার শেষ বছর। পুজোর ছুটিতে এখানে এসেছে মাত্র দিন পনের আগে। সে এখানে এলেই টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। এদিকটা নিরিবিলি এলাকা। কোয়ার্টারের পেছনদিকটায় দৈবাৎ তাকে দেখতে পেয়েই ঘনশ্যাম ডেকেছিল। গৌতম আলাপী স্বভাবের ছেলে। ঘনশ্যাম ভেতরে না ডাকলেও সে সটান ঢুকে পড়েছিল। অগত্যা ঘনশ্যাম বসের ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় গার্গীর। আর সেই আলাপ থেকেই প্রায় গৌতম ঘনশ্যাম থাক বা না-ই থাক কোয়ার্টারে, সোজা চলে আসে। সে প্রথম-প্রথম বৌদি বলে ডাকত ঘনশ্যামের অনুপস্থিতিতে। হঠাৎ একদিন একটু হেসে বলে উঠেছিল, "বৌদি বলার মানে হয় না আপনাকে। বয়সে আমার সমান বলেও তো মনেই হয়

না। আপনি এইটুকু মেয়ে। আপনি-টাপনিটা বড্ড বাজে। দূরত্বের সৃষ্টি করে। তুমি বলব—আপত্তি আছে?"

গার্গী আস্তে বলেছিল, "নাহ্।"

"এবং শ্যামদার অ্যাবসেন্সে নাম ধরেই ডাকব।"

গার্গী মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে একটু পরে বলেছিল, "ডাকবেন।"

"গার্গী! ডাকবেনটা উইথড্র করো।"

গার্গীর বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। তারপর সে সামলে নিয়েছিল। একটু নার্ভাস হেসে বলেছিল, "করলুম।"

এমনি করেই গার্গীর জীবনে একটা ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল সেদিন। ঘনশ্যাম কোনও-কোনও দিন দুপুরে খেতে এসে দেখত গৌতম ও গার্গী গল্প করছে। কিন্তু তার হাবভাবে বোঝা যেত না সে কিছু সন্দেহ করছে। কোনওদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরেও দেখত গৌতম ও গার্গী কোয়ার্টারের পেছনে ঘাসে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। গৌতম বলত, "চলুন শ্যামদা, বৌদিকে নিয়ে তিনজনে গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি।"

ঘনশ্যাম বলত, "বড্ড টায়ার্ড ভাই। বরং তোমরা যাও। ঘুরে এস। তোমার বৌদির তো ঘরে বসে থেকে দম আটকে যায়। একটু ঘোরাঘুরি করলে রিলিফ পাবে।"

এভাবে একদিন ঘনশ্যাম তাদের সিনেমা দেখতে যেতেও তাগিদ দিয়েছিল। গার্গী স্বামীর মধ্যে কোনও ভাবান্তর টের পায় না। রাতের শয্যায় একই আদর-ভালবাসার তাল কাটে না। অথচ মাঝেমাঝে গার্গীর মনে হয়েছে, কেন তার স্বামী তাকে সন্দেহ করছে না? কেন এমন অবাধ মেলামেশায় বাধা দিচ্ছে না? এ কি চাকরির স্বার্থে বসকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বসের ছেলেকে এমন প্রশ্রয় দেওয়া? গার্গীর গৌতমকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হতো, তার বাবার কাছে ঘনশ্যাম গৌতমকে কোনও সুপারিশ করতে বলেছে কি না? কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে বেধেছে।

তবে এতগুলো দিন অবাধ মেলামেশা সত্ত্বেও গৌতম গার্গীকে ছোঁয়নি বা কোনও ভালবাসার সংলাপও উচ্চারণ করেনি। শুধু দু'দিন আগে সন্ধ্যায় গঙ্গার ধার থেকে ফেরার সময় গৌতম আলতোভাবে তার একটা হাত হাতে নিয়েই ছেড়ে দিয়েছিল। গার্গীর বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। তারপর কতক্ষণ ধরে সঙ্গীতের সুরের মতো একটা সূক্ষ্ম অনুরণন স্নায়ুকোষে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছিল। সে-রাতে ঘনশ্যাম যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, গার্গী জেগেই ছিল। হঠাৎ মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল; গৌতম তত সাহসী নয় কেন? অথবা এ তার একটা নিছক খেলা! নাকি সে চাইছে গার্গী তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে? নাহ্, গার্গী অত সস্তা নয়। মনে মনে রাগে জ্বলে উঠেছিল গার্গী।

এদিন দুপুরে একটু আগে ঘনশ্যাম খেয়ে অফিসে ফিরে গেছে। গার্গী খাওয়ার পর ফ্যানের নিচে ভিজে চুল শুকিয়ে কপালে একটা টিপ পরেছে। সিঁথিতে এক চিলতে সিঁদুর দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে তার বুকের ভেতর একটা চাপা যন্ত্রণা টের পেয়েছে। কী নিঃসঙ্গ এই জীবন! এই প্রায়-গ্রাম্য জঙ্গুলে পরিবেশে তাকে

কাটাতে হচ্ছে। গৌতম না থাকলে তার জীবনে বেঁচে থাকার মানেটাই হারিয়ে যেত যেন।

কিন্তু গৌতমের ছুটি ফুরিয়ে এলে সে তো কলকাতা চলে যাবে। তারপর? আবার সেই একলা হয়ে থাকা কষ্টকর দিন ও রাতের একঘেয়েমি! ওই ছাতিম গাছে ঝুলে মরতে ইচ্ছা করে গার্গীর পানু চক্কোত্তির সেই বউটার মতো!

জানালার ধারে বসে গৌতমকে দেখে গার্গী নিজের অজ্ঞাতসারে একটা হঠকারিতায় আক্রান্ত হয়েছিল। ট্রানজিস্টারের শব্দ হঠাৎ সে খুব বাড়িয়ে দিল গৌতমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই।

তখন গৌতম এদিকে তাকাল। তারপর সোজা আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে জানালার ধারে চলে এল। গার্গী ট্রানজিস্টার বন্ধ করে দিল। সে মুখ টিপে হেসে বলল, "ওখানে কী করছিলে? কোনও হিরোইনের জন্য ওয়েট করছিলে বুঝি?"

গৌতম হাসল, "আমার হিরোইন তো তুমি!"

"বাজে কথা বলো না!" গার্গী কপট রাগ দেখাল। "নিশ্চয় কারও জন্য ওয়েট করছিলে!"

"করছিলুম, সেটা ঠিক। দরজা খোলো, বলছি।"

গার্গী বসার ঘরের দরজা খুলে দিলে গৌতম শোবার ঘরে চলে গেল। খাটে বসে রুমালে মুখের ঘাম মুছল। গার্গী দরজা বন্ধ করে এ ঘরে এল। গৌতম বলল, "এক গ্লাস জল দাও।"

গার্গী বাঁকা হাসল। "দিচ্ছি। আগে বলো কার জন্য—"

গৌতম তার কথার ওপর বলল, "তোমাকে আজ এত সেক্সি দেখাচ্ছে কেন গার্গী?"

"কী দেখাচ্ছে!"

"অসাধারণ সুন্দরী।"

"শাট আপ্!"

"কী আশ্চর্য! সত্যি কথাটা বললুম, অমনি শাট আপ্? যাও, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে। তপুর জন্য একঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি। ওর পাত্তা নেই। কে জানে, পুলিশের পাল্লায় পড়ল নাকি।"

গার্গী একটু অবাক হয়ে বলল, "তপু কে?"

"আহ্! আগে জল দাও।"

গার্গী রান্নাঘরে যখন জল আনতে গেল, তার শরীর জুড়ে একটা অস্থিরতা। গৌতমের 'তোমাকে আজ এত সেক্সি দেখাচ্ছে কেন' এই কথাটা তানপুরার মতো ঝংকৃত হচ্ছিল মনে। কুঁজো থেকে জল ঢালবার সময় তার হাত কাঁপছিল। খানিকটা জল মেঝেয় ছলকে পড়ল। সে ঠোঁট কামড়ে ধরল। কী এক সাংঘাতিক ঘটনার দিকে যেন তার নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল।

তার হাত থেকে জলের গ্লাস নিয়ে গৌতম বলল, "তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?"

গার্গী কোন জবাব দিল না।

গৌতম জল খেয়ে গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলে রাখল। তারপর গার্গীর হাত ধরে টেনে তাকে খাটে বসিয়ে দিল। আস্তে বলল, "তোমাকে বলা উচিত।" একটু হাসল সে। "আমার ধারণা, তোমার পেটে কথা থাকে। না, না—রাগ কোরো না। বলতে চাইছি, তোমাকে বিশ্বাস করা যায়।"

গার্গী বাঁকা হাসল। "এত ভূমিকার দরকার কী? আমি শুনতে চাইনে।"

"একটু আগে শুনতে চাইছিলে।" গৌতম চাপা স্বরে বলল, "শুনতে না চাইলেও হঠাৎ মনে হলো, তোমাকে বলা উচিত। কারণ তোমার সাহায্য দরকার।"

এবার গার্গী একটু আগ্রহ দেখিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, "কী ব্যাপার?"

"তুমি তপনকে চেনো না বললে, শুনে অবাক লাগছিল। এখানে ওকে সবাই চেনে। এক সময় পলিটিক্স করত। এখন ভোটের পলিটিক্সে মার্সেনারি যোগান দেয়।"

"মার্সেনারি মানে?" বলেই গার্গী একটু হাসল। "ও! তুমি ওই গুণ্ডাটার কথা বলছ? তোমার শ্যামদার কাছে শুনেছি, ওদের কাছে হসপিট্যালের দামি-দামি ওষুধ পাচার করে স্টাফরা। ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। পুলিশ নাকি ওদের হাতে।"

গৌতম গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি প্রব্লেমে পড়ে গেছি। তপু যত খারাপ ছেলে হোক, খুব আলাপি। ওর মধ্যে বন্ধুত্ব করার মতো অনেক গুণ আছে। তা ছাড়া শিক্ষিত ছেলে। গ্র্যাজুয়েট। বাবা এখানে ট্রান্সফার হয়ে আসার পর তপুর সঙ্গে আমার আলাপ। এখন মনে হচ্ছে আলাপ না হলেই ভাল ছিল।"

গার্গী অস্থির হয়ে বল, "আহ্! আসল কথাটা বলবে তো?"

গৌতম আস্তে বলল, "কোন সোর্সে তপু খবর পেয়েছে, ওদের বাড়িতে পুলিশ রেড হবে শিগগির যে-কোনও সময়ে। আসলে ওর কোনো রাজনৈতিক দাদা কী কারণে চটে গেছে! পুলিশকে প্রেশার দিচ্ছেন ভদ্রলোক। তপুর একটা বিদেশী রিভলভার আছে। ক'দিনের জন্য ওটা সে আমার কাছে লুকিয়ে রাখতে চায়। এখন প্রব্লেম হলো, আমি ওকে না করতে পারিনি। আজ দুপুর বারোটা একটার মধ্যে ওটা তার আমাকে ওই ছাতিমগাছটার ওখানে দিয়ে যাবার কথা। একটা বেজে গেছে। তবু এল না। হয় তো কোনও কারণে দেরি করছে। আমি যাই।" গৌতম উঠে দাঁড়াল। "গার্গী, যদি তপু ওটা আমাকে দেয়, আমি তোমার কাছে বরং লুকিয়ে রাখতে চাই। রাখবে লক্ষ্মীটি? আমাদের বাড়ির ব্যাপার তো জানো!"

গার্গী ওর হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল খাটে। "ছাড়ো! একটা অব্দি ওয়েট করতে বলেছিল। তুমি করেছ। তোমাকে ও তো আর দোষ দিতে পারবে না।"

"কিন্তু—"

বাধা দিয়ে গার্গী বলল, "কিন্তু কিসের? ওসব বাজে ঝামেলায় পড়তে যেও না আর।"

গৌতম হাসল। "বাজে ঝামেলা তোমার এখানেও কম নয়!"

"তার মানে?"

"তোমাকে দেখে ভূ

"একদম অসভ্যতা করবে না বলে দিচ্ছি।"

"গার্গী, তুমি জানো না তুমি কত সুন্দর।"

"হুঁ, আমি ডানাকাটা পরী!"

গৌতম হঠাৎ তার দু'কাঁধ ধরে তাকে কাছে টানল। গার্গী মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ার আগেই সে তাকে চুমু খেল। কয়েক মুহূর্তের আচ্ছন্নতা। গার্গী তারপর আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মন আর শরীর যেন আলাদা হয়ে গিয়েছিল। নিবিড় চুম্বনের এই অমর্ত্য স্বাদ তার জীবনে প্রথম। পুরুষের বুকের এই উত্তাপও কখনও এমন করে সে টের পায়নি। এই চুম্বনের উন্মাদনা তাকে অবশ করে দিচ্ছিল। একটু পরে সে জড়ানো গলায় কোনও ক্রমে উচ্চারণ করতে পারল, "আহ্! জানালা-দরজা খোলা!"

গৌতম উঠে গিয়ে উত্তরের খোলা জানালাটা বন্ধ করে দিলো। তারপর দরজা বন্ধ করতে গিয়ে শুনল, গার্গী চাপা আর্তস্বরে বলছে, "আহ্! ও কী করছ তুমি?"

দরজা বন্ধ করে গৌতম গার্গীর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এক শরৎকালের উজ্জ্বল দুপুরে এভাবে যে আকস্মিকতা ঘটে গেল, কিছুক্ষণ গার্গীর কাছে তা পতন বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু মানুষের শরীরে প্রকৃতি কী ঐশ্বর্য থরেবিথরে সাজিয়ে রেখেছে, এই পঁচিশ বছর বয়সে তার প্রথম অনুভূতি গার্গীকে আবিষ্ট করেছিল। সে বুঝতে পারছিল, স্বামীর কাছে এভাবে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারেনি। এমন নিঃশেষে চরম আত্মসমর্পণের মধ্যেই যেন নারীর যৌবনের সার্থকতা।

শেষ মুহূর্তে গভীর আশ্লেষে আর দুরন্ত আবেগের ঘোরে সহসা গার্গী অনুভব করল, তার মধ্যে এতদিন ধরে মাতৃত্বের গোপন কাকুতি ছিল। সেই কাকুতিই কি তাকে এই হঠকারিতায় পৌঁছে দিল?

ঘরের ভেতর আবছা আঁধার। গার্গীর নগ্ন শরীরের সবখানে গৌতমের উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ। জড়ানো গলায় গার্গী স্খলিত ও আর্তস্বরে অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, "আমি মরে যাব গৌতম! এবার ছাড়ো!"...

কিছুক্ষণ পরে গৌতম বেরিয়ে গেল।

গার্গী বন্ধ জানালাটা খুলতে সাহস পেল না। সে কাঁপা-কাঁপা হাতে চুল আঁচড়ে ঘষে যাওয়া টিপটা মুছে আবার পরল। ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে শরীর শুকিয়ে নিল। তারপর ট্রানজিস্টারটা আস্তে চালিয়ে বারান্দায় গেল। কেউ লক্ষ্য করেনি তো? একটু দ্বিধার সঙ্গে সে বাথরুমে ঢুকল।

গার্গীর মনে হচ্ছিল একটা নতুন শরীর সে পেয়েছে, যার সঙ্গে আগেরটার কোনও মিল নেই। সেই নতুন শরীরের সঙ্গে পুরনো মনকে মেলানো যাচ্ছে না। পুরনো মন বারবার বলছে, গার্গী! এ তুই কী করলি? তার নতুন মন এসে বলছে, বেশ করেছি। আমার খুশি।

ঘরে ঢুকে সে খাটের বেডকভার নতুন করে পাতল। তারপর শুয়ে পড়বে ভাবল সেই সময় উত্তরের জানালায় খট্খট্ শব্দ হলো। গার্গী বলল, 'কে?"

গৌতমের সাড়া এল। "শিগগির খোলো!"

গার্গী উঠে গিয়ে জানালা খুলে দেখল, গৌতম একটা জুতোর বাক্স হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে বাক্সটা জানালা গলিয়ে ভেতরে ঢোকাল। বলল, "এটা খাটের তলা-টলায় লুকিয়ে রাখো। তপু এসেছিল।"

বলেই সে চলে গেল। গার্গী দড়িবাঁধা বাক্সটা খুলতে গিয়ে খুলল না। খাটের তলায় ঢুকিয়ে রাখল। আজ থেকে নিজেকে তার মরিয়া ও সাহসী লাগছিল। এতক্ষণে সে খেতে গেল কিচেনে।...

## ॥ দুই ॥

ঘনশ্যাম কোনও-কোনও দিন দেরি করে বাড়ি ফেরে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সে ইঞ্জেকশন দেওয়ার কল অ্যাটেন্ড করতে যায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি। সে ডাক্তার নয়। কিন্তু ডাক্তার-হাসপাতালের সংসর্গে ওষুধপত্র এবং ইঞ্জেকশনের অভিজ্ঞতা আছে তার। গার্গী বোঝে, ঘনশ্যাম বাড়তি রোজগারের ধান্দায় থাকে। কখনও তার এমন সন্দেহও হয়েছে, তার স্বামী হাসপাতালের ওষুধ-পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত কিনা। কিন্তু ঘনশ্যাম এমন সিরিয়াস প্রকৃতির মানুষ, তাকে জিজ্ঞেস করতেই বাধে গার্গীর। তা ছাড়া ঘনশ্যামের হাবভাব বা কথাবার্তায় কোনও লুকোচুরির ছাপ সে এ পর্যন্ত লক্ষ্য করেনি।

এদিন বিকেলে গার্গী মনে মনে গৌতমের প্রতীক্ষা করছিল। জীবনে প্রথম ভালবাসা তীব্র মাদকতাময় প্রতীক্ষা। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে গেল, গৌতম এল না। হঠকারিতার জন্য সে কি লজ্জা পেয়েছে? গার্গী অস্থির হয়ে ঘর-বার করছিল। সন্ধ্যার মুখে ঘনশ্যাম বাড়ি ফিরল। বলল, "ভেবেছিলুম, আমার দেরি দেখে বেড়াতে বেরিয়েছ। গৌতম আসেনি?"

গার্গী ঝাঁঝালো স্বরে বলল, "না। সবসময় খালি গৌতম-গৌতম কোরো না তো!"

"কী আশ্চর্য!" ঘনশ্যাম একটু হাসল। মুখে ক্লান্তির ছাপ। "ইয়ে—এক কাপ চা পেলে ভাল হতো।"

"এমন করে বলছ কেন? কোনও দিন আমি চা করে খাওয়াই না?" গার্গী চটে গেল।

ঘনশ্যাম বারান্দায় একটা চেয়ার এনে বসে বলল, "আজ বড্ড ঝামেলা গেল। গ্রাম থেকে একটা মেন্টাল পেশেন্ট এসেছিল। সে এমন ভাঙচুর শুরু করল, আটকানো কঠিন! আমাকে বোতল ছুঁড়েছিল। একটুর জন্য বেঁচে গেছি। সেই নিয়ে—তারপর এদিকে এক কাণ্ড। হরুবাবুর ইনসমনিয়া। ঠিক ঘুমের ওষুধ নয়, নার্ভ ঠাণ্ডা রাখার জন্য ট্র্যাংকুলাইজার দিতুম। কাল দিয়েছিলুম নাইট্রাজেপাম। ১০ মিলিগ্রাম। ভদ্রলোক দুটো ট্যাবলেট খেয়ে কেলেংকারি করে বসেছিলেন। আসলে আনঅফিসিয়াল ডাক্তারি করার বিপদ আছে।"

গার্গী কিচেনের বারান্দায় একটা টেবিলে কুকার জ্বেলে কেটলি চাপাচ্ছিল। কথাগুলো শুনে বলল, "কী হয়েছে হরবাবুর?"

"হয়নি। হতে পারত। খামোকা হরুবাবুর ভাইপো তপু আমাকে গালমন্দ করল।"

"তপু?" গার্গী চমকে উঠেছিল। "সেই গুণ্ডাটা?"

ঘনশ্যাম শ্বাস ছেড়ে বলল, "হ্যাঁ! ছেড়ে দাও। দেশে আইন-কানুন বলে তো আজকাল কিছু নেই। আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য, গায়ে হাত তোলেনি।"

গার্গী ফুঁসে উঠল। "তপুকে ইচ্ছে করলে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি জানো?"

ঘনশ্যাম তাকাল।

গার্গী চাপা স্বরে বলল, "চা খেয়ে নাও, সব বলছি।"

ঘনশ্যামের যেন কোনও ব্যাপারে কৌতূহল নেই, গার্গী বরাবর দেখে আসছে! ওর কেঠো নীরস চেহারার মতো যেন ওর মন। তবে নিজের কথাটা বেশি করেই বলার স্বভাব আছে। অন্যের কথায় তত কান করে না।

একটু পরে চায়ের কাপ ওর হাতে তুলে দিয়ে গার্গী আস্তে বলল, "তুমি এত গৌতম গৌতম করো। গৌতমের খাতিরেই জিনিসটা নিতে হলো। কী জিনিস জানো?"

ঘনশ্যাম আবার নিষ্পলক চোখে তাকাল শুধু।

গার্গী ফিসফিস করে বলল, "তপুর রিভলভার। একটা জুতোর বাক্সয় ভরে গৌতম দিয়ে গেল। খাটের তলায় লুকিয়ে রেখেছি।"

"রিভলভার?"

"তাই বলল গৌতম। তপুদের বাড়িতে নাকি পুলিশ-রেড হবে।" গার্গী দম নিয়ে বলল, "আমি সাহস পাইনি খুলে দেখতে। তুমি দেখবে তো দেখ গিয়ে। আর শোন! গৌতমকে বলে দিও, এভাবে যেন কক্ষণো—"

ঘনশ্যাম কেমন হাসল। "ছেড়ে দাও। গৌতম ভাল ছেলে। রেখে গেছে। নিয়ে যাবে'খন।"

বাড়িতে বেআইনি সাংঘাতিক একটা চোরাই জিনিস থাকলে সব নিরীহ মানুষের মনে একটা দুরুদুরু ভয় আর উৎকণ্ঠা থাকা স্বাভাবিক। গার্গীর মনে সেটা ছিল না, তা নয়। কিন্তু গৌতমের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ আর নিষিদ্ধ ভালবাসার গোপন সুখ সেটা চাপা দিয়ে রেখেছিল। ঘটনাটা ঘনশ্যামকে ঝোঁকের বশে বলে ফেলে সে গৌতমের ওপর রাগ দেখিয়ে আসলে কৈফিয়ত দিতেই চেয়েছিল। কিন্তু ঘনশ্যামের এই নির্বিকার ভাব তাকে আশ্বস্ত করল।

তবু গার্গী না বলে পারল না, "গৌতম যদি এত ভাল, তা হলে গুণ্ডাদের সঙ্গে মেশে কেন? আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।"

ঘনশ্যাম চায়ে চুমুক দিয়ে ফের সেইরকম কেঠো হাসি হাসল। "যখন ওটা নিয়েই ফেলেছ, তখন আর ভয় কিসের? জেনেশুনেই তো নিয়েছ।"

"কী করব?" গার্গী আবার ঝাঁঝালো স্বরে বলল, "তোমার খাতিরের লোক। তুমি ওকে পাত্তা দাও বলেই—এখন তো বেশ বলছ! যদি ওকে না করে দিতুম, তুমি বলতে—"

ঘনশ্যাম বলল, "ছেড়ে দাও।"

গার্গী স্বামীর এতখানি নির্বিকার আচরণ আজ সহ্য করতে পারছিল না। "না

তুমি শোনো, ওকে ডেকে নিয়ে এস। ওটা নিয়ে যেতে বলো। যদি কোনওভাবে পুলিশ জেনে যায়, কী হবে বুঝতে পারছ? সেই দুপুর থেকে আমি তোমার পথ তাকাচ্ছি তুমি এলে আপদটা বিদায় করব ভেবে। না, না! তুমি এক্ষুণি যাও। ওকে বুঝিয়ে বলো, অন্যকে খামোকা বিপদের মুখে ফেলে দেওয়া কি ভাল?"

ঘনশ্যাম গা করল না। আস্তেসুস্থে চা খেয়ে সিগারেট ধরাল। তারপর একটু হাসল। "কৈ, চলো তো জিনিসটা দেখি।"

গার্গী দ্রুত ঘরে ঢুকে খাটের তলা থেকে জুতোর বাক্সটা বের করল। মশার উৎপাতের জন্য সব জানালা বন্ধ। ঘনশ্যাম ঘরে ঢুকলে সে দরজাটাও বন্ধ করে ফ্যান চালিয়ে দিল। ঘরে ষাট ওয়াট বাল্বের আলো। বলল, "তুমি খুলে দেখ। আমার ভয় করছে। সাবধানে খুলবে কিন্তু! যদি গুলি বেরিয়ে যায়, কেলেংকারি হবে।"

ঘনশ্যাম দড়িটা সাবধানেই খুলল। তারপর বাক্সটা খুলতেই দেখা গেল, ভেতরে দুটো বুট জুতো ঠাসাঠাসি করে রাখা।

গার্গী একটু অবাক হয়ে বলল, "জুতো! তবে যে গৌতম বলল—" বলেই সে হেসে ফেলল। "গৌতমের চালাকি! কোনও মানে হয়? মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে গেল। সবসময় স্টান্ট আর দুষ্টুমি।"

ঘনশ্যাম একটা জুতো বের করে ভেতরে হাত ভরল। তারপর একটা রুপোলি ছোট্ট আগ্নেয়াস্ত্র বের করল। গার্গী চমকে উঠে তাকিয়ে রইল। ঘনশ্যাম খুঁটিয়ে অস্ত্রটা দেখে আস্তে বলল, "চীনা রিভলবার।"

শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে গার্গী বলল, "কী করে বুঝলে?"

"এই যে চীনা ভাষায় কী সব লেখা আছে। হ্যামার নেই। কাজেই অটোমেটিক।" বলে সে গুলির কেসটা অনেক টেপাটেপি করে খুলল। কেসে গুলি ভরা নেই। কেসটা বন্ধ করে সে অন্য জুতোয় হাত ভরে কাগজের একটা মোড়ক বের করল। মোড়কের ভেতর অনেকগুলো খুদে গুলি। নেলপালিশের শিশির গড়ন। মাথায় সূচালো কালো একচিলতে জিনিস দেখিয়ে সে বলল, "এই কালচে অংশটা দেখছ, এটাই আসল গুলি। সিসের টুকরো। ট্রিগার টানলে এইটে বেরিয়ে যায়। মানুষের গায়ে লাগলে কী হয় জানো? মাংসের ভেতর ঢুকে চক্কর মেরে বেড়ায়। স্পীড শেষ হলে একখানে আটকে থাকে।"

গার্গী রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। বলল, "তুমি কী করে জানলে গো?"

তার কণ্ঠস্বরে ছটফটানি ছিল। ঘনশ্যাম একটু হাসল। "আমার এক ক্লাসফ্রেন্ড শ্যামল বউবাজার থানায় পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিল। আমার তো জানো সব তাতে আগ্রহ আছে। পিস্তল কাকে বলে, রিভলভারই বা কাকে বলে, সব বুঝিয়ে দিয়েছিল। পিস্তলে আঠারোটা পর্যন্ত গুলি থাকে। কিন্তু পিস্তলের গুলি বডিতে সোজা ঢুকে যায়। আর রিভলভারের নলের ভেতরটা ঘোরানো স্ক্রুর প্যাঁচের মতো। তাই গুলি ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে গিয়ে বডিতে ঢোকে। ঢুকেও কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়।"

"চুপ করো! আমার ভয় করছে।" গার্গী ব্যস্তভাবে বলল। "যেমন ছিল, তেমনি রেখে দাও। আর শোনো, এক্ষুণি গিয়ে গৌতমকে ডেকে আনো।"

ঘনশ্যাম বাক্সটা আগের মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে বলল, 'গৌতম কি আমাকে কিছু বলতে বারণ করেছিল?"

"না। জানালা দিয়ে বাক্সটা ঢুকিয়ে রাখতে বলল। তোমার কথা কিছু বলেনি।"

"থাক। রেখে দাও। ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। নিয়ে যাবে'খন।"

গার্গী বাক্সটা খাটের তলায় লুকিয়ে রেখে দরজা খুলে দিল। ঘনশ্যাম খাটে বসে সিগারেট টানতে থাকল। মুখে একই নির্বিকার উদাসীন ভাব।

গার্গী তাকে লক্ষ্য করছিল। একটু পরে বলল, "তুমি এখন কিছু খাবে?"

"নাহ্। ঘাটবাজারে নরেনের পাল্লায় পড়ে দুটো সিঙাড়া খেয়েছি।" ঘনশ্যাম হাত বাড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে দিল। বলল, "নরেনেরও একই প্রব্লেম। এখান থেকে ট্রান্সফার হতে পারলে বেঁচে যায়। ওদের হেলথ সেন্টারে ইউনিয়নবাজি। তার ওপর মস্তানদের গ্যাংয়ের হামলা। পরশু একটা ইনজুরি কেসের পেশেন্ট মারা গেল। তাই নিয়ে ভাঙচুর মারধর। আজকাল ল অ্যান্ড অর্ডার বলে কিছু নেই।"

ঘনশ্যাম হাসপাতালের গল্প করতে লাগল। রোজ তা-ই করে। গার্গীর মনে হয়, একটা রোবোটের সঙ্গে সে সংসার করছে। কোনও আবেগ নেই। জীবনের উত্তাপ নেই। এমন কি, রাতের শয্যায় শরীরে শরীর মেলানোর যে জৈব উন্মাদনা, তাও ঘনশ্যামের মধ্যে যেন নেই। খাওয়া-দাওয়া, অফিস যাওয়া ও ফিরে আসা বা জীবনযাপনের আরও অনেক রীতির মধ্যে তার যে রুটিনবাঁধা আচরণ, দাম্পত্য জীবনেও তা-ই। এ-রাতে স্বামীর পাশে শুয়ে সহসা গার্গীর মনে পতনের পাপবোধ জেগে উঠেছিল, এবং অনুশোচনায় আক্রান্ত গার্গী মনেপ্রাণে চাইছিল, তার স্বামী তাকে বাঁচাক পাল্টা তীব্র ভালবাসা দিয়ে। সে তার বুকে হাত রেখে গালে ঠোঁট ঠেকাল। কিন্তু ঘনশ্যাম সাড়া দিল না। একটু পরে তার নাক ডাকতে থাকল। তখন গার্গী ঘুরে শুল।

সকালে ঘনশ্যাম রোজকার মতো বাজারে গিয়েছিল।

গার্গী গৌতমের প্রতীক্ষা করছিল। একটু পরে সে নিজের আচরণে নিজেই অবাক হয়েছিল। এমন করে সে তো এতদিন কারও প্রতীক্ষা করেনি! ছটফটানিভরা এই পথ চেয়ে থাকা তার জীবনে একেবারে নতুন। আগে গৌতম এলে তার ভাল লেগেছে। কিন্তু তার পথ তাকিয়ে থাকেনি। গার্গীর মনে হচ্ছিল, হঠাৎ সে নিজে যেমন নতুন হয়ে উঠেছে, তেমনি গৌতমও তার কাছে নতুন হয়ে উঠেছে।

আর এই ছটফটানির মধ্যে আনন্দভরা আবেগ আছে। নিষিদ্ধ সৌন্দর্যে সাজানো যৌবনপূর্ণ পৌরুষের প্রতি আহ্বান আছে।

গার্গীর মধ্যে সেই আবেগ ছিল, যে আবেগে বৃক্ষেরা ফুলবতী হয়। নদী হয় স্রোতবতী। আকাশ ভরে মেঘ জমে ওঠে। বৃষ্টির ধারা ভাসিয়ে দেয় ধুলোমাটির জগৎটাকে। এ আবেগ প্রকৃতির খুব গভীর গোপন আবেগ। দিন মাস ঋতু বর্ষচক্র বহমান সেই টানে। রোদ-জ্যোৎস্না-অন্ধকারের খেলা চলে জীবজগৎকে ঘিরে।

গার্গী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছিল। গৌতম তাকে অসাধারণ সুন্দরী বলছিল। সত্যি কি সে তা-ই?

“ওদিকে এক কাণ্ড!” ঘনশ্যামের সাড়া পেয়ে সে বেরুল। ঘনশ্যাম সাইকেল উঠোনে রেখে বাজারের থলে হাতে বারান্দায় উঠল। মুখটা গম্ভীর।

গার্গী বলল, “কী?”

“কাল রাত্তিরে আবার বেধেছিল দুই গ্যাংয়ে। খুব বোমাবাজি হয়েছে।”

গার্গী দ্রুত বলল, “হ্যাঁ। অনেক রাত্রে শব্দ শুনেছিলুম যেন।”

ঘনশ্যাম থলেটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে একটু হাসল। “তপু হারামজাদা খুব বেড়েছিল। গেল!”

গার্গী চমকে উঠল। “গেল মানে?”

ডেড। বডি ঝাঁঝরা।” ঘনশ্যাম চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল। “ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরছিল। এদিকে কেলোরা ওত পেতে ছিল। বুড়োশিবতলার ওখানে এসেছে, অমনি বোম চার্জ করেছে। তপুর সঙ্গেও কয়েকজন ছিল। থাকলে কী হবে? আনএক্সপেক্টেড অ্যাটাক। পরে বোমাটোমা এনে খুব ফাটিয়েছে। ততক্ষণে কেলোরা ভ্যানিশ। পুলিশের যা নিয়ম—তিনঘণ্টা পরে এসে নিরীহ লোকদের ধরে হম্বিতম্বি—”

“গৌতম?” গলা কেঁপে গেল গার্গীর। “গৌতমকে ধরেনি তো?”

ঘনশ্যাম আবার হাসল। “গৌতমের কী? সে তো আউটসাইডার। রাস্তায় দেখা হলো। বলল, যাচ্ছি। কথা আছে। আমি কিছু বললাম না অবিশ্যি।”

গার্গী শুকনো মুখে বলল, “তপু মরে গেছে?”

“শুনছ কী? বডি প্রায় টুকরো টুকরো। একসঙ্গে কয়েকটা বোমার এক্সপ্লোশন!” ঘনশ্যাম ধোঁয়ার রিঙ পাকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, “একেই বলে নিয়তি। কাল বিকেলে আমাকে শাসাচ্ছিল ব্যাটাচ্ছেলে। একবার ভাবলুম, যাব নাকি গোপেশ্বরবাবুর কাছে। ওঁরই চেলা ছিল শুওরের বাচ্চা। পরে ব্রতীনবাবুর পার্টিতে ঢোকে। পারল ব্রতীনবাবু বাঁচাতে? ওর নাম গলাকাটা কালী। মোটরসাইকেল হাঁকিয়ে ব্রতীনবাবুর সঙ্গে ঘোরে বডিগার্ড হয়ে। তবে জানো? কাঁটালিয়াঘাটে আবার অশান্তি শুরু হলো। বহরমপুরে থাকতেই শুনেছিলুম ডেঞ্জারাস জায়গা। অনেক চেষ্টা করেও ট্রান্সফার ঠেকাতে পারলুম না।”

গার্গী আস্তে বলল, “তোমার কী? তুমি তো কোনও পার্টিতে নেই।”

“নেই। তবে কথা কী জানো—”

“না। এখানকার কোনও ব্যাপারে তুমি নাক গলাবে না।”

ঘনশ্যাম একটু চুপ করে থেকে বলল, “আজকাল প্রব্লেম হলো, কোনও একটা পক্ষে না ঢুকলে মাথা বাঁচানো কঠিন। রাম মারবে, নয়তো রাবণ মারবে। হসপিট্যাল কমপ্লেক্সে তিনটে ইউনিয়ন। তিনটের সঙ্গে লোক্যাল লিডারদের কানেকশান আছে। আমাদের মতো নিরীহ লোকেদের হয়েছে জ্বালা।”

সদর দরজা খোলা ছিল। গৌতম ঢুকেই দরজা বন্ধ করল।

গার্গী কিচেনের সামনে মেঝেয় থলে থেকে তরিতরকারি ঢালছিল। একটা আধকেজিটাক পোনা এনেছে ঘনশ্যাম। সেটা নড়ছে। গার্গী গৌতমের দিকে তাকাল।

গৌতমের মুখ গম্ভীর। বারান্দায় উঠে বলল, "পুরো ছুটিটা আর কাটানো হলো না হয়তো।"

ঘনশ্যাম বলল, "কেন?"

গৌতম গার্গীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাপাস্বরে বলল, "আমি একটা অপকর্ম করে ফেলেছি। অবশ্য বৌদির কোনও দোষ নেই। তা হলেও শ্যামদাকে বলা উচিত ছিল। কাল বিকেলে একটা কাজে জড়িয়ে গেলুম। আসা হলো না। তো—"

গার্গী আস্তে বলল, "তোমার দাদাকে বলে দিয়েছি। আমার ভয় করছিল।"

গৌতম ঘনশ্যামের দিকে তাকাল। ঘনশ্যাম একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, "তপুটা বোকা। উইপনটা সঙ্গে থাকলে বেঁচে যেত হয়তো।"

গৌতম বলল, "আসলে পুলিশ-রেডের ভয়ে—আপনি শুনে থাকবেন, গোপেশ্বরবাবু তপুকে শায়েস্তা করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। রুলিং পার্টির এম এল এ-কে পুলিশ খাতির করতে বাধ্য। এনিওয়ে, এখন আমার প্রব্লেম হলো, আমি জানি না তপু কাকেও জানিয়ে গেছে কি না যে, ওটা আমাকে রাখতে দিয়েছিল।"

গার্গী বলল, "কাকেও বলে গেলে সে তোমাকে চাইবে। তখন দিয়ে দেবে।"

ঘনশ্যামও সায় দিল। 'হ্যাঃ! ফেরত দেবে।" বলে সে গার্গীর দিকে ঘুরল। "চা করো। বেচারাকে বড্ড নার্ভাস দেখাচ্ছে।" সে খিক্‌খিক্ শব্দে অদ্ভুত হাসল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বসার ঘরে চলে গেল।

গার্গীর চোখে এই মুহূর্তে ভালবাসা ঝিকমিক করে উঠল। মুখ টিপে হেসে সে কুকার ধরাতে উঠে দাঁড়াল।

গৌতম জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল গার্গী হাসল কেন। কিন্তু ঘনশ্যাম এসে গেল একটা চেয়ার নিয়ে। চেয়ারটা রেখে বলল, "বসো। বি কাম অ্যান্ড কোয়ায়েট। একটা ট্র্যাংকুলাইজার দেব খন। রাত্তিরে খেয়ে শোবে।"

গৌতম বলে বসল, "সত্যি শ্যামদা, বড্ড আনইজি ফিল করছি। এখানে এসে এভাবে আনসোস্যালদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব চিন্তাও করিনি। আসলে তরুণ সংঘ ক্লাবে তপুর সঙ্গে আলাপ। তখনও জানতুম না ও একটা ক্রিমিন্যাল!"

ঘনশ্যাম বলল, "চেহারা হাবভাব দেখে মানুষ চেনা যায় না। মেন্টাল হসপিট্যালে তুমি তো গেছ। দেখেছ তো অত্যন্ত সুস্থ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে যাকে, সে ভেতরে একজন মেন্টাল পেশেন্ট। তুমি অবিশ্যি পেডিয়াট্রিকের ডাক্তার হতে চলেছ।" আবার অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল সে। "তোমার মধ্যে শিশু-শিশু ভাব আছে। শিশু চিকিৎসায় এটা কাজ দেবে। কিন্তু সেজন্য শিশু সাইকোলজিও তো পড়তে হয়েছে। মূল কথাটা হলো, সাইকোলজি! তোমার বাবা বলেন—"

গৌতম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "প্লিজ শ্যামদা! বরং এই নিন, সিগারেট খান।"

"দাও। তবে জাস্ট আ মিনিট। চা খেয়ে ধরাব।"

গার্গী চুপচাপ চা করছিল। দু'পেয়ালা চা এনে দিয়ে আস্তে বলল, "তুমি ওটা বরং নিয়ে যাও গৌতম। আমার বড্ড ভয় করছে।"

গৌতম বলল, "এখন নিয়ে যাওয়া তো রিস্কি। তাছাড়া রাখব কোথায়?"

"ওটা তো জুতোর বাক্স। জুতো বলেই বাড়িতে কোথাও রাখবে।"

"মাথা খারাপ? ওটা নিয়ে ঢুকলেই জুতো দেখতে চাইবে বাড়িসুদ্ধু।"

ঘনশ্যাম বলল, "হ্যাঁ। রিস্ক আছে। বরং দেখ কয়েকটা দিন। যদি তপু কাকেও জানিয়ে গিয়ে থাকে, সে চাইলে গোপনে ফেরত দেবে। ব্যস্! ল্যাঠা চুকে গেল।"

গৌতম বলল, "যদি কাকেও না জানিয়ে থাকে, আমি ওটা নিয়ে কী করব?"

গার্গী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, "কাছেই গঙ্গা। গঙ্গায় ফেলে দেবে।"

ঘনশ্যাম মাথা নেড়ে সায় দিল। "ঠিক। ঠিক বলেছ। কাছেই মা গঙ্গা। সব পাপ বুকের তলায় লুকিয়ে ফেলবেন।" বলে সে সেইরকম অদ্ভুত শব্দে খিক্‌খিক্ করে হাসতে লাগল।...

## ॥ তিন ॥

দুপুরে খেতে এসে ঘনশ্যাম বলল, "আজ ফিরতে দেরি হবে। আর্জেন্ট ব্যাপার। বহরমপুর যেতে হবে। ডি এম ও অফিস থেকে খবর এসেছে। আগামী পরশু থেকে পুজোর জন্য চারদিন ডি এম ও অফিস বন্ধ। ওদিকে ট্রেজারি ব্যাংক সবই বন্ধ। রিকুইজিশন ফাইল আর পে-বিল আজই চারটের মধ্যে সাবমিট করে আসতে হবে। নইলে কাল মাইনে-টাইনে হবে না। এদিকে আমাদের অফিস শুধু বিসর্জনের দিনটা বন্ধ।" সে হাতমুখ সাবান দিয়ে রগড়ে ধুয়ে এল অন্যদিনের মতো। স্নান করল না। খেতে বসে অভ্যাস মতো বকবক করতে লাগল। "ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো পেয়েছে আমাকে। ক্ল্যারিক্যাল কাজকর্মও করিয়ে ছাড়ে। কি না আমার সঙ্গে ডি এম ও অফিসের খুব খাতির! যখন ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে ছিলুম, বেশ ছিলুম। ওয়েলফেয়ার অফিসার করে আমার বারোটা বাজালে। যত রাজ্যের পাগল নিয়ে কারবার। আজকাল ভয় করে, আমিও না পাগল হয়ে যাই।" হাসতে গিয়ে তার মুখের ভাত ছিটকে পড়ল।

গার্গী চুপচাপ শুনছিল। কোনও কথা বলল না।

খাওয়া শেষ হলে ঘনশ্যাম বাথরুমে আঁচাতে গেল। গার্গী এঁটো কুড়িয়ে থালা বাটি গেলাস সংলগ্ন কিচেনের ছোট্ট বারান্দায় রাখল। ঘনশ্যাম তোয়ালেতে হাত মুখ মুছে সিগারেট ধরিয়ে বলল, "দুটো-পাঁচে ট্রেন। কিন্তু এ লাইনের কোনও টাইমের বালাই নেই। ট্রেনে গেলে একটু আরামে যাওয়া যেত। বাসেই যাই। বড্ড ঝুলোঝুলি ভিড়। দেখি।"

গার্গী এতক্ষণে বলল, "কখন ফিরবে?"

"ট্রেনে ফিরলে সাড়ে আটটা-নটা হয়ে যাবে। লাস্ট বাস অবিশ্যি ছটায়। পৌঁছতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।" বলে সে ঘরে ঢুকে পোশাক বদলাতে গেল।

গার্গী স্বামীকে দেখছিল। ঘরের ভেতর শুধু আন্ডারওয়্যার পরা ঘনশ্যামের শরীর যেন মানুষের নয়। পুরুষ অবয়বেরই একটা বিকৃতি। পরমুহূর্তে গার্গীর মনে হলো, শরীর সম্পর্কে তার এই অনুভূতি নতুন আর আকস্মিক। এতদিন তো সে তার স্বামীর শরীর সম্পর্কে এমন সচেতন ছিল না! পলকের জন্য গৌতমের সুঠাম শরীরের লাবণ্য তার চেতনায় এসে আছড়ে পড়ল। একটু বিব্রত বোধ করল সে।

প্যান্টশার্ট পরে সভ্যভব্য হয়ে ঘনশ্যাম বেরিয়ে এল। বলল, "তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ নাকি? খেয়ে নাও।"

গার্গী বলল, "খাচ্ছি।"

ঘনশ্যাম সাইকেলটা বারান্দায় নিয়ে এল। ব্যাকসিট থেকে ব্রিফকেসটা খুলে নিয়ে একটু ইতস্তত করে বলল, "জুতোর বাক্সটা আছে, না গৌতম নিয়ে গেছে?"

"আছে।"

"থাক। ও নিয়ে ভেবো না। গৌতম যা করার করবে। তুমি খেয়ে নাও।" বলে ঘড়ি দেখে ঘনশ্যাম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

গার্গী ছোট্ট উঠোনটুকু পেরিয়ে আজ স্বামীকে বিদায় দেওয়ার ভঙ্গিতে সদর দরজায় গেল। ঘনশ্যাম পিছু ফিরল না। সংকীর্ণ পিচ রাস্তা ধরে হনহন করে হাঁটছিল সে। একটু দূরে পার্ক। পার্কের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় অদৃশ্য হলে শ্বাস ছেড়ে গার্গী দরজা বন্ধ করল।

তারপর তার বুক ধড়াস করে উঠল। শরীর ভারী বোধ হলো। আজ দুপুরে যদি গৌতম আসে?

ভাল করে খেতে পারল না গার্গী। এঁটো থালাবাসন রোজকার মতো ধুয়ে রাখল না। ঘনশ্যাম মুখে অবশ্য একটা কাজের মেয়ে রাখতে চেয়েছিল। গার্গীই রাখতে দেয়নি। ছোট্ট একটা সংসারে কী এমন কাজ? বহরমপুরে থাকার সময়ও কাজের মেয়ে ছিল না। গার্গী বারান্দায় কিছুক্ষণ আনমনে দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘরে ঢুকল আয়নার সামনে নিজেকে দেখতে গেল। আর সহসা তাকে একটা উন্মাদনা ভর করল সে মুখে একটু স্নো ঘষল। কপালে নতুন করে টিপ পরল। তারপর কবে বহরমপুরে কেনা সেন্টের শিশি খুলে গলায় বুকে কাঁধে ছড়াল। তার হাত কাঁপছিল।

সে বিছানায় বসে বালিশে হেলান দিয়ে একটা পুরনো সিনেমা পত্রিকা পড়ার চেষ্টা করল। মন বসল না। সেই দুরুদুরু বুকের প্রতীক্ষা তাকে অস্থির করছিল ট্রানজিস্টারটা আস্তে বাজছিল। সে মাঝে মাঝে জানলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ভয়াল ছাতিম গাছটা আজ জৈব হয়ে উঠেছে এবং তার দিকে কেমন চোখে তাকাচ্ছে। আজ বাতাস বন্ধ। গঙ্গার ধারের বনভূমি শ্বাস বন্ধ করে কী যেন ঘটবার প্রতীক্ষা করছে। আকাশ

গনগনে নীল। আর সেই ব্যাপক শূন্যতা বেয়ে কী একটা পাখি ওঠানামা করছে। গার্গীর মতো— ঠিক যেন গার্গীর মতোই কোথাও পৌঁছুনোর ব্যাকুলতা।

গৌতম এল যখন, তখন প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। বলল, "ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। শোনো, শ্যামদা ফিরলে নৌকো করে পঞ্চমুখী শিবের মন্দিরে বেড়াতে যাব। দারুণ লাগবে। মাত্র মাইল তিনেকের নৌকোযাত্রা। ফেরার সময় কারেন্টের টানে পনের মিনিটের বেশি লাগবে না।"

গার্গী আস্তে বলল, "আমি যাব না।"

গৌতম তার গাল টিপে দিয়ে বলল, "ব্যাপার কী? শ্যামদার সঙ্গে ঝামেলা হয়ে গেছে নাকি?" বলেই সে হাসল। "সেন্টের গন্ধে জ্বালিয়ে দিলে যে! তার মানে, হাজব্যান্ডের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছ।"

গার্গী চোখ পাকিয়ে বলল, "শাট আপ! বাজে কথা বোলো না।"

"মাই গুডনেস!" গৌতম নড়ে বসল। "বারান্দায় সাইকেলও দেখলুম। নাহ্‌, কেটে পড়ি। শ্যামদা কোথাও সুঁই ফোটাতে গেছে নিশ্চয়।"

গার্গী তার হাত ধরে টেনে বসাল। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বলল, "ও অফিসের আর্জেন্ট কাজে বহরমপুর গেল। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।"

গৌতম মিটিমিটি হেসে বলল, "বাহ্‌! তাহলে তো আমরা অনায়াসে নৌকোভ্রমণ করে আসতে পারি। নৌকো বলা আছে। বিলিভ মি, পাঁচ টাকা অ্যাডভান্সও করেছি। ওই ছাতিমতলার ঘাটে চারটেয় অপেক্ষা করবে ঝাব্বুলাল। ছই দেওয়া নৌকো। রোদ লাগলে ভেতরে বসব।" সে গার্গীকে দু'হাতে টেনে চুমু খেল। গার্গী বাধা দেওয়ার ভান করল মাত্র। গৌতম বলল, "নাও! ঝটপট শাড়ি বদলে নাও। আর শোনো, কক্ষণো ওসব সেন্টফেন্ট মাখবে না। তোমার শরীরের একটা আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ আছে। তুমি জানো না।"

গার্গীর মনে একটা আবেগ এসেছিল। যৌবন যখন যৌবনকে ছোঁয়, তখন এই আবেগটা আসে একটা বিস্ফোরণের মতো। সে বলল, "তুমি বাইরে যাও।"

"কেন? আমার সামনে শাড়ি বদলাতে লজ্জা! ঠিক আছে। আমি চোখ বন্ধ করছি।"

"না।"

গৌতম হাসল। "কিন্তু জানালা খোলা। অন্য কেউ দেখে ফেলতে পারে।"

গার্গী উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করল। বলল, "যাও। বেরোও!"

গৌতম প্রেমিকের গলায় বলল, "না। প্লিজ গার্গী! আমাকে দেখতে দাও।"

"কী দেখবে?"

"তোমাকে।"

"শুধু অসভ্যতা!"

"না গার্গী! তোমার শরীর—ডোন্ট ফরগেট, আমি হাফ ডাক্তার—তোমার মতো এমন মিনিংফুল বডি আমি আর দেখিনি। তুমি তো জানো, আমাকে কত ডেডবডি

ঘাঁটতে হয়েছে—ইভন, তোমার বয়সী কত সুন্দর মেয়ের বডি! সব বডিই নিছক বডি।"

গার্গী চোখে হেসে বলল, "আমার ডেডবডি দেখো!"

গৌতম উঠে গিয়ে তার মুখ চেপে ধরল। "না! ও কথা বোলো না!" তারপর বারবার চুমুতে তার সারা মুখ, গলা, কাঁধ ভরিয়ে দিল। গার্গী জড়ানো গলায় বলল, "আহ্! কী করছ? দরজা খোলা।"

গৌতম দরজা বন্ধ করল। তারপর কালকের মতোই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল গার্গীর ওপর। দু'হাতে তাকে তুলে নিয়ে খাটে শুইয়ে দিল। গার্গী বাধা দিতে পারল না। যৌবন যৌবনের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে গৌতম আস্তে বলল, "নৌকো ওয়েট করছে। ছাড়ো!"

গার্গী অস্ফুটস্বরে বলল "করুক।"

"প্লিজ! ছাড়ো!"

"না। তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।"

গৌতম তার কপালে চুমু দিয়ে বলল, "হঠাৎ কেউ এসে পড়তে পারে। ছাড়ো লক্ষ্মীটি!"

"আমার ঘুম পাচ্ছে।"

গৌতম হাসল। "সর্বনাশ! এই অবস্থায় ঘুমোবে নাকি?"

"হুঁউ।"

"আয়নায় দেখ, আমরা কী অবস্থায় আছি।"

গার্গী মুখটা একটু ঘুরিয়ে আয়নায় প্রতিবিম্বিত দুটি নগ্ন শরীর দেখেই প্রচণ্ড লজ্জায় গৌতমকে ঠেলে দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে সায়া কুড়িয়ে নিজেকে ঢাকল।...

ছাতিমতলার ঘাটে ঝাব্বুলাল মাঝি নৌকো বেঁধে বিড়ি টানছিল। এখানটা পুরনো দহ। তাই স্রোত নেই। গৌতম নৌকোয় উঠে হাত বাড়িয়ে গার্গীকে উঠতে সাহায্য করল। নৌকো চলতে থাকল তীর ঘেঁষে। স্রোতের উজানে হলেও তীরের কাছে স্রোতের গতি মন্থর। বিকেলেও শরৎকালের রোদটা চড়া। কিন্তু গার্গী ছইয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতদিনের আনন্দহীন একঘেয়ে জীবনে এমন করে স্বর্গের দরজা খুলে যাবে সে কল্পনা করেনি। সে মুগ্ধ চোখে আর আবিষ্ট মনে নিসর্গ দেখছিল।

গৌতম পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। চাপা স্বরে বলল, "ভাবতে খারাপ লাগছে, আবার কলকাতা ফিরে যেতে হবে। আবার সেই ন্যাস্টি পরিবেশ, রোগীর ভিড়, যত রকমের কদর্য সব অসুখ। নেচার মানুষকে একটা বডি দিয়েছে। অথচ সেই বডির মধ্যেই যেন হেল অ্যান্ড হেভেন। আনন্দ আর যন্ত্রণা।"

গার্গী বলল, "তোমাকেও দেখছি ওর স্বভাব পেয়েছে। খালি বকবক।"

"তুমিই হয়তো শ্যামদার মতো আমাকেও ফিলোজফার বানিয়ে ছেড়েছ!"

"তার মানে?"

"তোমাকে লক্ষ্য করে বড্ড কথা বলতে ইচ্ছে করে। নাকি তুমি প্রতিবাদ করো না বলে?"

"আমি ওসব বুঝি না।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর গৌতম বলল, "তখন একটা কথা ভাবছিলাম।"

"কী?"

"আমার ভবিষ্যৎ পেশা ডাক্তারি। আমি মানুষের বডি সম্পর্কে পড়াশুনা করছি ছ'বছর ধরে। এটা শেষ বছর। কিন্তু মানুষের বডির একটা মিনিংফুল সাইড আছে—তখন যা বলছিলুম, এটা এমন করে বুঝিনি। তুমি আমাকে এই জ্ঞানটা দিয়েছ।"

সে হাসতে লাগল। গার্গী বলল, "চুপ! লোকটা ওভারহিয়ার করছে।"

"নাহ্। ও এসব বোঝে না।"

"বোঝে না। তোমার মত ন্যাকা।"

"দারুণ বলেছ, আমি এতদিন সত্যি ন্যাকা ছিলুম।"

"হুঁ, গাল টিপলে দুধ বেরুত। ওসব চালাকি ছাড়ো তো।"

"কেন চালাকি বলছ?"

গার্গী মুখ ঘুরিয়ে খুব আস্তে এবং চোখে হেসে বলল, "তুমি ওসব ব্যাপারে এত এক্সপার্ট হলে কী করে? নিশ্চয় এক্সপিরিয়েন্স আছে।"

গৌতম দ্রুত বলল, "বিলিভ মি। থিওরিটিক্যাল নলেজ। তাড়াড়া ডাক্তারদের সেক্সোলজি পড়তে হয়। পুরো সিস্টেমটা জানা হয়ে যায় কম বয়সেই। তাছাড়া আমাদের কাজটা তো পোশাকের ভেতরকার হিউম্যান বডি নিয়েই। সার্জারির প্রোফেসর চন্দ বলতেন মানুষের সঙ্গে প্রাণীর প্রথম তফাতটা হলো পোশাকের। এটাই কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স বিটুইন ম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যাল।"

"আহ্! আবার বকবক?"

"না গার্গী! ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর। নেচারে সব কিছু নেকেড। ওই গাছগুলো দেখ।"

"এদিকটা এত জঙ্গল কেন?"

"গভর্মেন্ট প্রজেক্ট। ফরেস্ট ডিপার্টের কীর্তি আর কী?"

"ওটা কি লেক নাকি?"

গৌতম হাসল। "বলতে পারো। লোক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে বিল বলে। প্রচুর বুনোহাঁস আসে শীতের সময়।"

ঝাব্বুলাল বলল, "এখোনো কুছু কুছু হাঁস দেখতে পাবেন বাবু। সরকার কানুন করল কী, উও হাঁস মারলে জেল হোবে। লেকিন বন্দুকবাজি কৌন রোখেগা? শিকারিলোক দুড়ুম উড়ুম করে বন্দুক মারে।"

গার্গী বলল, "সিনেমায় ঠিক এমনি সিনারি দেখেছি। আচ্ছা, এখানে শুটিং করে না?"

গৌতম হাসতে হাসতে বলল, "তোমার নায়িকা হতে ইচ্ছা করছে বুঝি? ঠিক আছে। আমি নায়ক হব। গান গাইব, আ যা আ যা—"

গান থামিয়ে দিয়ে গার্গী বলল, "ওখানে নৌকো যায় না?"

"কেন? ওই তো পঞ্চমুখী শিবের মন্দির দেখা যাচ্ছে। অসাধারণ সাজানো বিউটিস্পট!"

গার্গী গম্ভীর হয়ে বলল, "নাহ্। বরং লেকে চলো!"

"কী আশ্চর্য! ওটা লেক নয়।"

"আমি মন্দিরে যাব না।"

"কেন?"

গার্গী আস্তে এবং ঝাঁঝাল স্বরে বলল, "ন্যাকামি কোরো না। স্নান না করে—"

"আই সি!" গৌতম ওর চোখে চোখ রেখে বলল, "ওসব সুপারস্টিশন ছাড়ো তো! পাপ-টাপ বোগাস ব্যাপার! আমরা তো ধম্ম করতে যাচ্ছি না। জাস্ট্ সাইটসিইং!"

"না।" গার্গী গোঁ ধরে বলল। "আমি নৌকো থেকে মন্দিরে উঠব না। তুমি একা যেও।"

গৌতম মনে মনে চটে গিয়ে বলল, "সেটা আগে ভাবিনি। এতদূর এসে—ঠিক আছে ঝাব্বুলাল! বিলে ঢোকা যায় না নৌকা নিয়ে?"

ঝাব্বুলাল বলল, "নেহি বাবু। সুলুইস্ গেটের তলায় নাও ঢুকতে তকলিফ হবে। আউর বহত দাম্-উম আছে পানির তলায়। পানিকি জঙ্গল।"

"তাহলে এক কাজ করো। ওখানে ভেড়াও। আমরা বরং ফরেস্টের কাছে একটু বেড়িয়ে আসি।"

ঝাব্বুলাল অবশ্য খাটুনি থেকে রেহাই পেল। সামনের উজানে আধ মাইল প্রচণ্ড স্রোত। সে বাঁ-দিকে ঘাসে ঢাকা জমিতে নৌকো ভেড়াল! জমিটা ঢালু। ওপরে বাঁধ। বাঁধ থেকে বন দফতরের জঙ্গল বিলের সমান্তরালে এগিয়ে গেছে রেল লাইন অব্দি। রেল লাইনের ব্রিজটা শেষ বিকেলের গোলাপি রোদে ঝকমক করছিল।

জঙ্গলের ভেতরটা ফাঁকা। কোনও ঝোপঝাড় নেই। বাঁধ থেকে দুজনে হাত ধরাধরি করে নেমে গেল। জঙ্গলের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে গৌতম চাপা হেসে বলল, "তোমাকে আবার যদি অশুচি করে দিই?"

গার্গী চমকে উঠে বিষণ্নমুখে বলল, "না, গৌতম! প্লিজ। আর ওসব কথা নয়।..."

এখানে প্রকৃতি। নগ্ন নির্জন নিসর্গভূমি। এখানে যৌবন যৌবনকে কাছে পেলে সময়ের চেতনা মুছে যায়। গার্গী তার পরিবার, তার ছোটবেলা, দুঃখদুর্দশায় বেড়ে ওঠা জীবন আর তার সব গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার কাহিনী মন থেকে উজাড় করে শোনাচ্ছিল গৌতমকে। এতদিন পরে মনকেও প্রাকৃতিক নগ্নতার মতো অবাধে নগ্ন করে দিয়ে গার্গী তৃপ্তি পাচ্ছিল।

আর এই ভাবেই কখন পঞ্চমীর চাঁদের ফালি আকাশে আঁকা হলো। ঝাব্বুলালের ডাক শুনে দুজনে নৌকোয় ফিরল। গৌতমের সঙ্গে টর্চ ছিল

ছাতিমতলায় তাদের নামিয়ে দিয়ে বখশিস নিয়ে ঝাব্বুলাল সদরঘাটের দিকে চলে গেল।

পৌনে সাতটা বাজে। এখনও ঘনশ্যামের ফেরার সময় হয়নি। সরকারি কোয়ার্টার এলাকা নির্জন। শুধু টিভি-র চাপা শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনদিক থেকে আবছা আলো পড়েছে ঘনশ্যামের এল টাইপ একতলা কোয়ার্টারের ওপর। নীচের অংশটা অন্ধকার। প্রত্যেকটা কোয়ার্টারের চারপাশে খানিকটা করে ফাঁকা জমি। কোথাও কিছু গাছ। সদর দরজার ওপর টর্চের আলো ফেলেই গৌতম চমকে উঠল। "এ কী! তালাটা—"

গার্গী দেখল, তালাটা খুলে একটা কড়ায় ঝুলছে। গৌতম ঠেলে ভেতর ঢুকে গেল। তারপর টর্চের আলো ফেলে চমকানো গলায় বলল, "সর্বনাশ হয়েছে গার্গী!"

শোবার ঘরের দরজার তালা খোলা এবং ঝুলছে। গার্গী মাথা ঠাণ্ডা রেখে ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালতে গেল। আলো জ্বলল না। গৌতম টর্চের আলো ফেলে বলল, "এক মিনিট। মেন সুইচ অফ করে গেছে চোর!" সে মেন সুইচ অন করে দিলে আলো জ্বলল। বারান্দায় সাইকেলটা নেই। গৌতম বলল, "আহা! হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছো? আর কী চুরি গেছে দেখবে তো?"

কমদামি স্টিলের আলমারির তালার কাছে কয়েকটা আঁচড়। চোর আলমারিটা খোলার চেষ্টা করেছে। পারেনি। গার্গী কোণে রাখা বাক্স আর সুটকেসের কাছে গিয়ে ভাঙা গলায় বলল, "আমার সুটকেসটা নেই।"

"দামি কিছু ছিল?"

"না।"

"আর কিছু নিয়েছে নাকি দেখ।"

গার্গী খাটের তলায় উঁকি দিল। গৌতম টর্চ জ্বালল। সেই জুতোর বাক্সটা নেই।...

## ।। চার ।।

ঘনশ্যাম বাড়ি ফিরেছিল সওয়া সাতটা নাগাদ। তাকে দেখেই গার্গী কান্না-জড়ানো গলায় বলেছিল, "সব দোষ আমার। পঞ্চমুখী শিবের মন্দিরদর্শনে গিয়ে—"

তাকে থামিয়ে গৌতম সংক্ষেপে ঘটনাটা বলেছিল ঘনশ্যামকে। ঘনশ্যাম ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। কিন্তু সাইকেল হারানোর কথা শুনে সে একটু চ্যাঁচামেচি করেছিল। "মন্দির দর্শনের যাবার আর দিন পেলে না? দেখ তো এবার আমি রোজ কী করে অফিসে যাব? পাক্কা এক কিমি রাস্তা! একটা নতুন সাইকেলের যা দাম হয়েছে। নাহ্, তোমার আর বুদ্ধিসুদ্ধি হলো না এ বয়সেও। একটেরে এই বাড়ি, পেছনে জঙ্গল। কতদিন পইপই করে বলেছি, চোর-ডাকাতের জায়গা। মেরে ফেললেও একটা লোক এসে জিজ্ঞেস করবে না কী হয়েছে।"

সেটা ঠিক। তাছাড়া টিভিতে এই সময় কী একটা দারুণ সিরিয়াল চলছে। আশেপাশের কোয়ার্টার থেকে জনপ্রাণীটি বেরুনোর আশা নেই। গার্গীও ততটা মিশুকে স্বভাবের মেয়ে নয়।

গৌতম বলছিল, "থানায় খবর দেওয়া দরকার, শ্যামদা। আমি বৌদিকে একা ফেলে যেতে পারছিলুম না।"

ঘনশ্যাম বাঁকা মুখে বলেছিল, "পুলিশ কিছু করবে না। তবে সাইকেলটা যদি দয়া করে উদ্ধার করে দেয়। দেখি বড়বাবুকে বলে।"

গার্গী ভাঙা গলায় বলেছিল, "সেই জুতোর বাক্সটা নিয়ে গেছে!"

ঘনশ্যাম চমকে উঠেছিল প্রথমে। পরে বলেছিল, "নতুন জুতো দেখে নিয়ে গেছে তবে বোঝা যাচ্ছে চোর একা ছিল না। গৌতম, তুমি আছ যখন, আরও কিছুক্ষণ থাকো। আমি থানায় যাই।"

ঘনশ্যাম তক্ষুণি টর্চ হাতে বেরিয়ে গিয়েছিল। গৌতম বলেছিল, "মাঝখান থেকে আমারই সর্বনাশ হলো হয়তো। তপু যদি কাকেও বলে গিয়ে থাকে, আমার কাছে ওর ফায়ার আর্মস আছে, আমার প্রব্লেম হবে। ওর গ্যাংয়ের ছেলেগুলো ডেঞ্জারাস।"

গার্গী ঝাঁঝালো কান্না জড়ানো গলায় বলেছিল, "তোমার পাপেই তো—"

"ভ্যাট! কী পাপ? অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট।"

একটু পরে গার্গী বলেছিল, "সুটকেসটায় আমার অনেক পুরনো জিনিস ছিল ছোটবেলার কত সব স্মৃতি। সাইকেল-ফাইকেল নিল, নিল। ওটা কেন নিল?"

কত নির্জন নিরিবিলি সময়ে গার্গী সুটকেসটা খুলে স্মৃতিকে সামনে সাজিয়ে বসে থাকত। পুরনো গন্ধ তাকে আবিষ্ট করত। সে আবার হু-হু করে কেঁদে উঠেছিল গৌতম তার পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। "চোরেদের স্বভাব হলো, যা হাতের কাছে পাবে নেবে।"

পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর রঞ্জিত মিত্র আর দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে ঘনশ্যাম এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসেছিল। রঞ্জিতবাবু তালাগুলো পরীক্ষা করে বলেছিলেন, "এসব কমন তালা সহজেই খোলা যায়। ঘরের দরজার তালাটা নামী কোম্পানির। কিন্তু এ পর্যন্ত চারটে বার্গলারি কেসে দেখলুম, এই তালাও চোরেরা সহজে খুলে ফেলছে।"

সাইকেলটা অনেক বছরের পুরনো। মোটামুটি একটা বর্ণনা দিয়েছিল ঘনশ্যাম রঞ্জিতবাবু খুব আশ্বাস আর পরামর্শ দিয়ে গেলেন। কেসডায়েরি থানায় লিখিয়ে এসেছিল ঘনশ্যাম।

সে রাতে গার্গী কিছু খেল না। ঘনশ্যাম তাকে খাওয়াতে পারল না। শেষে রাগ করে নিজেও খেল না। সে নরম স্বভাবের মানুষ, তাতে রাগ করে নিজেও উপোস থাকার পাত্র নয়। কিন্তু আসার পথে যেটুকু খাওয়া হয়েছে, তাই যথেষ্ট। যতক্ষণ সে জেগে থাকল, সাইকেলটা নিয়ে আপন মনে বকবক করছিল। সাইকেলটা তার জীবনের অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি।

গার্গীরও ইচ্ছে করছিল, বলে যে, স্যুটকেসটাও তার কাছে তাই। কিন্তু চুপচাপ পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

ভোরবেলা গৌতমের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল ওদের। গৌতম পেছনের জানালার দিকে ডাকছিল। এ রাতে ওই জানালাটা বন্ধ ছিল। ঘনশ্যাম মশারি থেকে বেরিয়ে গিয়ে জানালা খুলল। দেখল, গৌতম একটা স্যুটকেস আর সেই জুতোর বাক্সটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাপাস্বরে সে বলল, "ঝোপের মধ্যে পড়েছিল। শিগগির দরজা খুলুন।"

ঘনশ্যাম সদর দরজা খুলে দিলে গৌতম ঢুকল। একটু গলা চড়িয়ে বলল সে, "বৌদি! তোমার সুটকেস! দেখ কিছু চুরি গেছে নাকি।"

গার্গী ছটফটিয়ে বেরিয়ে এল। ঘনশ্যাম গুম হয়ে বলল, "উইপনটা আছে তো?"

গার্গীর হাতে সুটকেসটা দিয়ে গৌতম বিষণ্ন হাসল। "নাহ্! জুতোসুদ্ধু মেরে দিয়েছে চোরেরা। খালি বাক্সটা পড়েছিল। আসলে আমি সারারাত ঘুমোতে পারিনি। খালি মনে হচ্ছিল, এমন কিছু ঘটবে। বিশেষ করে বৌদির স্যুটকেসটা—"

গার্গী স্যুটকেস খুলে দেখছিল। একটু খুশিমাখা মুখে বলল, "সব আছে। নেবার মতো কিছু তো নেই এর মধ্যে।"

গৌতম বলল, "সাইকেলে নিশ্চয় তালা দেওয়া ছিল না শ্যামদা?"

ঘনশ্যাম আস্তে বলল, "নাহ্।"

"কাজেই সাইকেলে চেপে পালিয়ে যাওয়া সোজা।" গৌতম হাসবার চেষ্টা করল। "আপনার সাইকেলটার যা অবস্থা ছিল দেখেছি। এবার বরং নতুন একটা কেনা হয়ে যাবে।"

কথাটা বলেই সে জুতোর বাক্সটা নিয়ে চলে গেল। গার্গীর মধ্যে এতক্ষণে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছিল। ডালাভাঙা স্যুটকেসটা ঘরে রেখে এসে সে বলল, "নাও যা হবার হয়ে গেছে। সব আমারই দোষ। আমাকে ইচ্ছে হলে মারো।" বলে সে বাথরুমে ঢুকল।

বেরিয়ে আসার পরও দেখল, ঘনশ্যাম উঠোনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

গার্গী বলল, "আশ্চর্য মানুষ তুমি! সারারাত কিছু খাওনি। মুখ ধুয়ে এসো। লুচি করে দিচ্ছি। আর সাইকেল গেছে— বেশ তো! আমার কাঁকন দুটো বেচে আমিই তোমাকে নতুন সাইকেল কিনে দেব। রাগ করে বলছি না। আমার মায়ের দেওয়া গয়না। আমার গয়না পরতে ভাল লাগে না।"

ঘনশ্যাম গলার ভেতর বলল, "নাহ্। ও সব কথা আমি ভাবছি না। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, তপু হারামজাদার গ্যাংয়ের কেউ গোপনে আড়ি পেতে ব্যাপারটা সম্ভবত দেখেছিল। সে-ই এ কাজ করেছে। সাইকেল চুরি বা তোমার স্যুটকেস চুরিটা একটা চালাকি। কে জানে, সাইকেলটা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে কিনা। হুঁ, শুধু জুতোর বাক্স নিয়ে গেলে তার একটা রিস্ক্ ছিল। ভেবেছিল গৌতম তপুর চেলাদের জানিয়ে দেবে। গৌতম কথাটা জানালে ওদের মধ্যে পরস্পর সন্দেহ ঝগড়াঝাঁটি বেধে যাবে। কে জিনিসটা হাতাল?" শ্বাস ছাড়ল ঘনশ্যাম। "ক্রিমিন্যালদের স্বভাব আমি জানি। স্বার্থের জন্য ওরা জোট বাঁধে। কিন্তু প্রত্যেকে ওরা আলাদা করে নিজের-নিজের ফিকির মাথায় নিয়ে ঘোরে। দরকার হলে একজন আরেকজনকে ল্যাং মারতে দেরি করে না।"

"আহ্! আবার বুকনি ঝাড়তে শুরু করলে বাসিমুখে!"

ঘনশ্যাম গম্ভীর মুখে বাথরুমে ঢুকল।...

এদিন সাইকেল নেই বলে ঘনশ্যাম একটু আগেই অফিসের জন্য বেরুচ্ছিল। গার্গী

ইতস্তত করে বলল, "আমার একা থাকতে ভয় করবে, জানো? এরপর কখন ডাকাত বদমাশ এসে আমাকে মেরে রেখে গেলেই হলো।"

ঘনশ্যাম বলল, "গৌতমকে বলে যাচ্ছি বরং।"

"খালি গৌতম আর গৌতম!" গার্গী ঝেঁঝে উঠল। "একে তো সবার আমাকে দেখে চোখ টাটায়, তারপর—কিছু স্ক্যান্ডাল রটিয়ে ফেললেই হলো। তুমি কোয়ার্টার বদলানোর চেষ্টা করো বরং।"

ঘনশ্যাম হাসল। "কোথায় কোয়ার্টার? মেন্টাল স্টাফের জন্য কোয়ার্টারই নেই। এটা জেনারেল স্টাফের জন্য। লাকিলি খালি ছিল বলে ম্যানেজ করেছি। তা-ও আনঅফিসিয়ালি। যে কোনও দিন জেনারেল স্টাফের কেউ বদলি হয়ে এলে পাততাড়ি গুটোতে হবে।"

গার্গী অবাক হয়ে বলল, "সে কী! বহরমপুরে থাকার সময় যে বলেছিল কাঁটালিয়াঘাটে কোয়ার্টার অ্যালট করা আছে?"

"তখন আমিও কি জানতুম? তবে বাসার খোঁজ করছি। দেখা যাক্।" বলে সে পা বাড়াল। "গৌতমকে বলে যাচ্ছি। যদি না থাকে বাড়িতে, কী আর করা যাবে? তুমি দরজা ভাল করে এঁটে দিও। অচেনা কাকেও ভেতরে বসতে ডেকো না।"

সে চলে যাওয়ার পর গার্গী আস্তে শ্বাস ছাড়ল। মুহূর্তের জন্য তার মনে একটা পাপবোধ স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বালা দিল। একজন সাদাদিধে ভালোমানুষ তার স্বামী। আজ অব্দি তেমন কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি তার সঙ্গে। বাচ্চাকাচ্চা না হওয়ার জন্য নিজেকেই দায়ী করেছে। একবার হাসতে হাসতে বলেছিল, "বাবা-টাবা হওয়ার জন্য যে রকম পুরুষত্ব থাকা উচিত, আমার তা হয়তো নেই।" পুরনো কিছু কথা আলতো ভেসে এলে মনে। ঘনশ্যাম মাঝে মাঝে শারীরিক ভাবে অপটু হয়ে পড়ে আপনমনে বলে, "তোমার শরীরে কী যেন আছে। আমাকে নার্ভাস করে ফেলে।" এ মুহূর্তে কিছুক্ষণ লোকটার জন্য গার্গী দুঃখবোধ করল। একটু অনুতাপও জাগল। মনে হলো, সে বিশ্বাসভঙ্গ করছে। একটা চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও সে ভাবল। গৌতমকে এবার থেকে এড়িয়ে চলবে।

কিন্তু আরও কিছুক্ষণ পরে সেই অসহ্য একাকিত্ব গার্গীকে ঘিরে ধরল। তারপর সে অনুভব করল, দুটি দুপুরের নিষিদ্ধ গোপন শারীরিক সুখের স্মৃতি তাকে নাড়া দিচ্ছে। বাঘিনী মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে যেমন হিংস্র আর ধূর্ত হয়ে ওঠে, তেমনি ক্রূর আর লোভী হঠকারিতার বোধ তরঙ্গের মতো তার ওপর আছড়ে পড়েছিল।

কতক্ষণ পরে গৌতমের সাড়া পেয়ে গার্গী ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর একটু দেরি করেই সদর দরজা খুলে দিল। গৌতমকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বলল, "বসব না। একটা কথা বলতে এলুম। তোমার বরের সাইকেলটা পাওয়া গেছে।"

গার্গী ব্যস্তভাবে বলল, "কোথায়? কার কাছে?"

"সাউথে কোদালিয়া বলে একটা গ্রাম আছে। বেশি দূরে নয়। ওখানে জেলেদের জালে আটকে ছিল। ওরা থানায় জমা দিয়ে এসেছে শুনলুম।"

"ওকে খবর দেওয়া দরকার। সাইকেল-সাইকেল করে পাগল হয়ে গেছে।"

"খবর পেয়ে যাবে।"

"তুমি বসবে না?"

গৌতমে একটু হাসল। "বসতুম। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কিছু না। আমি একটু ভাবনায় পড়ে গেছি। মন ভালো নেই।"

"জুতোর বাক্সটা কী করলে?"

"ছিঁড়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছি।"

"তা হলে ভাবনা কিসের?"

"চোর সাইকেলটা নিল না কেন? রিভলভারটা চুরিই কি কারও মোটিভ ছিল?"

গার্গী আঁচলে মুখের ঘাম মুছে বলল, "আমার বরও ঠিক এই কথাটা বলছিল, জানো? কেউ নিশ্চয় জানত ব্যাপারটা। আড়ি পেতে দেখেছিল সম্ভবত। তপুরই গ্যাংয়ের কেউ হবে।"

গৌতম চিন্তিত মুখে বলল, "আমারও তা-ই মনে হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে, তপুর গ্যাংয়ের অন্য কেউ জানতে পারলে, কিংবা ধরো, তপু কাউকে জানিয়ে থাকলে সে আমাকে চার্জ করতে পারে।"

গার্গী বলল, "কিচ্ছু হবে না। এত ভেবো না তো। তপু কাকেও জানিয়ে গিয়ে থাকলে এতক্ষণ সে তোমাকে চাইত। তা ছাড়া যে ওটা চুরি করেছে, সে লুকিয়ে রাখবে। কাকেও জানতেই দেবে না। এস, বড্ড রোদ।"

গৌতম বলল, "পরে আসব'খন। আমি তপুর গ্যাংয়ের ছেলেদের নার্ভ ফিল করে বেড়াচ্ছি।"

"আসবে না?"

"দুটোয় আসব।"

"কী আশ্চর্য! বলছি তো—"

"বুঝেছি। আমাকে ঘেন্না ধরে গেছে!"

গৌতম উঠোনেই ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলল, "তুমি আমার স্বর্গ!"

গার্গী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "সব সময় অসভ্যতা! কে দেখে ফেলবে—হুঁ, বেরোও! তোমাকে আর আসতে হবে না।"

সে ঠেলে ওকে বের করে দিল। গৌতম হাসতে হাসতে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে গার্গী বারান্দায় ফিরল। উঠোনঘেরা পাঁচিল যথেষ্ট উঁচু নেই। বারান্দায় দাঁড়ালে বাইরেটা দেখা যায়। কেউ কোথাও নেই দেখে সে আশ্বস্ত হলো। অন্যদিনের মতো স্নান করে এসে রান্নায় বসল সে।

আজ একটু দেরি করে খেতে এল ঘনশ্যাম। গার্গী তাকে সাইকেলটার কথা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ঘনশ্যাম উজ্জ্বল মুখে বলল, "আমার থিওরি! সাইকেলটা পাওয়া গেছে। থানা থেকে হসপিট্যালে ফোন করেছিল আমাকে। গিয়ে আইডেন্টিফাই করলুম। ওবেলা ডেলিভারি পাব। পুলিশের হাতে কিছু পড়লে বের করা প্রব্লেম। গৌতমের বাবাকে বলায় ফোন করে বড়বাবুকে বলে দিয়েছেন।"

গার্গী একটু কৌতুক করে বলল, "সাইকেল চুরি গিয়ে না হয় ফেরত পেলে। আমি যদি চুরি যেতুম?"

ঘনশ্যাম কৌতুকটা নিল না। সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, "তুমি ইচ্ছে না করলে কেউ তোমাকে চুরি করবে না। হুঁ, রেপ অ্যান্ড মার্ডারের কথা আলাদা।"

গার্গী হঠাৎ চটে গেল। "ছাড়ো তো। হাত-মুখ ধুয়ে এস। ভাত বাড়ছি।"

ঘনশ্যাম একটু হাসল। "তুমি বলেছিলে পুজোর সময় ছুটি নিয়ে বাইরে যেতে। আসতে আসতে কথাটা ভাবছিলাম। বাইরে গেলে এই ঝামেলাটা হতো না। আমারও বড্ড হাঁপ ধরে গেছে। তো দেখি, পুজোটা যাক্।"

বলে সে বাথরুমে গিয়ে অন্যদিনের মতো সাবান দিয়ে রগড়ে হাত দুটো ধুল। পা ধুল। মুখে জল ছিটিয়ে মুখ ধুল। তোয়ালেতে হাত-মুখ মুছতে মুছতে ফের বলল, "সাইকেলটা জলে নাকানিচুবোনি খেয়ে কী অবস্থা হয়েছে দেখলে খারাপ লাগে। পার্ট বাই পার্ট খুলে অয়েলিং করাতে হবে। খামোকা একগাদা খরচা করাবে ব্যাটাচ্ছেলেরা। যা নেবার, তা তো নিলি। খামোকা এত ছলচাতুরির কী দরকার ছিল? ঠিক আছে। একটা অজুহাত না হয় সাজালি। তো সাইকেলটা খামোকা গঙ্গায় ফেলতে গেলি কেন? স্রেফ বদমাইশি। থানায় রঞ্জিতবাবু—কাল যে এস আই ভদ্রলোক এসেছিলেন, বললেন, 'শ্যামবাবু! আপনার সাইকেলটা বদলান। চোরও এই বাতিল মাল পছন্দ করেনি। রাগ করে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে গেছে'!" অদ্ভুত ফিক ফিক শব্দে হাসতে লাগল ঘনশ্যাম।

ভাত-তরকারি বেড়ে আসন পেতে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গার্গী। বলল, "আচ্ছা, তুমি যে বলছ, শুধু জুতোর বাক্স চুরি করতে ঢুকেছিল—তা হলে আলমারির তালা ভাঙার চেষ্টা করল কেন?"

ঘনশ্যাম পাতে বসে বলল, "ওটা অবিশ্যি সিরিয়াস একটা অ্যাটেম্প্‌ট্। ক্রিমিন্যালদের সাইকোলজি। যা নেবার, তা নিয়ে ভেবেছিল, কিছু মালকড়ি গয়নাগাঁটি যদি পেয়ে যায়, সেটা উপরি লাভ। রঞ্জিতবাবু কারেক্ট। ব্যাটাচ্ছেলের ওই পুরনো সাইকেল মনে ধরেনি। রাগ করে ফেলে দিয়েছে।" ডাল ঢেলে মাখিয়ে এক গ্রাস ভাত তুলে সে ফের বলল, "কে জানে, আমার ওপর রাগ ছিল কি না। হাসপাতালে চাকরির এই এক প্রব্লেম আজকাল।"

"খুব হয়েছে। এবার চুপচাপ খেয়ে নাও তো।"

ঘনশ্যাম তার দিকে তাকিয়ে ভাত মুখে দিল। বলল, "বেলা হয়েছে। তুমিও খেয়ে নিলে পারতে।"

"খাচ্ছি। আর বকবক কোরো না। গলায় ভাত আটকে যাবে।"

ঘনশ্যাম বেরিয়ে যাওয়ার পর অন্যমনস্কভাবে খেতে বসল গার্গী। ঘনশ্যামের বেড়াতে যাওয়ার কথাটা তার বুকে ধাক্কা দিয়েছিল। বিয়ের পর সেই একবার ক'দিনের জন্য দীঘায় হনিমুনের নাম করে বেড়াতে গিয়েছিল দুজনে। তখন কত স্বপ্নসাধ জেগে উঠেছিল গার্গীর জীবনে। পরে দিনে-দিনে দেখল সে একটা ভুল লোকের সহগামিনী হয়েছে, যে সৌন্দর্য বোঝে না, আনন্দের স্বাদ নিতে জানে না। শুধু এলেবেলে

ংথার বুকনি ঝাড়ে। পাইপয়সা হিসেব করে সংসার চালায়। কিছু কেনার ইচ্ছে হলে ৷গীকে মুখ ফুটে টাকা চেয়ে নিতে হয়। এ ভাবে বেঁচে থাকার কী মানে হয়?

খাওয়ার পর উত্তরের জানালার ধারে বসে গার্গীর মনে হলো, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ়ী একটা সর্বনাশা শক্তি তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে এবং তাকে যে রক্ষা ়রতে পারত, সেই মানুষটা বড় বেশি নির্বিকার।

ছাতিম গাছটার দিকে চোখ পড়তেই গার্গীর বুকের ভেতর একটা ঠাণ্ডা হিম ঢিল াড়িয়ে গেল। উজ্জ্বল আশ্বিনের রোদে গাছটাকে ভয়াল আর জৈব দেখাচ্ছে। গাছটা যন তাকে আকর্ষণ করছে। চোখ ফিরিয়ে নিল গার্গী। ট্রানজিস্টারের নব ঘোরাল। টুল হিন্দি গানের সুর।

দরজায় আস্তে কড়া নাড়ার শব্দ কানে এল। গার্গী বেরিয়ে গিয়ে বলল, "কে?"

গৌতম।

যৌবন যৌবনকে দরজা খুলে দিল।...

## ॥ পাঁচ ॥

ুজোর চারটে দিন আনন্দে কাটাল গার্গী। কাঁটালিয়াঘাটে বারোখানা ঠাকুর হয়। টাউনশিপ এলাকাতেই তিনখানা। সবচেয়ে বেশি জাঁকজমক হয় ঘাটবাজারের ব্যবসায়ী সমিতির ুজোয়। বাজারের পেছনদিকটায় পুরনো স্কুলের খেলার মাঠে কলকাতার যাত্রা সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিনটে রাত। গৌতমের সঙ্গে যাত্রা দেখতে পাঠিয়েছিল ঘনশ্যাম। সে াড়ি পাহারা দেবে। দশমীর দিন তার ছুটি। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা তার ধাতে নেই। কোথায় কোথায় ইঞ্জেকশন দেওয়ার আর ছোটখাটো ডাক্তারি করে বেড়াল। বিকেলে গার্গীর টানে সে ঘাটে বিসর্জন দেখতে গেল। গৌতম ক্যামেরায় বিসর্জনের অনেক ছবি তুলল। ঘনশ্যাম আর গার্গীরও কয়েকটা ছবি নিল। ঘনশ্যাম বিব্রত মুখে বলছিল, "আরে! আমার এই কুচ্ছিত চেহারার ছবি তুলে কী হবে?"

পরদিন থেকে আবার অফিস। আবার সেই রুটিনবাঁধা জীবন ঘনশ্যামের। গার্গী আগেভাগে বলে রাখে বিকেলে বেড়াতে যাওয়ার কথা। সে একটু সাহসী হয়ে উঠেছে। পঞ্চমুখী শিবের মন্দিরেও ঘুরে এল একদিন গৌতমের সঙ্গে। বাকি ফিল্মগুলো সেখানেই শেষ করে দিল গৌতম।

ছবিগুলো প্রিন্ট করে এনে গার্গীকে দিয়েছিল। গার্গী নিঃসংকোচে স্বামীকে দেখিয়েছিল। দেখে খুব প্রশংসা করেছিল ঘনশ্যাম। একটা ছবি সে বাঁধিয়ে এনে দেবে বলেছিল।

আবার একদিন বিলের ধারে সরকারি জঙ্গলটায় একটা বিকেল কাটাল গার্গী ও গৌতম। সেই সময় জঙ্গলের ভিতরে কিংবা বিলের পশ্চিমে রেলব্রিজের কাছে আবছা গুলির শব্দ শুনতে পেল ওরা। গার্গী বলল, "পাখি মারতে বেরিয়েছে কেউ। কোনও মানে হয়? পাখিগুলো—"

তাকে থামিয়ে গৌতম বলল, "বন্দুকের শব্দ বলে মনে হলো না!"

"তা হলে কেউ পটকা ফাটালো।"

"নাহ্। কলকাতায় আমি একবার দুদলের বোমাবাজির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলুম। তারপর পুলিশের গাড়ি এল। এক অফিসার রিভলভার থেকে ফায়ার করল। ঠিক সেই রকম শব্দ। ওঠ! এখানে থাকা ঠিক নয়।"

দুজনে বাঁধ ধরে ফিরে এল। তখনও ঘনশ্যাম ফেরেনি। পৌনে ছটায় আজকাল আবছা আঁধার হয়ে যায়। তাতে পুজোর পর আবার লোডশেডিং বেড়ে গেছে। গার্গী হেরিকেন জ্বেলেছে সবে ঘনশ্যাম সাইকেলের বেল বাজিয়ে ফিরল। গৌতমকে দেখে সে হাসল। "যাক্ গে! আমি ভেবেছিলাম, তোমার বৌদি একা থাকবে। লোডশেডিং। তাছাড়া ওই ছাতিমগাছটার পেত্নীর ভয়।"

গার্গী বলল, "আমার ভয়টয় নেই।"

সে হেরিকেনটা কিচেনের সামনে টেবিলে রেখে কুকার জ্বালাল। গৌতমকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। ঘনশ্যাম বলল, "কী গৌতম? বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করেছ নাকি?"

গৌতম আস্তে বলল, "বিকেলে জঙ্গলের ওদিকে রিভলভারের গুলির শব্দ শুনলুম শ্যামদা! কী ব্যাপার কে জানে! আমরা বেড়াতে যাচ্ছিলুম। পালিয়ে এলুম তক্ষুণি।"

ঘনশ্যাম চমকানো স্বরে বলল, "বলো কী? কাকেও দেখতে পাওনি?"

"নাহ্। শব্দটা ঠিক ট্রেস করতে পারিনি।"

"দেখ আবার কোনও খুনজখম হলো নাকি।" ঘনশ্যাম সিগারেট ধরিয়ে বলল। "তপুকে মার্ডারের রিভেঞ্জ ব্রতীনবাবুরা নেবে, সে তো জানা। কেলো কতদিন গা ঢাকা দিয়ে বেড়াবে? তবে এখানে পিস্তল-রিভলভার দুই দলেরই আছে শুনেছি। দেখলুমও তো স্বচক্ষে।"

গার্গী একটু হেসে বলল, "গৌতম এত ভীতু জানতুম না। কচি ছেলের মতো ভয়ে সারা!"

গৌতম চুপ করে রইল। ঘনশ্যাম বলল, "তোমার এত ভয়ের কী? তুমি তো কোনও দলে নেই—আউটসাইডার। তাছাড়া এতদিন যখন কেউ তোমাকে জিনিসটা চায়নি, তখন এটা সিওর যে, তপু কাকেও বলে যায়নি। তবে সাবধানে থাকা ভাল। বনবাদাড়ের দিকে যেও-টেও না। বেড়াতে গেলে ঘাটবাজারের ওদিকে যেও। বিউটিফুল স্পট আছে। গঙ্গার নর্থের দিকটা বাজে। সাউথে বরং নিট অ্যান্ড ক্লিন। কেন? গঙ্গার ধারে এত সুন্দর পার্ক করে দিয়েছে মিউনিসিপ্যালিটি। সে কাদের জন্য?"

সে অভ্যাস মতো বকবক করতে লাগল। একটু পরে গার্গী দু'কাপ চা এনে দিল। হেরিকেনটা ঘরের দরজার সামনে রেখে নিজের কাপটা নিয়ে মেঝেয় বসল। গৌতম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ও কী! তুমি মেঝেয় বসবে আর আমি চেয়ারে বসে থাকব—"

ঘনশ্যাম তার হাত ধরে টেনে চেয়ারে বসাল। "ও সব ফর্মালিটি রাখো তো! তোমার বৌদির মেঝেয় বসা অভ্যাস আছে।"

গার্গী বাঁকা হেসে বলল, "অভ্যাস আছে বৈকি! ছোটবেলা থেকে মেঝেয় বসে খেয়ে বড় হয়েছি। আমার বাবা চেয়ারটেবিলে বসে খাওয়া পছন্দ করতেন না। করলেই বা ডাইনিং চেয়ারটেবিল কেনার পয়সা পাবেন কোথায়?"

"কী কথায় কী?" ঘনশ্যাম খিকখিক করে হাসল। "ব্যাপারটা খুলেই বলি গৌতম।

আসলে এই কোয়ার্টারটা পরস্মৈপদী। আজ আছি, কাল নেই। তাই সাজানোর জন্য ফার্নিচার কিনিনি। ঠাকুরের কৃপায় বারাসাতে একটুখানি জায়গা কিনে রেখেছি। সেখানেও তো ভাড়াবাড়িতে মানুষ হয়েছিলুম। ইচ্ছে আছে, সামনের বছর থেকে বাড়িটা শুরু করব। মেন্টাল হসপিট্যালের স্টাফ-কোয়ার্টার নেই। তো কী করব বলো? তোমার বৌদির নিজের ঘরবাড়ি হবে। সেখানেই থাকবে। চেষ্টাচরিত্র করে যদি কলকাতায় কোনও হসপিট্যালে ট্রান্সফার হতে পারি, আর অসুবিধে কিসের? ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করব। মোট কথা, এই হচ্ছে আমার ফিউচার প্ল্যান!" চায়ে চুমুক দিল ঘনশ্যাম। "ভাই গৌতম! এই পৃথিবীতে যার পায়ের তলায় নিজের মাটি নেই, তার কিছু নেই।"

গৌতম বলল, "ঠিক বলেছেন শ্যামদা।"

গার্গী বলল, "বাড়ি হতে হতে আমি বুড়ি হয়ে গঙ্গাযাত্রা করব। হুঁ, বাড়ির কথা শুধু কানেই শুনি!"

আলো এসে গেল। গৌতম চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে উঠল। "চলি শ্যামদা! চলি গার্গী—" বলেই সে জিভ কাটল। "সরি! মাঝে মাঝে গার্গীবৌদি বলে ফেলি।" আসলে সে সামলে নিল।

ঘনশ্যাম বলল, "কী আশ্চর্য! আমাকে শ্যামদা বললে ওকেই বা গার্গীবৌদি বলবে না কেন? শুধু গার্গী বললেও কোনও দোষ দেখি না। আজকাল নাম ধরে ডাকার ফ্যাশান হয়েছে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের। দেখ ভাই, আমাকে চেহারা হাবভাবে সেকালে দেখালেও আমি মডার্ন মাইন্ডেড।"

গৌতম সিরিয়াস হয়ে বলল, "হ্যাঁ। সেটা বোঝা যায় তা নাহলে—"

তাকে থামিয়ে ঘনশ্যামও সিরিয়াস হয়ে বলল, "তুমি আমার ভাইয়ের মতো। তা ছাড়া তোমরা সমবয়সী। পরস্পর ফ্রিলি মিশবে। এতে দোষটা কোথায়?"

গার্গী তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছিল। কথাটা এতদিনের অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস করা চলে। ঘনশ্যামের নির্বিকার মুখ দেখে অবশ্য মনের কথা বোঝা কঠিন। কিন্তু এখনও এমন কোন আচরণ চোখে পড়েনি, যাতে গার্গী ভাবতে পারে, তার স্বামী তার চরিত্র সম্পর্কে সন্দিগ্ধ।

তবু একবার যাচাই করার ইচ্ছে পেয়ে বসল গার্গীকে। গৌতম চলে যাওয়ার পর সে বলল, "শোনো! কাল থেকে আমি আর গৌতমের সঙ্গে মিশব না।"

ঘনশ্যাম তাকাল। "কেন মিশবে না?"

"এমনি।"

একটু পরে ঘনশ্যাম আস্তে বলল, "ও কোন খারাপ ব্যবহার করেছে?"

গার্গী ঝাঁঝাল স্বরে বলল, "না।"

"তা হলে?"

একটু চুপ করে থাকার পর গার্গী বলল, "কবে লোকে কী বলবে-টলবে। আমার ভাবতে খারাপ লাগে।"

ঘনশ্যাম সিগারেট ধরাল। ধোঁয়ার সঙ্গে বলল, "লোকের কথায় ধার আমি ধারি

"নাহ্। কলকাতায় আমি একবার দুদলের বোমাবাজির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলুম। তারপর পুলিশের গাড়ি এল। এক অফিসার রিভলভার থেকে ফায়ার করল। ঠিক সেই রকম শব্দ। ওঠ! এখানে থাকা ঠিক নয়।"

দুজনে বাঁধ ধরে ফিরে এল। তখনও ঘনশ্যাম ফেরেনি। পৌনে ছটায় আজকাল আবছা আঁধার হয়ে যায়। তাতে পুজোর পর আবার লোডশেডিং বেড়ে গেছে। গার্গী হেরিকেন জ্বেলেছে সবে ঘনশ্যাম সাইকেলের বেল বাজিয়ে ফিরল। গৌতমকে দেখে সে হাসল। "যাক্ গে! আমি ভেবেছিলাম, তোমার বৌদি একা থাকবে। লোডশেডিং তাছাড়া ওই ছাতিমগাছটার পেত্নীর ভয়।"

গার্গী বলল, "আমার ভয়টয় নেই।"

সে হেরিকেনটা কিচেনের সামনে টেবিলে রেখে কুকার জ্বালাল। গৌতমকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। ঘনশ্যাম বলল, "কী গৌতম? বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করেছ নাকি?"

গৌতম আস্তে বলল, "বিকেলে জঙ্গলের ওদিকে রিভলভারের গুলির শব্দ শুনলুম শ্যামদা! কী ব্যাপার কে জানে! আমরা বেড়াতে যাচ্ছিলুম। পালিয়ে এলুম তক্ষুণি।"

ঘনশ্যাম চমকানো স্বরে বলল, "বলো কী? কাকেও দেখতে পাওনি?"

"নাহ্। শব্দটা ঠিক ট্রেস করতে পারিনি।"

"দেখ আবার কোনও খুনজখম হলো নাকি।" ঘনশ্যাম সিগারেট ধরিয়ে বলল "তপুকে মার্ডারের রিভেঞ্জ ব্রতীনবাবুরা নেবে, সে তো জানা। কেলো কতদিন গা ঢাকা দিয়ে বেড়াবে? তবে এখানে পিস্তল-রিভলভার দুই দলেরই আছে শুনেছি দেখলুমও তো স্বচক্ষে।"

গার্গী একটু হেসে বলল, "গৌতম এত ভীতু জানতুম না। কচি ছেলের মতো ভয়ে সারা!"

গৌতম চুপ করে রইল। ঘনশ্যাম বলল, "তোমার এত ভয়ের কী? তুমি তো কোনও দলে নেই—আউটসাইডার। তাছাড়া এতদিন যখন কেউ তোমাকে জিনিসটা চায়নি, তখন এটা সিওর যে, তপু কাকেও বলে যায়নি। তবে সাবধানে থাকা ভাল বনবাদাড়ের দিকে যেও-টেও না। বেড়াতে গেলে ঘাটবাজারের ওদিকে যেও। বিউটিফুল স্পট আছে। গঙ্গার নর্থের দিকটা বাজে। সাউথে বরং নিট অ্যান্ড ক্লিন। কেন গঙ্গার ধারে এত সুন্দর পার্ক করে দিয়েছে মিউনিসিপ্যালিটি। সে কাদের জন্য?"

সে অভ্যাস মতো বকবক করতে লাগল। একটু পরে গার্গী দু'কাপ চা এনে দিল হেরিকেনটা ঘরের দরজার সামনে রেখে নিজের কাপটা নিয়ে মেঝেয় বসল। গৌতম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ও কী! তুমি মেঝেয় বসবে আর আমি চেয়ারে বসে থাকব—"

ঘনশ্যাম তার হাত ধরে টেনে চেয়ারে বসাল। "ও সব ফর্মালিটি রাখো তো তোমার বৌদির মেঝেয় বসা অভ্যাস আছে।"

গার্গী বাঁকা হেসে বলল, "অভ্যাস আছে বৈকি। ছোটবেলা থেকে মেঝেয় বসে খেয়ে বড় হয়েছি। আমার বাবা চেয়ারটেবিলে বসে খাওয়া পছন্দ করতেন না। করলেই বা ডাইনিং চেয়ারটেবিল কেনার পয়সা পাবেন কোথায়?"

"কী কথায় কী?" ঘনশ্যাম খিকখিক করে হাসল। "ব্যাপারটা খুলেই বলি গৌতম

আসলে এই কোয়ার্টারটা পরস্মৈপদী। আজ আছি, কাল নেই। তাই সাজানোর জন্য ফার্নিচার কিনিনি। ঠাকুরের কৃপায় বারাসাতে একটুখানি জায়গা কিনে রেখেছি। সেখানেও তো ভাড়াবাড়িতে মানুষ হয়েছিলুম। ইচ্ছে আছে, সামনের বছর থেকে বাড়িটা শুরু করব। মেন্টাল হসপিট্যালের স্টাফ-কোয়ার্টার নেই। তো কী করব বলো? তোমার বৌদির নিজের ঘরবাড়ি হবে। সেখানেই থাকবে। চেষ্টাচরিত্র করে যদি কলকাতায় কোনও হসপিট্যালে ট্রান্সফার হতে পারি, আর অসুবিধে কিসের? ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করব। মোট কথা, এই হচ্ছে আমার ফিউচার প্ল্যান!" চায়ে চুমুক দিল ঘনশ্যাম। "ভাই গৌতম! এই পৃথিবীতে যার পায়ের তলায় নিজের মাটি নেই, তার কিছু নেই।"

গৌতম বলল, "ঠিক বলেছেন শ্যামদা।"

গার্গী বলল, "বাড়ি হতে হতে আমি বুড়ি হয়ে গঙ্গাযাত্রা করব। হুঁ, বাড়ির কথা শুধু কানেই শুনি!"

আলো এসে গেল। গৌতম চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে উঠল। "চলি শ্যামদা! চলি গার্গী—" বলেই সে জিভ কাটল। "সরি! মাঝে মাঝে গার্গীবৌদি বলে ফেলি।" আসলে সে সামলে নিল।

ঘনশ্যাম বলল, "কী আশ্চর্য! আমাকে শ্যামদা বললে ওকেই বা গার্গীবৌদি বলবে না কেন? শুধু গার্গী বললেও কোনও দোষ দেখি না। আজকাল নাম ধরে ডাকার ফ্যাশান হয়েছে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের। দেখ ভাই, আমাকে চেহারা হাবভাবে সেকালে দেখালেও আমি মডার্ন মাইন্ডেড।"

গৌতম সিরিয়াস হয়ে বলল, "হ্যাঁ। সেটা বোঝা যায় তা নাহলে—"

তাকে থামিয়ে ঘনশ্যামও সিরিয়াস হয়ে বলল, "তুমি আমার ভাইয়ের মতো। তা ছাড়া তোমরা সমবয়সী। পরস্পর ফ্রিলি মিশবে। এতে দোষটা কোথায়?"

গার্গী তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছিল। কথাটা এতদিনের অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস করা চলে। ঘনশ্যামের নির্বিকার মুখ দেখে অবশ্য মনের কথা বোঝা কঠিন। কিন্তু এখনও এমন কোন আচরণ চোখে পড়েনি, যাতে গার্গী ভাবতে পারে, তার স্বামী তার চরিত্র সম্পর্কে সন্দিগ্ধ।

তবু একবার যাচাই করার ইচ্ছে পেয়ে বসল গার্গীকে। গৌতম চলে যাওয়ার পর সে বলল, "শোনো! কাল থেকে আমি আর গৌতমের সঙ্গে মিশব না।"

ঘনশ্যাম তাকাল। "কেন মিশবে না?"

"এমনি।"

একটু পরে ঘনশ্যাম আস্তে বলল, "ও কোন খারাপ ব্যবহার করেছে?"

গার্গী ঝাঁঝাল স্বরে বলল, "না।"

"তা হলে?"

একটু চুপ করে থাকার পর গার্গী বলল, "কবে লোকে কী বলবে-টলবে। আমার ভাবতে খারাপ লাগে।"

ঘনশ্যাম সিগারেট ধরাল। ধোঁয়ার সঙ্গে বলল, "লোকের কথায় ধার আমি ধারি

না। যে যা খুশি বলুক। এই যে তুমি একা থাকো, কে তোমাকে গার্ড দেবে? গৌতম অনেস্ট ছেলে। আমি ওকে স্টাডি করেই তোমার সঙ্গে মিশতে দিয়েছি।"

গার্গী চোখে হেসে বলল, "আমি খারাপ হতে পারি তো?"

ঘনশ্যাম হাসল। "কেউ খারাপ হলে আমার সাধ্য কী ঠেকাই? তবে লোককে স্টাডি করা আমার স্বভাব। ইচ্ছে থাকলেও অনেকে খারাপ হতে পারে না। বিশেষ করে মেয়েরা। কেন জানো? খারাপ হতে গেলে সাহসের দরকার হয়। ভাল হবার জন্য কোনও সাহস লাগে না।"

গার্গী মনে মনে বলল, শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর!...

সকালে ঘনশ্যাম বাজার থেকে ফিরে বলল, "যা বলেছিলুম! দুই গ্যাংয়ে বেধে গেল বলে! ঘাটের ওদিকে কারা এক পোস্টার সেঁটেছে। সাংঘাতিক সব কথা লেখা।"

গার্গী বাজারের থলে নিয়ে বলল, "কী লেখা?"

ঘনশ্যাম বারান্দায় চেয়ারে বসে মুখে রহস্য ফুটিয়ে বলল, "লাল কালিতে লিখেছে : তপুকে আমরা ভুলছি না। ভুলব না। তারপর লিখেছে : "আমাদের হিটলিস্ট ক খ গ ঘ।"

"তার মানে?"

"কিছু বোঝা গেল না। ভিড় করে সবাই দেখছে। কেউ কেউ বলল, ক-তে কালিচরণ, তার মানে কেলো। খ-তে খোকা। ওর আসল নাম জানি না। গ-তে গোপেশ্বরবাবু এম এল এ, সেটা বোঝাই যায়। ঘ-তে হয়তো আমি!" ঘনশ্যাম হেসে ফেলল।

গার্গী বলল, "বাজে কথা বোল না তো!"

"দাশু হাজরা ঠাট্টা করে বলল, শ্যামবাবু! সাবধান!" ঘনশ্যাম হাসতে গিয়ে গম্ভীর হলো। "অদ্ভুত জায়গা বটে! যা শুনে এসেছিলুম, তার একশো গুণ সাংঘাতিক। হুঁ, ঘ-তে নাকি ঘোঁতন। কে ঘোঁতন জানি না। সবাই বলছে, সে কেলোর ডানহাত।"

"পুলিশকে খবর দেয়নি কেউ?"

"কে জানে! মরুক ব্যাটারা খুনোখুনি করে। আমাদের কী?"

কিছুক্ষণ পরে ঘনশ্যাম অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, গৌতম এল। তার মুখে ছায়া ছমছম করছে। বারান্দার চেয়ারে ধপ করে বসে বলল, "শ্যামদা! সাংঘাতিক সিচুয়েশন। শুনেছেন? ঘাটের ওখানে মন্দিরের গায়ে পোস্টার পড়েছে।"

ঘনশ্যাম বলল, "দেখেছি। হিট্‌লিস্ট দিয়েছে। ক খ গ ঘ কে কে হতে পারে বলো তো? কতজন তো কতরকম বলছে। তোমার আইডিয়াটা শুনি।"

গৌতম বল, "ক কেলো, এটা সিওর। বাকিগুলোব বুঝতে পারছি না।"

"কেন? খ-তে খোকা। খোকাকে তুমি চিনবে সম্ভবত। ওদের ক্লাবে তো যেতে-টেতে তুমি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। খোকা। মানে শ্যামল। ঠিক বলেছেন।" গৌতম একটু নার্ভাস হাসল। "গ আমি নই তো?"

গার্গী বলল, "নাহ্! আমি।"

সে চোখে হাসছিল। ঘনশ্যাম রসিকতা করে বলল, "বলা যায় না। তপুর চোরাই উইপন লুকিয়ে রেখেছিলে তুমি!"

"বেশ করেছি।" বলে গার্গী গৌতমের দিকে তাকাল। "তুমি কি কেলোর গ্যাংয়ের গুণ্ডা যে ভয় পাচ্ছ?"

ঘনশ্যাম একই রসিকতার সুরে বলল, "গৌতমের গ-ও হতে পারে। গৌতমও তপুর উইপন লুকোতে এনেছিল?"

গার্গী চোখ পাকিয়ে বলল, "বাজে জোক কোরোনা তো। কে আড়ি পেতে শুনবে।"

ঘনশ্যাম বলল, "গৌতম এখনও বড্ড ছেলেমানুষ। গ-তে গোপেশ্বরবাবু, তা-ও বুঝতে এত দেরি হচ্ছে? ঘ-তে ঘোঁতন। আমি চিনি-টিনি না। লোকে বলছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঘোঁতন।" গৌতম বলল। "লাল্টুদার ছোটভাই মৃণাল। সাংঘাতিক ছেলে। খোকা আর ঘোঁতন দুজনেই আগে তপুর গ্যাংয়ে ছিল। ক্লাবে যেতে দেখেছি।"

ঘনশ্যাম বেরিয়ে গেল। সাইকেলটা সবুজ রঙ করে নিয়েছে। নতুন দেখাচ্ছে।

গার্গী চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলল, "কিন্তু তুমি ঘন-ঘন এমন করে আসবে না তো! যখন-তখন এসে খালি—"

গৌতম একটু হাসল। "কী খালি? কথাটা পুরো বলো!"

"ন্যাকা! বোঝ না?"

"একটা পদ্যে আছে, রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করে—না কী যেন! সম্ভবত রবিঠাকুরের। অবশ্য সিচুয়েশন খারাপ। কালীপুজো অব্দি কাটিয়ে যাব ভেবেছিলুম। কী করব কে জানে।"

"তুমি যাবে না।"

"আঁচলে বেঁধে রাখবে? শ্যামদা টের পেলে তোমাকে ডিভোর্স করবে।"

"যদি তা-ই করে, আমাকে তুমি—"

গৌতম দ্রুত বলল, "কী বলছ? সবসময় আজকাল তুমি কেন যেন বড্ড সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ গার্গী।"

গার্গী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, "হ্যাঁ, আমি সিরিয়াস। আবার মাঝে মাঝে ভয় হয়, দৈবাৎ ও টের পেলে কী হবে? যদি সত্যি আমাকে তাড়িয়ে দেয়, কোথায় যাব আমি? কার কাছে যাব?"

গার্গীর চোখে জল দেখে গৌতম বলল, "তুমি কেন ওসব ভাবছ? আমি তো আছি?"

"এখন বলছ। তখন—" গার্গী হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ঘরে ঢুকে গেল। খাটে বসে বালিশে মুখ গুঁজল।

গৌতম গিয়ে তার পিঠে হাত রেখে বলল, "গার্গী! শোনো! প্লিজ—কাঁদে না! আহ্! আমার কথাটা তো শোনো!"

গার্গী সোজা হয়ে বসল। চোখ মুছে বলল, "আমার ভীষণ ভয় করে, গৌতম! একজনের কাছে বিশ্বাস হারানো পাপ মনে হয়। যদি সত্যি জানাজানি হয়, আমার ওই ছাতিম গাছে ঝুলে মরা ছাড়া উপায় থাকবে না।"

গৌতম তার ঠোঁটে চুমু খেয়ে হাসতে হাসতে বলল, "পাগলী কোথাকার! মরতে হলে ঝুলে মরবে কেন? আমি পটাসিয়াম সাইনাইড এনে দেব। মরছ তা জানতেও পারবে না?"

"তুমি ব্যাপারটা লাইটলি নিও না গৌতম! আমার মনে হয়, এবার আমাদের পরস্পর দূরে যাওয়া ভালো।"

গৌতম ভুরু কুঁচকে তাকাল! "আমাকে আর সহ্য হচ্ছে না এই তো?"

"আহ্। তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো।"

"দেখ গার্গী। তুমি আর আমি বাচ্চা নই। তুমি আমি দু'জনে জেনেশুনেই একটা খেলা খেলে চলেছি।"

"খেলা? তুমি একে খেলা বলছ?"

"ওক্কে! জীবন-মরণ খেলা বলা যাক্। তো হ্যাঁ—একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে, আই এগ্রি। আমরা বড় বেশি শরীর নিয়ে খেলছি। এখানেই কি তোমার ভয়? দেখ গার্গী, হিউম্যান বডিকে কেন্দ্র করেই মানুষের সবকিছু। কাজেই এতে কোনও পাপ-টাপ নেই। আসল কথাটা হলো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি কি না। যদি আমার কথা বলো, আমি তোমাকে ভীষণ ভী-ষ-ণ ভালোবাসি, গার্গী! হিউম্যান বডি ঘেঁটে ছ'টা বছর আমার কাটছে। হিউম্যান বডির মধ্যে কী সব হেভেনলি চার্ম আছে, সেটা তুমিই আমাকে জানিয়ে দিয়েছ।"

গার্গী বাধা দিয়ে বলল, "ফিলসফি ছেড়ে একটু প্র্যাকটিক্যাল হও। রিস্কটা তুমি বুঝতে চেষ্টা করো আমার দিক থেকে।"

"ঠিক আছে। আমি আর আসব না।"

"আহ্, আমি তা বলিনি। তুমি বড় অবুঝ গৌতম! আমাদের সাবধান হওয়া দরকার।"

গৌতম হাসল। "ওক্কে! শরীরের খেলাটা কমিয়ে দেব। বডিগার্ডের চাকরিই করব।"

গার্গী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি বসো। আমি স্নান করে নিই। রান্না চাপাতে হবে।"...

এদিনও সন্ধ্যায় লোডশেডিং। গৌতম কিছুক্ষণ ঘনশ্যামের অপেক্ষা করে চলে গেল। বলে গেল, "ভয় পেয়ো না। টর্চটা হাতের কাছে রাখো। শ্যামদা এখনই এসে যাবে। আমার একটা কাজ আছে। না হলে থাকতুম।"

চারদিক জুড়ে আঁধার। গুমোট গরম। হেরিকেনের আলো বারান্দায় রেখে দাঁড়িয়ে রইল গার্গী। তার গা ছমছম করছিল। এত দেরি করছে কেন লোকটা?

কিছুক্ষণ পরে ঘনশ্যাম ফিরল। বলল, "ডেঞ্জারাস ব্যাপার! কিছুক্ষণ আগে করালী কবরেজমশাইকে কে গুলি করে মার্ডার করেছে। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে। একা বসেছিলেন গঙ্গার ধারের পার্কে। দেখ তো কী সাংঘাতিক কাণ্ড। বুড়ো মানুষ। দূর সম্পর্কে গোপেশ্বরবাবুর কাকা। এই অপরাধ।" সে শ্বাস ছেড়ে ফের বলল, "তবে এই কাঁটালিয়াঘাটে কে কেমন লোক, বলা কঠিন। নিশ্চয় কোনও সিক্রেট ব্যাপার আছে। তা না হলে বুড়ো

মানুষকে মারবে কেন? মাথার পেছনে গুলি। বুঝলে? দেখতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। পুলিশ এসে গেছে।”

গার্গী চা করতে গেল। সেই সময় আলো এল...

## ।। ছয় ।।

কাঁটালিয়াঘাটে মারামারি খুনোখুনি লোকের গা-সওয়া। ভোটের রাজনীতির হাওয়া উঠলে এটা বেড়ে যায়। কিন্তু এই শরতে ভোটের হাওয়া নেই। তপু খুন হওয়ার পর চাপা উত্তেজনা থাকলেও লোকে আশঙ্কা করেছিল, যে-কোনও সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধতে পারে বড়জোর। কিন্তু এমন করে পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদী রীতিতে খুনোখুনি হওয়ার কথা কেউ কল্পনাও করেনি। পদ্ধতিটা একেবারে নতুন। তাই সন্ত্রাসের শিহরন ছড়িয়ে পড়েছিল প্রতিটি মানুষের মনে। সন্ধ্যার আগেই ঘাটবাজার খাঁ খাঁ হয়ে যাচ্ছিল। রাস্তাঘাটে কদাচিৎ মানুষজন দেখা যাচ্ছিল। এম এল এ বাবুর আত্মীয় ছিলেন করালী কবিরাজ। সত্তরের ওপর বয়স। লাঠি হাতে চলাফেরা করেন। তাঁকে খুন করার একটা কারণ অবশ্য আঁচ করেছিল লোকে। তাঁর ছোটছেলে গোপাল কেলোর দলে ভিড়েছিল। তপু খুন হওয়ার পর গা ঢাকা দিয়েছে। পুলিশের খাতায় সে অন্যতম আসামী। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সব দিক বজায় রেখে চলতে হয়। কাঁটালিয়াঘাটে পরদিনই বাইরে থেকে আরও পুলিশ এনে মোতায়েন করা হয়েছে। গঙ্গার ধারে নেতাজি পার্কে পুলিশ রাইফেল হাতে টহল দিচ্ছে। গলিঘুঁজির মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র পুলিশ। তবু লোকের স্বস্তি নেই। হিট্‌লিস্টের ক যে কবরেজমশাই, কেউ কল্পনাও করেনি। এবার দ্বিতীয় নামের আদ্যক্ষর খ। যাদের নামের গোড়ায় খ আছে, তারা আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেছে। যারা নির্দল নির্বিরোধী খ, তারাও খুঁটিয়ে চিন্তাভাবনা করছে, কোনও সূত্রে দুই শিবিরের সঙ্গে অতীতেও দৈবাৎ কোনও সম্পর্ক ছিল কি না।

দিনের বেলায় ততকিছু আতঙ্ক নেই অবশ্য। কিন্তু সন্ধ্যার মুখে ওই লোডশেডিং বড় বিপত্তিকর। বিদ্যুৎ সাবস্টেশনে গোপেশ্বরবাবু এবং পুলিশ অফিসাররা এ নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ অফিসাররা জানিয়েছেন, তাঁদের কিছু করার নেই। কখন কোন ট্রান্সমিশন লাইন ট্রিপ পরবে, আগে থেকে বলা কঠিন। তবু তাঁরা চেষ্টা করবেন, যাতে লোডশেডিং যতটা সম্ভব কমানো যায়।

কবরেজমশাই খুন হওয়ার পর তিনটে দিন আর কিছু ঘটল না। ঘনশ্যাম বিকেলে বেড়াতে যেতে নিষেধ করেছিল গার্গীকে। একটা লুডো কিনে এনে দিয়েছিল। বলেছিল, “বরং ঘরে বসে লুডো খেলবে। গৌতম না এলে একা-একা খেলবে। সময় কেটে যাবে। আমি সকাল-সকাল ফিরতে চেষ্টা করব।”

গৌতম এই তিনটে দিন কম এসেছে। গার্গী অভিমান দেখিয়েছে। অভিমান ভাঙাতে অনেক আদর করেছে গৌতম। বলেছে, “আসলে মা বড্ড কড়াকড়ি শুরু করেছেন। সবেধন নীলমণি আমি। এনিওয়ে, রাগটাগ ছেড়ে লুডো বের করো। খেলি।”

লুডো খেলতে খেলতে হঠাৎ একসময়—

যৌবন যৌবনের কাছাকাছি হলে হয়তো এটাই অনিবার্য। শরীরে-শরীরে সাপলুডো খেলা।

সেদিন বিকেলে গার্গী জেদ ধরল, "চলো কিছুক্ষণ ঘুরে আসি। বাড়িতে থেকে হাঁপ ধরে গেল। এখানে আসার পর কী যে হয়েছে, বিকেলটা বাইরে ছুটোছুটি করে বেড়াতে ইচ্ছে করে।"

গৌতম বলল, "আমারও। কলকাতায় থাকলে একরকম। এখানে এলে অন্যরকম। খালি টো-টো করে ঘুরতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তোমার বর জানতে পারলে চটে যাবে যে!"

"বেশি দূর যাব না। বাঁধের ওপর কিছুক্ষণ ঘুরব।"

দুজনে বেরুল। ছাতিম গাছটার পাশ দিয়ে গিয়ে বাঁধে উঠল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে কী এক নেশায় পেয়ে গেল গার্গীকে। বলল, "চলো, স্লুইস গেটে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি।"

ডাইনে গঙ্গা, গাছপালার ফাঁকে। বাঁ-দিকে পোড়ো ইটভাটার খাল আর ঝোপঝাড়। একটা জল নিকাশি নালা এসে গঙ্গায় মিশেছে। সেখানে স্লুইস গেট। ছোট্ট ব্রিজ। ব্রিজের কালভার্টে পাশাপাশি দু'জনে বসল।

ওরা কথা বলছিল। নির্জন প্রকৃতিতে প্রেমিক-প্রেমিকারা যে-সব কথা বলে, চপল মাদকতাময় সেইসব কথা। হাতের সঙ্গে হাতের খেলা। প্রকৃতিতে যে স্বাধীনতা ছড়িয়ে আছে, সেই স্বাধীনতা ভূতের মতো পেয়ে বসেছিল।

একবার বাঁ-দিকে, যে পথে এসেছে ওরা, ঘুরে গার্গী দেখেছিল, দূরে বাঁধের নিচে একটুকরো ঘাসের জমিতে মাথায় টুপিপরা একটা লোক দু'হাঁটুতে হাত রেখে ঝুঁকল। তারপর সোজা হলো এবং হঠাৎ মাটিতে মাথা ঠেকাল। বাঁধের ওপর একটা সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে। গার্গী বলল, "ও কী করছে লোকটা?"

গৌতম হাসল, "নামাজ পড়ছে। তুমি মুসলমানদের নামাজ পড়া দেখনি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখেছি।"

"আমার বেশ লাগে এই ব্যাপারটা। নির্জনে কারও কাছে সারেন্ডার করা।"

"আমরা প্রণাম করি। সে-ও সারেন্ডার।"

"আমি করি একমাত্র তোমার কাছে।"

"ছিঃ! ও কী কথা!"

"সত্যি গার্গী! ওসব ঈশ্বর-টিশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই। তবে হ্যাঁ, একটা ন্যাচারাল ব্লাইন্ড ফোর্স আছে ফিল করি।"

"ব্লাইন্ড বলছ কেন?"

"অব কোর্স ব্লাইন্ড! তা না হলে মানুষ যা খুশি করতে পারছে কেন? তুমি ভেবে দেখ, এত খুনোখুনি এত সব যুদ্ধ—একেকটা যুদ্ধ কী সাংঘাতিক ব্যাপার কল্পনা করো। তারপর ফ্লাড। আমি মেডিকেল টিমে কতবার কত জায়গায় ফ্লাডের সময় গেছি। ওঃ! হরিফাইং! ব্লাইন্ড ফোর্স ছাড়া কী?"

আজ এলোমেলো বাতাস বইছিল। দিনশেষের ধূসরতা ঘনিয়ে এসেছে কখন, কথায় কথায় দু'জনেরই খেয়াল হয়নি। গৌতম বলল, "এই! এবার উঠে পড়ো।"

দুজন বাঁধের উপর দিয়ে ফিরে আসছিল। গার্গী গুন গুন করে কি গান গাইছিল। গৌতম বলল, "বাহ্! তুমি এত ভালো গাইতে পারো, অথচ চেপে রেখেছ? গলা ছেড়ে গাও!"

গার্গী বলল, 'ভ্যাট! ও কিছু না।"

বাঁ-দিকে গঙ্গা ধারে গাছপালায় পাখিরা তুমুল চ্যাঁচামেচি করছে। দূরে রেল লাইনে একটা মালগাড়ির শব্দ কতক্ষণ। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কাঁটালিয়াঘাট টাউনশিপে আলো জ্বলে উঠেছে এখনই। আজ হয়তো লোডশেডিং হবে না। বাঁক ঘুরে ধূসর আলোয় সেই সাইকেলটা দেখা গেল। একই ভাবে বাঁধের উপর দাঁড় করানো আছে।

কিছুটা এগিয়ে যাবার পর গৌতম থমকে দাঁড়াল। গার্গী বলল, "কী ব্যাপার?"

গৌতম বলল, "লোকটা—এসো তো দেখি।"

সে চলার গতি বাড়াল। গার্গী একটু পিছিয়ে পড়ল। গৌতম সাইকেলটার কাছে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়েছে। তারপর গার্গী দেখল, সে নিচের ঘাস জমিতে নামল।

গার্গী তখনও বুঝতে পারেনি, কী হয়েছে।

কাছাকাছি গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। সেই নামাজপড়া লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে ঘাসে। দুটো হাত সামনে ছড়ানো। তার টুপিটা খসে পড়েছে। মাথার একটা পাশ থেকে টাটকা রক্ত গড়িয়ে তার কাঁধ এবং পিঠ অব্দি জামাকে রাঙিয়ে দিয়েছে। গার্গী মুখ ফিরিয়ে নিল।

গৌতম কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "মার্ডার! এখানে থাকা উচিত নয় আর। চলো!"

দু'জনে হন্তদন্ত হাঁটতে থাকল। গার্গী হাঁটতে পারছিল না। আতঙ্কে তার গলা শুকিয়ে গেছে। কোনও কথা বলতে পারছিল না সে।

ছাতিম তলায় পৌঁছে গৌতম বলল, "কী করা উচিত, বুঝতে পারছি না। পুলিশকে খবর দিতে গেলে জেরার চোটে অস্থির করবে। এস তো!"

ঘনশ্যাম বাড়িতে ছিল। গৌতম ও গার্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাসল। "পেত্নীটা তাড়া করেছে নাকি?"

গৌতম ব্যস্তভাবে বলল, "আবার মার্ডার। এক মুসলমান ভদ্রলোককে নামাজ পড়তে দেখেছিলুম। ফেরার সময় দেখি, মার্ডার্ড হয়ে পড়ে আছেন। একটা সাইকেল—"

ঘনশ্যাম চমকে উঠেছিল। দ্রুত বলল, "সর্বনাশ! খয়রুল হাজি নয় তো? ফেরার সময় দেখা হয়েছিল। বলল, মাঠে ধান দেখতে যাচ্ছি।"

গৌতম বলল, "কী করা উচিত বলুন তো শ্যামদা?"

ঘনশ্যাম একটু ভেবে নিয়ে বলল, "পুলিশ—নাহ্! ওদিকটা লোকজন ছিল না?"

"নাহ্। কাকেও তো দেখলুম না।"

"মুসলমানপাড়ায় খবর না হয় দিলে। কিন্তু ওরা পুলিশকে তোমার কথা বলবে। সে-ও এক বিপদ। পুলিশ জেরা করবে, ওদিকে কেন গিয়েছিলে।"

"আমিও ঠিক তা-ই ভেবেছি।"

ঘনশ্যাম গম্ভীর মুখে বলল, "তোমার বৌদি সঙ্গে ছিল। কাজেই স্ক্যান্ডালেরও রিস্ক্ আছে। বরং চেপে যাও। কেউ না কেউ বডি দেখতে পাবে।"

গার্গী দরজার কাছে মেঝেয় বসে পড়েছিল। ঘনশ্যাম তাকে বলল, "তোমাদের বলেছিলুম, বাইরে যেও-টেও না। বড্ড জেদ তোমার। আর গেলে গেলে, ওই নিরিবিলি শ্মশানমশান জঙ্গল এলাকায়। যাও, হাতেমুখে জল দাও। ঘাড়ে জল দিও। নার্ভাসনেস কেটে যাবে। একটা ট্যাবলেট দিচ্ছি। খেয়ে নিও। মার্ডার-ফার্ডার দেখলে প্রচণ্ড শক লাগে নার্ভে। বিশেষ করে মেয়েদের। ওঠ, আমি চা করে দিচ্ছি। গরম-গরম চায়ের সঙ্গে ট্যাবলেটটা খেয়ে নেবে।"

গৌতম বলল, "আমি যাচ্ছি শ্যামদা।"

"নো, নো!" ঘনশ্যাম হাত নাড়ল। "আগে ব্রেন ঠাণ্ডা করে নাও। হাতমুখ ধোও। চা খাও। কিছুক্ষণ বসো।"

সে কিচেনের সামনে গেল চা করতে। কুকার জ্বেলে কেটলি চাপিয়ে এসে দেখল, গার্গী বাথরুমে ঢুকেছে। সে গৌতমকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বন্ধ বাথরুমের ভেতর গার্গীর ওয়াক তোলার শব্দ শোনা গেল। বাথরুমের দরজায় গিয়ে সে বলল, "বমি হচ্ছে নাকি? নিজের জেদে খালি কষ্ট পাবে। মার্ডার্ড বডি দেখলে আমারও ভীষণ গা ঘুলোয়।"

একটু পরে গার্গী বেরিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘনশ্যাম দরজার কাছ থেকে বলল, "বমি বন্ধের ট্যাবলেট দেব?"

গার্গী আস্তে বলল, "না।"

বমিভাবটা নতুন নয়। ক'দিন থেকে এটা হচ্ছে। সে একটা কিছু আঁচ করেছে, শরীরে যেন কী একটা পরিবর্তন ঘটেছে। মুখ ফুটে বলতে বেধেছে স্বামীকে। গৌতমকেও বলেনি। শরীর জুড়ে কী এক নতুন অনুভূতি।

গৌতম হাতমুখ ধুয়ে এসে চেয়ারে বসল। ঘনশ্যাম চা করে আনল। গৌতমকে দিয়ে সে ঘরে গেল গার্গীকে চা দিতে। গার্গী হাত নেড়ে বলল, "নাহ্। বমি হয়ে যাবে।"

"কিচ্ছু হবে না। ওটা নার্ভাসনেস। একটা ট্যাবলেট দিচ্ছি।"

"আহ্ চা খাব না।" গার্গী পাশ ফিরে শুল।

ঘনশ্যাম বাইরের চেয়ারে বসে বলল, "খয়রুল হাজিকে কী ভাবে মেরেছে দেখলে।"

গৌতম চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "মাথার বাঁ-দিকে গুলি করেছে মনে হলো।"

"গুলি? তার মানে কবরেজমশাইয়ের মতো?"

"হ্যাঁ। সম্ভবত মাটিতে মাথা লুটিয়ে নামাজ পড়ার সময় গুলি করেছে। বাঁ-দিকে ঝোপের আড়াল দিয়ে মার্ডারার এসে গুলি করেছে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জেও হতে পারে।"

"তোমরা কোথায় ছিলে? কত দূরে?"

"স্লুইস গেটে বসেছিলুম।"

"গুলির শব্দ শুনতে পাওনি?"

"নাহ্। উল্টোদিকে বাতাস। তাছাড়া মালগাড়ির শব্দ হচ্ছিল।"

ঘনশ্যাম একটা সিগারেট ধরিয়ে ধুপচাপ টানতে থাকল। তারপর বলল, "তা হলে খ-তে খয়রুল হাজি। হাজিসায়েবও গোপেশ্বরবাবুর পার্টির লোক। কিন্তু আমার ভাবনা হচ্ছে, এই থেকে না কমিউন্যাল কিছু বেধে যায়।"

গার্গী দ্রুত বেরিয়ে এসে বাথরুমে ঢুকল। আবার বমির শব্দ। ঘনশ্যাম হন্তদন্ত গিয়ে বলল, "ধরব? দেখো, মাথা ঘুরে পড়ে যেও না।"

গৌতম চায়ের কাপ রেখে উঠে দাঁড়াল। "শ্যামদা! আমি চলি।" বলে সে বেরিয়ে গেল।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ ঘনশ্যাম সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, "এ মাসে তোমার পিরিয়ড হয়নি?"

গার্গী আস্তে বলল, "না।"

"তাই বলো!" ঘনশ্যাম খিকখিক করে হাসল অন্ধকারে। তারপর দু'হাতে গার্গীকে বুকে টেনে বলল, "বোকা মেয়ে! বুঝতে পারছ না তুমি এতদিনে মা হতে চলেছ?"

গার্গী কোনও সাড়া দিল না।...

অনেকদিন বৃষ্টি হয়নি। ধানক্ষেতে জল শুকিয়ে গেছে। খয়রুল হাজি বিকেলে সাইকেলে চেপে উত্তরের মাঠে জমি দেখতে বেরিয়েছিলেন। পরদিন পাম্পসেট বসিয়ে পোড়ো ইটভাটার খাল থেকে জলসেচের ব্যবস্থা করার ইচ্ছা ছিল। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল, তখনও ফিরলেন না। দিনকাল খারাপ। তাঁর ছেলেরা লোকজন নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র আর টর্চ নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিল তাঁকে। বাঁধে সাইকেল দাঁড় করানো দেখে তারা ছুটে যায়। মাথায় রক্ত মেখে হাজি সাহেবকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে।

আবার কাঁটালিয়াঘাটে ঝিমিয়ে পড়া সন্ত্রাস ফিরে এল। হিট্ লিস্টে খ ছিল। খয়রুল হাজির বডি পড়ল। লোকেরা তাঁর ছেলেদের বকাবকি করল। নামে খ আছে, অথচ বাবাকে তারা সাবধান করে দেয়নি কেন? তারা আসলে ভেবেছিল এটা হিন্দু পাড়ার বাবুদের দলাদলি।

আজকাল সব দলাদলিই রাজনীতির। রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান নেই। আর রাজনীতিরই চাপে ই এফ আর পর্যন্ত এসে গেল। দৈবাৎ না হিন্দু-মুসলমান বেধে যায়। কাঁটালিয়াঘাট পুলিশে-বন্দুকে আবার ছয়লাপ। সন্ধ্যার পর টহলদারি। ১৪৪ ধারা জারি। ঘাটবাজার খাঁ খাঁ করে।

কিন্তু কালীপুজোর দিন এসে গেল। কোনও গ-এর মৃত্যু হলো না। কাঁটালিয়াঘাটে কালীপুজোরই ধুমটা বেশি। লক্ষ টাকার বাজি পোড়ে। বাইশখানা ঠাকুর হয়। শ্মশানকালীর পোড়ো মন্দিরের ভোল ফেরানো হয়। ততদিনে সন্ত্রাস কিছুটা থিতিয়ে এলেও এবার তত বেশি ধুম হলো না। গঙ্গার ধারে বাজি অবশ্য পুড়ল। শ্মশানকালীতলায় তান্ত্রিক মোনাখ্যাপা মড়ার খুলিও নাচাল। পুলিশের নির্দেশে যাত্রার আসর বন্ধ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন সকালে গৌতম এল। "শ্যামদা! আমার ছুটি ফুরুল। আগামীকাল মর্নিংয়ে কলকাতা যাচ্ছি। এবার সামনে একজামিনেশন। কোনও দিকে মন দেবার উপায় থাকবে না।"

ঘনশ্যাম বলল। "এঃ হে! বড্ড ভুল হয়ে গেছে। তুমি কাল যাবে জানলে একসঙ্গেই যেতুম।"

"কলকাতা যাবেন নাকি?"

"যাব কী! এক্ষুণি খেয়েই ট্রেন ধরতে যাব। আজ বারাসতে পিসেমশাইয়ের বাড়িতে থাকব। কাল মর্নিংয়ে কলকাতা যাব। রাইটার্সে জরুরী কাজ। খুলেই বলি, তোমার বাবার চিঠি নিয়ে যাচ্ছি ট্রান্সফারের তদ্বিরে।"

"বৌদি যাচ্ছে তো সঙ্গে?"

ঘনশ্যাম একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ওর শরীটা ভাল যাচ্ছে না। এই অবস্থায় ট্রেন জার্নির ধকল—রিস্ক্ নেওয়া উচিত হবে না। তাছাড়া পিসেমশাইয়ের বাড়ি তোমার বৌদি যেতে চায় না।"

গার্গী রান্না করছিল। গৌতম তার দিকে তাকিয়ে বলল, "বৌদি রাত্রে একা থাকতে পারবে? পাড়ার কাকেও—"

গার্গী বলল, "না। আমার জন্য পাহারার দরকার নেই।"

ঘনশ্যাম বলল, "জাস্ট একটা রাত। তোমাকে থাকতে বলতুম। কিন্তু তোমার বাড়িতে কী ভাববে? বরং একটু রাত অব্দি তুমি থেকো। ভোরে এসে খোঁজ নিও।"

গার্গী ঝাঁঝালো স্বরে বলল, "আমার পাহারার দরকার নেই।"

"আহা! দিনকাল খারাপ। যা চলছে এখানে!"

গৌতম কৌতুকে বলল, "এবার হিটলিস্টে গ। সাবধান!"

গার্গী হেসে ফেলল, "তুমিও গ। তুমি সাবধান।"

ঘনশ্যাম খিকখিক করে খুব হাসল। "তারপর ঘ-তে আমি। পরপারে গিয়ে তিনজনের দেখা হবে।" বলে সে বাথরুমে স্নান করতে ঢুকল।...

সারা দুপুর গার্গী ও গৌতম লুডো খেলে আর কথা বলে কাটাল। গৌতম আজ শেষদিন শরীরের খেলা খেলতে চাইছিল। গার্গী তার চোখে চোখ রেখে বলল, "তুমি জানো? আমি মা হতে চলেছি।"

"মাই গুডনেস!" গৌতম চটাস করে একটা চুমু খেল। "অ্যাদ্দিন বলোনি?"

"তুমি তো ডাক্তারি পড়ছ। তোমার বোঝা উচিত ছিল।"

গৌতম একটু চুপ করে থেকে বলল, "ক্রেডিটটা কার? তোমার বরের, না আমার, এটাই প্রশ্ন।"

"শাট্ আপ! খালি অসভ্যতা!" বলে গার্গী উঠে দাঁড়াল। "এই! চলো না আজ শেষদিনের বেড়ানোটা বেড়িয়ে নিই। বেশি দূর যেতে পারব না। কাছাকাছি গঙ্গার ধারে বসে থাকব।"

গৌতম একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, "বেশ তো! চলো!"

দরজায় তালা এঁটে দু'জনে বেরুল। ছাতিমতলা পেরিয়ে বাঁধে উঠে গার্গী বলল, "ওখানটা ফাঁকা জায়গা। চলো, ওখানে গিয়ে বসি।"

গঙ্গার ধারে এখানে কারা অনেকগুলো গাছ কেটে নিয়ে গেছে। গোড়াগুলো খোঁচার মতো দেখাচ্ছে। ঘন দূর্বাঘাসে দু'জনে বসল। একটু পরে গৌতম বলল, "তোমার মায়ের রূপটা মনে ভেসে আসছে। ফিরে এসে দেখব—"

গার্গী তার হাতটা নিয়ে বলল, "ওসব কথা থাক। গিয়েই তো তুমি গার্লফ্রেন্ডের পাল্লায় পড়ে আমাকে ভুলে যাবে।"

গৌতম কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ, বারুদের গন্ধ। সে পড়ে গেল। গার্গী মুখ ঘুরিয়েছিল সহজাত বোধে। আবার তেমনি একটা শব্দ। তার কপালে কী ঢুকে গেল। সে-ও গড়িয়ে পড়ল।...

## ।। সাত ।।

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বাইনোকুলারে বুনোহাঁসের একটা ঝাঁক দেখছিলেন। মরসুমী পরিযায়ী পাখিদেরও এই স্বভাব আছে। যুদ্ধে অগ্রগামী রক্ষীদের ছোট্ট দল শত্রুপক্ষের অবস্থান বুঝে নিতে গোপনে এগিয়ে যায়। বুঝে নিতে চায় পরিবেশের হালচাল। পরিযায়ী পাখিদেরও তাই। অক্টোবর শেষ হয়ে এসেছে। এখনই হিমালয় ডিঙিয়ে গাঙ্গেয় অববাহিকায় বিক্ষিপ্ত কিছু ঝাঁক আগাম এসে পড়েছে।

কয়েক মাইল জুড়ে বিশাল এই জলা পশ্চিমে রেলব্রিজের কাছে কিছুটা অপরিসর। তারপর গঙ্গা অব্দি ছড়িয়ে গেছে চওড়া হয়ে। জলজ দামের আড়ালে হাঁসের ঝাঁকটা লুকোচুরি খেলছে। মাঝে মাঝে উড়ে গিয়ে অন্যখানে বসছে। হাঁসগুলোকে অনুসরণ করতে গিয়ে দক্ষিণের জঙ্গলটা বাইনোকুলারে ধরা দিল। জলার ধারে গাছপালা থাকলে সারসজাতীয় পাখিদের আড্ডা থাকে স্বাভাবিক। সাদা একঝাঁক বক একটা ঝুঁকেপড়া গাছে ফুলের মতো ফুটে আছে। আর একটা গাছের ওপর একলা শামুকখোল ধ্যানে বসেছে। হঠাৎ একটা উডডাক দেখতে পেলেন। অত্যন্ত বিরল প্রজাতির এই পাখি। দেখতে অবিকল ছোট্ট হাঁসের মতো। কিন্তু এরা স্থলচর। কর্নেল জলার উত্তর দিকে ধানক্ষেত আর ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে বাঁধে পৌঁছুলেন।

বিকেলের নরম গোলাপী আলো ছড়িয়ে আছে সবখানে। বাঁধে হন্তদন্ত হাঁটছিলেন কর্নেল। উডডাকটার ছবি তুলবেন। স্লুইস গেটের কাছে পৌঁছে টেলিলেন্স পরালেন ক্যামেরায়। স্লুইস গেটটা খোলা আছে। তলা দিয়ে জেলেদের নৌকো যাতায়াত করে। জলাটা ফিশারিজ কো-অপারেটিভের।

কর্নেল দুপুরের ট্রেনে কাঁটালিয়াঘাটে এসেছেন আজ। রেললাইনের কাছাকাছি ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছেন। একসময় কাঁটালিয়াঘাটের উত্তরে ওই জঙ্গলটা সত্যিকার জঙ্গল ছিল। বাঘের উপদ্রবও ছিল। এখন আর বাঘের নামগন্ধ নেই। সরকারের বনদফতর ছিন্নভিন্ন পুরনো জঙ্গল নতুন করে গাছ লাগিয়ে জমজমাট করেছেন। রেললাইনের দিকটায় পিকনিক স্পট। কিন্তু এদিকটায় অবাধ নির্জনতা।

একটু অস্বাভাবিক মনে হলো এই নির্জনতাকে। কোথাও কোনও লোক নেই। হঠাৎ মনে পড়ে গেল বাংলোর চৌকিদার হারাধন তাঁকে সকাল সকাল ফিরতে বলেছিল। সন্ধ্যার পর নাকি চোরাগোপ্তা খুনখারাপি শুরু হয়েছে কাঁটালিয়াঘাটে। প্রচণ্ড সন্ত্রাস চলেছে। সন্ধ্যার আগেই লোকেরা বাড়ি ঢুকে পড়ে।

তবে খুনোখুনিটা দুই দলের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে। চৌকিদার হারাধন আরও একটা অদ্ভুত কথা বলছিল। প্রকাশ্যে নাকি পোস্টার লটকে দিয়েছিল কোনও এক ব্রতীনবাবুদের দল। হিটলিস্ট কথাটাও বলছিল স্বল্পশিক্ষিত চৌকিদার। "ক খ গ ঘ দিয়ে চারটে নাম স্যার।" রসিক হারাধন হাসতে হাসতে বলছিল, "ও-তে নাম হয় না বলেই হয়তো হিটলিস্টে নেই। তবে ক খ ফিনিশ হয়েছে। ক-য়ে করালী কবরেজ। খ-য়ে খয়রুল হাজি। এবার গ-য়ে কে ফিনিস হয় দেখা যাক।"

উড্ডাকটা হঠাৎ উড়ল। কর্নেল বাইনোকুলারে তাকে অনুসরণ করলেন। পুবদিকে সোজা উড়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে একটা তরুণ আকাশিয়া গাছের ডালে বসল। কিন্তু তাকে আর দেখতে পেলেন না। বেলা পড়ে আসছে। মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে সূর্য ডুবে যাবে এবং টেলিলেন্সে ছবি আসবে না। বাঁধটা গঙ্গার সমান্তরালে বাঁক নিয়েছে। এখান থেকে বাইনোকুলারে আকাশিয়া গাছটা দেখা যাচ্ছে না। বাঁক পেরিয়ে চোখে পড়ল ডানদিকে একটা পোড়ো ইটভাটা। এক মুহূর্তের জন্য কাকে ঝোপের আড়ালে বসে পড়তে দেখলেন কর্নেল। ভাবলেন, মফস্বলি গ্রাম্য স্বভাব। কেউ জৈবকর্মে বসল নিশ্চয়।

মন পড়ে আছে পাখিটার দিকে। আকাশিয়া গাছটা আর চিনতে পারলেন না কর্নেল। আরও অনেক ছোট-বড় আকাশিয়া অসংখ্য গাছের ভিড়ে মিশে আছে। গঙ্গাতীরের ভূমিক্ষয়রোধে ঘন করে গাছ লাগানো হয়েছে। ডাইনে এবার বসতি এলাকা শুরু। সরকারি একতলা স্টাফ কোয়ার্টার বলে মনে হলো। একটু এগিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন কর্নেল। চমকে উঠলেন।

একজন মানুষ আরেকজন মানুষের ওপর পড়ে আছে।

তলার জন যুবক। সে একপাশে কাত হয়ে আছে। ওপরের জন যুবতী। সে যুবকটির পেটের ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে। মুখটা রক্তাক্ত।

কর্নেল বাঁধ থেকে নেমে গেলেন। একটু ঝুঁকে দেখেই সোজা হলেন। দুজনেরই কপালে বুলেটের ক্ষত। এখনও রক্ত জমাট বাঁধেনি। তিনি এসে পড়ার বেশ কিছুক্ষণ আগেই কেউ এদের গুলি করেছে।

হারাধন চৌকিদারের কথা যদি সত্যি হয়, এদের একজন সম্ভবত গ।

কর্নেলের মস্তিষ্ক দ্রুত কাজ করে। যুবকটির নামের আদ্যক্ষর গ হওয়া সম্ভব। যুবতীটি নিশ্চয় ঘাতককে দেখেছিল, তাই তাকেও মরতে হয়েছে। যুবতীর সিঁথিতে সিঁদুর—নাকি রক্ত? আবার একটু ঝুঁকে দেখে নিলেন, সিঁদুরই বটে। এরা স্বামী-স্ত্রী হওয়াই সম্ভব। চেহারায় মফস্বলী ছাপ নেই। এরা কি এখানে নবাগত?

কর্নেল চারদিকে ঘুরে দেখলেন, কোথাও কোনও লোক নেই। বাঁধে গিয়ে উঠলেন। মুহূর্তের জন্য নিজের নিয়তির প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। বরাবর

এমনটা হয়ে আছে। তিনি যেখানেই যান, কোন অদৃশ্য প্রতিপক্ষ তাঁর সামনে রক্তাক্ত মৃতদেহ ছুঁড়ে দিয়ে তাঁকে যেন চ্যালেঞ্জ করে। সেই চ্যালেঞ্জ তাঁকে নিতে হয়।

আগাছার জঙ্গলের ভেতরে সংকীর্ণ পায়ে চলা পথ দিয়ে হন্ত-দন্ত এগিয়ে গেলেন কর্নেল। সামনে প্রথমে যে বাড়িটা পড়ল, সেটার দরজা জানালা বন্ধ। বাড়িটা ঘুরে গিয়ে পিচের একফালি পথ। দুধারে সারবন্দি একতলা কোয়ার্টার। একটা বারান্দার গ্রিলের ভিতর এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখতে পেলেন। বললেন, "শুনুন—প্লিজ একটু বাইরে আসবেন?"

ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে কর্নেলকে দেখছিলেন। বললেন, "আপনি কাকে চান?"

"আপাতত আপনাকে। একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে।"

"ঘটনা? সাংঘাতিক? মানে মা-মা-মার্ডার নাকি?"

"হ্যাঁ। ওখানে দুটো ডেডবডি পড়ে থাকতে দেখলুম। আপনি অন্যদের ডেকে নিয়ে—"

"ওরে বাবা! আমি ওতে নেই মশাই? আপনি কে? কোথায় থাকেন?"

কর্নেল বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। কলকাতায় থাকি। প্লিজ আপনি—"

"চেপে যান মশাই! কার ডেডবডি কোথায় পড়ে আছে, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন না। এ সব এখানের হরদম হচ্ছে।"

এক ভদ্রমহিলা আর দুটি মেয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ভদ্রলোক বললেন, "শুনছ? আবার বডি পড়েছে। এই ভদ্রলোক দেখেছেন।"

কর্নেল বললেন, "একটা নয়, দুটো। দুজন যুবক-যুবতী!"

একটি মেয়ে চমকে উঠে বলল, "তাহলে ঘনাবাবুর বউ আর মেন্টাল হসপিটালের অরু ডাক্তারের ছেলে। কী যেন নাম, মা?"

ভদ্রমহিলা নাকমুখ কুঁচকে বললেন, "গৌতম। জানতুম—"

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, "ছাড়ো তো! আমাদের পাঁচকথায় কাজ কী? আপনি মশাই থানায় খবর দিন গে। এসব ঝামেলায় আমাদের জড়াবেন না!"

সাইকেলে এক ভদ্রলোক আসছিলেন। কর্নেল তাঁকে ডাকলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, "সন্টুবাবু! আবার বডি পড়েছে। এবার কে জানো? গ-য়ে গৌতম। অরু ডাক্তারের ছেলে। সেইসঙ্গে ঘনাবাবুর ব্যাডক্যারেক্টার বউটাও—"

সাইকেলের ভদ্রলোক বললেন, "ওরে বাবা!" বলেই ওপাশের কোয়ার্টারে ঢুকে গেলেন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সেই কন্যাটি বলল, "ও মা! গ-য়ে গার্গী। দুজনেই গ!"

আশেপাশের কোয়ার্টারের বারান্দায় ইতিমধ্যে পুরুষ ও মেয়েরা বেরিয়েছে। কেউ বাইরে বেরুতে রাজি নয় যেন। কর্নেল হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন সামনে চওড়া রাস্তাটার দিকে।

দিন শেষের ধূসরতা চারদিকে। সব আলো জ্বলে উঠল। চওড়া রাস্তা ধরে কিছুদূর চলার পর টাউনশিপের ছড়ানো-ছিটানো বাজার এলাকা। বাঁ-দিকে পুরনো বসতি।

সেখানে একটা সাইকেল রিকশা পেলেন কর্নেল। সে কিছুতেই যাবে না। দশ টাকা ভাড়ার লোভে এবং গন্তব্য থানা শুনে সে শেষপর্যন্ত রাজি হলো।...

রাত নটার ঘণ্টা বাজল থানার ঘড়িতে। অফিসার-ইন-চার্জ তারক মুখার্জির ঘরে বসেছিলেন কর্নেল। দাঁতে কামড়ানো চুরুট। সামনে কফির পেয়ালা। একপাশে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তাপস রুদ্র, অন্যপাশে সাব-ইন্সপেক্টর রঞ্জিত মিত্র। দুটো বডি মর্গে চলে গেছে। গৌতমের বাবা ডাঃ অরিন্দম চৌধুরী একটু আগে চলে গেছেন। তাঁর কাছে জানা গেছে, ওয়েলফেয়ার অফিসার ঘনশ্যাম রায় সকালের ট্রেনে কলকাতা গেছেন। তিনি বারাসাতের লোক।ওখানে এক আত্মীয়ের বাড়ি আজকের দিনটা কাটিয়ে আগামীকাল রাইটার্সে যাবেন। ফেরার কথা সন্ধ্যা নাগাত। অরিন্দমবাবু বলেছেন, গৌতম ছুটিতে এসেছিল। তপনদের তরুণ সংঘ ক্লাবে যাতায়াত করত। এই মাত্র। তাকে কে মারতে পারে, তাঁর মাথায় আসছে না। হ্যাঁ, ঘনশ্যামের স্ত্রীর সঙ্গে তার মেলামেশার কথা কানে এসেছে তাঁর। কিন্তু নিজের ছেলেকে তিনি চেনেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ভুল করে গৌতমকে মারা হয়েছে এবং দৈবাৎ একটা গুলি ঘনশ্যামের স্ত্রীকে লেগে সে-ও মারা পড়েছে। কিংবা ঘনশ্যামের স্ত্রী হয়তো খুনীকে চিনতে পেরেছিল বা চিনে রাখবে ভেবেও তাকে খুন করা হতেও পারে।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে হেলান দিলেন। অভ্যাসমতো চোখ বুজে সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। টুপিটি টেবিলে রাখা। টাকে আলো পড়ে চকচক করছিল।

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তাপস রুদ্র একটু হেসে বললেন, "আমার ঘোরতর সন্দেহ, গোপেশ্বরবাবু কর্নেলসায়েবকে এখানে ডেকে এনেছেন।"

কর্নেল চোখ খুলে মাথা নাড়লেন। "নাহ্ মিঃ রুদ্র! আমি কাঁটালিয়াঘাটে এমনি এসে পড়েছি। ট্রেনে যেতে যেতে ওই জলা আর জঙ্গলটা একবার চোখে পড়েছিল। তা ছাড়া ফরেস্ট বাংলোটাও অসাধারণ সুন্দর।"

ও সি তারক মুখার্জি বললেন, "যাই হোক, এতদিন বড়কর্তাদের মুখে আপনার অনেক নাম শুনেছি। কাগজেও কত খবর পড়েছি। আমার সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হলো।"

তাপসবাবু বললেন, "আমরা একটা অ্যাঙ্গল থেকে দেখছিলুম ব্যাপারটা। এবার সব গুলিয়ে গেল। অব কোর্স, ডাঃ চৌধুরী মে বি কারেক্ট। আই মিন, ঘনশ্যামবাবুর স্ত্রীর মৃত্যুটা দুটি কারণেই হতে পারে। স্পটে যা দেখলুম, উত্তরের ঝোপের আড়াল থেকে গুলি করেছে। দূরত্ব প্রায় কুড়ি ফুট। আগের দুটো ছিল পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি। এ ক্ষেত্রে কুড়ি ফুট দূর থেকে গৌতমবাবুর কপালে গুলি ছোঁড়ায় বোঝা যাচ্ছে, খুনীর হাতের টিপ চমৎকার। প্রায় প্রফেশনাল হাতের কাজ। তো ঘনশ্যামবাবুর স্ত্রীর বডির পজিশন দেখে মনে হলো, ভদ্রমহিলা মুখ ঘুরিয়েছিলেন গৌতমবাবুকে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে।"

কর্নেল বললেন, "দ্যাটস রাইট।"

"তার মানে এ-ও হতে পারে কিলারকে উনি দেখতে পেয়েছিলেন।"

তারক মুখার্জি বললেন, "কেন? পরপর দুবার গুলি ছুঁড়ে থাকবে কিলার। কারণ, কুড়ি ফুট দূর থেকে গুলি করলে একটা গুলিতে ভিকটিম না মরতেও পারে। আমার ধারণা, ঘনশ্যামবাবুর স্ত্রীকে গুলিটা লেগেছে দৈবাৎ।"

কর্নেল বললেন, "আগের দুটো ভিকটিমের মাথায় পয়েন্ট ২২ রিভলভারের গুলি পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ।" তারক মুখার্জি জোর দিয়ে বললেন, "সেজন্যই মনে হচ্ছে পর পর দুবার গুলি করে নিশ্চিত হতে চেয়েছে কিলার। পয়েন্ট ৩৮ রিভলভার হলে ওই ডিসট্যান্সে একটা বুলেটই এনাফ। পয়েন্ট থ্রি-নট থ্রি বুলেট।"

তাপস রুদ্র বললেন, "ডাঃ চৌধুরী ছেলের সম্পর্কে ক্লিন সার্টিফিকেট দিলেন বটে, আমার ধারণা ওঁর ছেলে দলাদলিতে জড়িয়ে পড়েছিল। কাজেই গৌতমবাবুর ব্যাকগ্রাউন্ড তদন্ত করা জরুরি।"

"কারেক্ট।" কর্নেল বললেন। "কিন্তু নেক্সটা টার্গেট ঘ। ঘ দিয়ে কতগুলো নাম আছে এখানে, খোঁজ নেওয়া দরকার।"

এস আই রঞ্জিতবাবু হাসলেন। "একজন ঘ-এর স্ত্রী মারা পড়ল। ঘনশ্যাম রায়। কিছু বলা যায় না, ভদ্রলোকও ভেতর ভেতর ইনভলভড কি না। কিছুদিন আগে ওঁর বাড়িতে একটা অদ্ভুত চুরি হয়েছিল।"

কর্নেল বললেন, "অদ্ভুত চুরি মানে?"

"স্ট্রেঞ্জ! কোয়ার্টারটা শেষদিকে। সে তো দেখলেন স্যার" রঞ্জিতবাবু বললেন, "ঘনশ্যামবাবু সেদিন বাড়ি ফিরতে দেরি করেছিলেন। ওদিকে তাঁর স্ত্রী আর গৌতমবাবু বেড়াতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় লোডশেডিং। সেই ফাঁকে চোর তালা ভেঙে ঢুকেছিল। ঘরের তালাও ভাঙা। একটা সুটকেশ আর বারান্দায় রাখা সাইকেলটা নিয়ে যায় চোর। আলমারির তালা ভাঙতে চেষ্টা করে পারেনি। আমিই গিয়েছিলাম ইনভেস্টিগেশনে। আশ্চর্য ব্যাপার, স্যুটকেসে তেমন কিছু ছিল না। কাজেই সেটা বাড়ির পেছনে ঝোপের ভেতর না হয় ফেলে পালাল চোর। কিন্তু সাইকেলটা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল। মাইলদেড়েক দূরে জেলেদের জালে আটকে যায়। সাইকেলটা অবশ্য পুরনো। প্রথমে ভেবেছিলাম, ঘনশ্যামবাবুর খনখনে বাজে সাইকেলটা রাগ করে ফেলে দিয়েছে। পরে মনে হয়েছিল, ঘনশ্যামবাবুর ওপর কারও রাগ-টাগ আছে।"

তাপস রুদ্র বললেন, "দ্যাটস আ পয়েন্ট। ঘনশ্যামবাবুর ওপর কারও রাগ আছে।"

সায় দিয়ে তারক মুখার্জি বললেন, "ভদ্রলোককে সাবধান করে দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে তাপসবাবু ওকে আচ্ছাসে জেরা করে দেখুন, কিছু বেরোয় নাকি। লেট হিম কাম ব্যাক। আমার মনে হয়, স্ত্রীর মৃত্যুর দরুন ভদ্রলোক শকড অ্যান্ড নার্ভাস হয়ে কিছু কবুল করে ফেলবেন।"

"সেই পোস্টারটা!" কর্নেল বললেন। "সেটা একটু দেখতে চাই।"

"দেখাচ্ছি।" বলে ওসি তারক মুখার্জি ওয়াল-চেস্টের তালা খুললেন। "আমরা পৌঁছুনোর আগে কারা ওটা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। একটু অংশ জল দিয়ে ভিজিয়ে তুলে এনেছিলুম।"

ছেঁড়া পোস্টারের একটা টুকরো টেবিলে রাখলেন তিনি। ওপরে 'ভুলব না' এবং তলার দিকে ক খ গ ঘ চারটে অক্ষরের অর্ধেকটা টিকে আছে। কর্নেল বললেন, "কত বড় পোস্টার আন্দাজ করেছিলেন?"

"ছো। এক ফুট চওড়া, ফুট দেড়েক লম্বা হবে।"

তাপস রুদ্র বললেন, "না মিঃ মুখার্জি! আরও একটু বড় হবে মনে হচ্ছে। কারণ এটা লোকাল বাংলা উইকলি কোনও কাগজেরই একটা পাতা।"

তারক মুখার্জি বললেন, "এনিওয়ে, ছোট পোস্টার। লেটারগুলোর দেখুন, বেশ বড়। লাল কালিতে লেখা। তুলি দিয়ে লেখা মনে হয় না। শক্ত কাটি-ফাটি দিয়ে লেখা।"

কর্নেল বললেন, "দু'একদিনের জন্য এটা রাখতে পারি? ইফ য়ু প্লিজ—"

"অবশ্যই। আপনার কো-অপারেশন আমরা চাই।"

কর্নেল ভাঁজ করে জ্যাকেটের ভেতর চালান করে বললেন, "উঠি এবার। বাংলোয় ফিরতে হবে।"

"জিপে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি! হাইওয়ে দিয়ে ঘুরে একটু দূর হবে। সো হোয়াট?"

একজন কনস্টেবল ঢুকে সেলাম ঠুকে বলল, "উও ডক্টরবাবু আয়া স্যার!"

"ডঃ চৌধুরী?"

"জি।"

"নিয়ে এস।"

ডাঃ অরিন্দম চৌধুরী হন্তদন্ত ঘরে ঢুকলেন। পকেট থেকে একটা খাম বের করে বললেন, "এটা দিনে কখন লেটার বক্সে কে ফেলে গিয়েছিল। গৌতমের পার্সোনাল চিঠি ভেবে খোলেনি ওর মা! এইমাত্র শুনে খামটা খুললাম। বাই পোস্টে আসেনি, এই দেখুন।"

তারক মুখার্জি চিঠিটা পড়ে কর্নেলকে দিলেন। তাপস রুদ্র ঝুঁকে গেলেন কর্নেলের দিকে। আঁকাবাঁকা জড়ানো হরফে লেখা আছে :

"জুতোর বাক্স শীঘ্র ফেরত দাও। শ্মশানকালীর মন্দিরের পেছনে কল্কেফুলের ঝোপে ইঁটচাপা দিয়ে রেখে আসবে।"

তাপস রুদ্র বললেন, "জুতোর বাক্স! হোয়াট ডাজ ইট মিন?"

ডাঃ চৌধুরী বললেন, "আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।"

তারক মুখার্জি গম্ভীর মুখে বললেন, "বোঝা খুব সহজ ডাঃ চৌধুরী! আপনার ছেলে কেলোর গ্যাংয়ের সঙ্গে ইনভলভড ছিল। জুতোর বাক্স ওদেরই কোনও সিম্বলিক টার্ম। একালের ছেলেদের চেনা কঠিন।"

"ইমপসিবল!" বলে ডাঃ চৌধুরী রাগ করে বেরিয়ে গেলেন।...

সেদিনই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার ট্রেনে বহরমপুর থেকে ফিরছিলেন ঘটহরি ভটচায। হাঁপকাশের রুগী। কাঁটালিয়াঘাটের সরকারি হাসপাতালে অনেকদিন চিকিৎসা করিয়েও

সারেনি। বহরমপুরে প্রাইভেট ক্লিনিকে দেখাতে গিয়েছিলেন। তিনটে থেকে বসে থেকে নাম লিখিয়ে ডাক পড়ল পাঁচটার সময়। বেরিয়ে ওষুধ-পত্তর কিনে বাসে চাপতে গিয়ে ভয় পেলেন। আগাপাছতলা ভিড় লাস্ট বাসে। হাঁপের রুগীর পক্ষে বাসে ঢোকা অসম্ভব। অগত্যা ট্রেন।

তা-ও ভাগ্যিস ডাউন ট্রেন লেট করেছিল। লোকাল ট্রেন কাটোয়া অব্দি যাবে। তত ভিড় নেই। কাঁটালিয়াঘাট রোড স্টেশনে নেমে দেখলেন প্ল্যাটফর্ম প্রায় খাঁ-খাঁ। দুর্গাপুজোর আগে থেকে এই অবস্থা চলেছে। জনাকতক যাত্রী অবশ্য নেমেছিল। তারা দল বেঁধে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। নাগাল পেলেন না ভটচাযমশাই।

সেই যাত্রীরা সাইকেল রিকশাগুলোয় চেপে ঝাঁক বেঁধে চলে গেল। একটা রিকশা দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু রিকশাওয়াকে দেখতে পেলেন না। স্টেশনের পিছনে দোকানপাট খাঁ-খাঁ করছে। হরেনের দোকানে বসে মাটির ভাঁড়ে চা খেলেন ভটচাযমশাই। হরেন বলল, "ভটচাযমশাই যাবেন কী করে?"

ভটচায ক্লান্তভাবে হাসলেন। "কষ্ট করে হেঁটেই যাই। পথে যদি রিকশা পাই—"

"পাবেন বলে মনে হয় না।" হরেন বলল। "সাংঘাতিক অবস্থা। আজও দুটো বডি পড়েছে।"

"বলো কী!"

হরেন ঘটনাটা বলল। ভটচায মনে মনে সন্ত্রস্ত, কিন্তু মুখে বললেন, "কর্মফল! আমি কারও সাতে-পাঁচে থাকি না। আমার আর কী? যাই।"

স্টেশনরোড জনহীন। দু'ধারে উঁচু সারিবদ্ধ গাছ। ল্যাম্পপোস্টের আলো চকরা-বকরা হয়ে পড়েছে। কিছুদূর এগিয়ে দম নেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। সেইসময় মনে হলো, কে পেছনে আসছে। ঘুরে বললেন, "কে গো?"

লোকটা কাছাকাছি এল। মুখটা চেনা লাগছিল ভটচাযের। কিন্তু আর কিছু বলার সুযোগই পেলেন না। তীক্ষ্ণ তীব্র একটা শব্দ এবং মাথার ভেতরটা জ্বলে গেল ঘটহরি ভটচাযের। টলতে টলতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন পিচের ওপর। তখন আততায়ী তাঁকে টানতে টানতে পাশের খালে ফেলে দিল।

## ॥ আট ॥

বাইরে গেলে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের চিরাচরিত অভ্যাস ঘণ্টা দুই প্রাতঃভ্রমণ। ভোর ছটায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। মনে সেই উডডাক পাখিটার ছবি আঁকা হয়ে গেছে। জলার ধারে ঘাসে ঝোপে-ঝাড়ে চকচকে শিশির। পায়ে হাঁটু অব্দি হান্টিং বুট জুতো। গঙ্গার ধারে বাঁধ ধরে চলতে চলতে স্লুইস গেটে পৌঁছুলেন। তখন দক্ষিণের জঙ্গলে কুয়াশা জড়ানো। আসন্ন হেমন্তের পূর্বাভাস। একটু পরে রোদ সেই কুয়াশাকে ক্রমশ ছিঁড়ে ফেলছিল। বাইনোকুলারে উডডাকটাকে খুঁজছিলেন কর্নেল। এই পাখিগুলোর স্বভাব, ঘন জঙ্গলে আত্মগোপন। এরা কিছুতেই বসতি এলাকার কাছাকাছি যেতে চায় না।

জঙ্গলে ঢুকে সাবধানে পা ফেলছিলেন কর্নেল। কিছুক্ষণ অন্তর থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন উডডাকের ডাক শোনার জন্য। অদ্ভুত চাপা শব্দে এরা ডাকে।

কিছুদূর ঘন গাছপালার তলা পরিষ্কার হয়ে আছে। শাল, শিশু, আকাশিয়া। কোনও ঝোপঝাড় নেই। তারপর জঙ্গল আরও জটিল হলো। বৃক্ষলতাগুল্ম জমাট বেঁধে আছে। সেখানে সবই স্থানীয় উদ্ভিদ। বনদফতরের লাগানো। আউটসাইডারদের ভিড় নেই। সবে টুই টুই করে কী পাখি ডেকে উঠল পেছনের কোনও গাছের ডগায়। কর্নেল তাকে খুঁজে বের করার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে দেখলেন একটা খালি চারমিনার সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে। ঘাসে ও শুকনো পাতায় কয়েকটা পোড়া সিগারেটের টুকরোও।

এখানে কে সিগারেট খেতে এসেছিল? খালি প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিলেন কর্নেল—নেহাত খেয়াল বশে। তারপর দৃষ্টি গেল সামনে প্রকাণ্ড এবং বেঁটে হিজল গাছের গুঁড়ির দিকে। ফুট পাঁচ-ছয় উঁচুতে কয়েক টুকরো কাদা সাঁটা আছে। গোলাকার কাদার খুদে ঢিবি। কোনও-কোনওটার কিছু অংশ খসে গেছে। কাদাগুলো শুকনো এবং ফাটলধরা। অনেকদিন আগে কেউ সেঁটেছিল বোঝা যায়।

নাকি উই ধরেছে গাছটায়? অসম্ভব। হিজল গাছে উই ধরে না— অন্তত অতটা উঁচুতে। পিছিয়ে এসে বাইনোকুলারে সেগুলো লক্ষ্য করেই চমকে উঠলেন কর্নেল। তখনই গাছটার কাছে গিয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে ছুরি বের করে একটা শুকনো কাদার টুকরো সরালেন। গাছের গায়ে ফুটো। পোড়া দাগ আবছা হয়ে আছে। ছুরির ডগা দিয়ে গুঁড়ি খোদাই করার পর ইঞ্চিটাক ভেতরে খুদে একটা কালো শক্ত জিনিস দেখতে পেলেন।

রিভলভারের গুলি!

কেউ এখানে এসে গোপনে টার্গেট প্র্যাকটিস করেছে। অনেকটা সময় ধরে পরিশ্রমে মোট ছটা গুলি বের করলেন কর্নেল।

আটটা বেজে গেছে। পশ্চিমে রেললাইনের দিকে এগিয়ে দেখলেন, গভীর খাদ জলে ভর্তি। অগত্যা যে পথে এসেছিলেন, সেইপথে ফিরে চললেন। পাখিটার পুনরাবিষ্কার করার মতো সময় পরে পাওয়া যাবে। আপাতত এই আবিষ্কারটা চমকপ্রদ।

গত রাতে আতস কাচ দিয়ে ছেঁড়া পোস্টারের হরফ আর বেনামী চিঠির হরফ পরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে এসেছেন, হাতের লেখা একই লোকের— যদিও চিঠিতে হাতের লেখায় ইচ্ছে করেই বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টা আছে। অন্তত দুটো হরফ 'না' এবং 'খ'-এর মধ্যে একটা মিল স্পষ্ট। 'না'-এর পর আ-কারের মাথাটা ডাইনে একটু বাঁকানো এবং বেড়ে আছে। 'খ' হরফেও তা-ই। মোট কথা, যে এর লেখক, তার অভ্যাস প্রতি শব্দের শেষে মাত্রা দেওয়ার মতো একটা বাঁকা টান দেওয়া।

বাংলোয় ফিরে দেখলেন জিপ নিয়ে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তাপস রুদ্র হাজির। কর্নেল সহাস্যে সম্ভাষণ করলেন, "গুড মর্নিং মিঃ রুদ্রঃ!"

তাপসবাবু বিষণ্ন হাসলেন। "ব্যাড মর্নিং, কর্নেলসাহেব—সরি! মাথার ঠিক নেই।"

"আশা করি, নাও দা ভিকটিম ইজ সাম ঘ?"

"হ্যাঁ! কিলারের সাহস আর স্পর্ধা আমাকে খেপিয়ে দিয়েছে। স্টেশন রোডের ধারে খালে কিছুক্ষণ আগে একটা বডি পাওয়া গেছে। দা সেইম কেস। মাথায় গুলি। কিন্তু অদ্ভুত লাগছে, ভটচাযমশাই নিরীহ মানুষ। শুনলুম, হাঁপানির অসুখ ছিল। বহরমপুরে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন। স্টেশনবাজারের চায়ের দোকানের হরেন বলল, গতরাত্রে সাড়ে সাতটার ডাউন লোকালে নেমে তার দোকানে চা খান। তারপর একা পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। প্রায় দেড়শো গজ দূরে বডি পড়েছিল রাস্তার ধারে খালের জলে। হরেন কোনও গুলির শব্দ শোনেনি। অবশ্য রেলইয়ার্ডে শান্টিং ইঞ্জিনের শব্দ সব সময়। তো মর্নিংয়ে রেলের সুইপারের বউ শুওর ডাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সে দেখতে পায়।"

বারান্দায় বেতের চেয়ারটেবিল। কর্নেল বললেন, "বসুন মিঃ রুদ্র!" তারপর হারাধনকে ব্রেকফাস্ট আনতে বললেন এবং এক পট কফিও। হারাধন অপেক্ষা করছিল ট্রে সাজিয়ে। নিয়ে এল।

তাপস রুদ্র কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "দেয়ার ইজ সামথিং অড।"

"হ্যাঁ। ভটচাযমশায়ের নামে যদি ঘ থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই অড।"

"আছে। ওঁর নাম ঘটহরি ভটচায। ওঁর দাদার নাম পটহরি। তিনি গত বছর মারা গেছেন। দু'ভায়ে দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা এখনও চলছে। পটহরিবাবুর তিন ছেলে। বড় দুজন বাইরে চাকরি করে। ছোট ছেলের নাম কীর্তিহরি—" তাপসবাবু হাসলেন। হরিবংশ বলা বলে। এখানকার রায়রাজাদের মন্দিরের বংশানুক্রম সেবাইত। মন্দিরের বিগ্রহ রাধাবল্লভ। তো জাস্ট একটু লিংক আছে গোপেশ্বরবাবুর দলের সঙ্গে। কীর্তিহরির ডাকনাম ঘোঁতন। নাম্বার ওয়ান ক্রিমিন্যাল। প্রব্লেম হলো, উই আর হেল্পলেস। গোপেশ্বরবাবু রুলিং পার্টির লোকাল লিডার।"

"বুঝেছি।" কর্নেল ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে বললেন। "আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ছেলে টার্গেট ছিল। এ ক্ষেত্রেও কবরেজমশাইয়ের মতো ছেলেকে না পেয়ে বাবাকে মেরেছে। বাই দা বাই, এরা তো এফ আই আর-এর আসামী?"

"হ্যাঁ। তপনের মার্ডারকেসে এক ডজন আসামী। তাদের মধ্যে ক খ গ ঘ আছে। কিন্তু সবাই ফেরার।"

"ডাক্তারবাবুর ছেলের ব্যাপারটার খোঁজ নিন।"

তাপস রুদ্র একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "এস আই রঞ্জিত মিত্রের হাতে একটা ইনফরমেশন আছে। গৌতমের সঙ্গে তপনের ঘনিষ্ঠতা ছিল।"

"আর কিছু?"

তাপসবাবু আবার একটু হাসলেন। "যে ভদ্রমহিলা ওর সঙ্গে মারা পড়েছেন, তাঁর সঙ্গে চোখে পড়ার মতো মাখামাখি ছিল। মেন্টাল হসপিট্যালের ওয়েলফেয়ার অফিসার ভদ্রলোকের বয়স স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি। কাচ্চাবাচ্চা নেই। ন্যাচার‍্যালি একটু মাখামাখি থাকতেই পারে। রঞ্জিতবাবুর মতে, ঘনশ্যামবাবুর এতে কোনও আপত্তি ছিল না। কারণ ওঁর বাড়িতে চুরির তদন্তে গিয়ে স্ত্রীকে বকাবকি করতে দেখেননি। ভদ্রমহিলা

নাকি একটু তেজী প্রকৃতির ছিলেন। পাড়ার কারও সঙ্গে মিশতেন না। মোদ্দা কথা, রঞ্জিতবাবুর বক্তব্য, ঘনশ্যামবাবু স্ত্রৈণটাইপ লোক।"

"উনি কি ফিরেছেন?"

"নাহ্। ফেরার কথা ওবেলায়। আমরা ট্রাংকলে লালবাজারকে জানিয়েছি। রাইটার্সে হেলথ ডিপার্টে একটা মেসেজ দিতে বলেছি। ঘনশ্যামবাবুর ওখানে যাওয়ার কথা। দেখা যাক্।"

একটু পরে কর্নেল বললেন, "গৌতম এবং গার্গী দেবীর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন?"

"কিছুক্ষণ আগে মর্গে গিয়েছিলাম।" তপনবাবু হঠাৎ আস্তে বললেন, "ভেরি স্যাড। শি ওয়াজ পসিবলি প্রেগন্যান্ট। অবশ্য মর্গের ডাক্তার সিওর নন এখনও। তবে ওঁর সন্দেহ তা-ই।"

ব্রেকফাস্ট দ্রুত শেষ করে কর্নেল কফিতে চুমুক দিলেন। চুরুটও ধরালেন। হেলান দিয়ে বললেন, "জুতোর বাক্স ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?"

"আমার ধারণা, ওটা চোরা ড্রাগ-ফাগের ব্যাপার। এর পেছনে যুক্তি আছে, কর্নেল সরকার। মেন্টাল হসপিট্যালে মাদকজাতীয় ওষুধ প্রচুর ব্যবহার করা হয়। মানসিক রোগীকে অনেক সময় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়। যেমন ধরুন, নাইট্রোজেনাস জাতীয় ওষুধ কিংবা মরফিয়া। এ ছাড়া আমাদের হাতে সলিড ইনফরমেশন আছে, জেনারেল হসপিট্যালে দামী ওষুধ পাচারের একটা চক্র আছে। কাজেই হসপিট্যালের একজন ডাক্তারের ছেলের পক্ষে দৈবাৎ তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়।"

কর্নেল সায় দিলেন, "দ্যাটস রাইট।"

"এইসব মার্ডার তপনের গ্যাংয়ের কাজ তো বটেই। তবে কিলার একজন। তার একটা পয়েন্ট টোয়েন্টি টু ক্যালিবারের ছোট্ট রিভলভার আছে। এ সব রিভলভার সিক্সরাউন্ডার। ছটা গুলি থাকে। অটোমেটিক উইপন। একটা ফায়ার করলে নেক্সট গুলিটা অটোমেটিক প্রসেসে হ্যামারের সামনে এসে যায়।" বলে তাপসবাবু হাসলেন। "কাকে কী বোঝাচ্ছি! আপনি রিটায়ার্ড মিলিটারি অফিসার। য়ু নো মোর দ্যান মি।"

"তপন এবং—হুঁ, কেলো এদের মধ্যে ঝগড়াটা কিসের ছিল? রাজনৈতিক?"

"নাহ্। রাজনীতি-ফিতি নয়। তবে পলিটিক্যাল পার্টি ওদের সাহায্য নিয়ে থাকে। দু'জনের একসময় খুব ভাব ছিল। ঘাটবাজার এরিয়ায় ব্যবসায়ীদের কাছে সিকিউরিটি মানির বখরা নিয়ে প্রথম ঝগড়া বাধে। সো মাচ ইনফরমেশন আই বি সোর্সে আমাদের জানা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ড্রাগস এবং দামী ওষুধপত্র চোরাচালানের সূত্রেই সম্ভবত বেধেছিল দু'জনে। জুতোর বাক্স! নাও ইটস্ অ্যান ইমপর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর ইন দিস কেস।"

"আপনি বলতে চাইছেন তপু দামী ড্রাগস লুকিয়ে রাখতে দিয়েছিল গৌতমকে এবং কেলোকে লুকিয়ে একা আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল?"

"হ্যাঁঃ। দ্যাটস মাই থিওরি।"

"তাহলে ক খ গ ঘ টার্গেট করল কেন? আইদার তপনের গ্যাংয়ের কেউ—ধর

কেলো, ওসব পোস্টারের ঝামেলায় যাবে কেন? মিঃ রুদ্র, সাধারণ ক্রিমিন্যাল এ সব ঘোরপ্যাঁচে আজকাল যায় না। য়ু নো দ্যাট ওয়েল। তপুকে তারা বোমা মেরে খতম করেছে। ওদের কাজ ওইরকম বেপরোয়া এবং মোটা দাগের।"

তাপসবাবু কর্নেলের দিকে তাকিয়েছিলেন। বললেন, "হ্যাঁ। দ্যাটস আ পয়েন্ট।"

"আপনি বলছিলেন, দেয়ার ইজ সামথিং অড। হেয়ার ইজ য়া থিং—ভেরি পিকিউলার।"

"কী?"

"প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একই মোডাস অপারেন্ডি—একই পদ্ধতিতে খুন এবং একই মার্ডার উইপন ব্যবহার।"

"নিশ্চয় বাইরে থেকে ভাড়াটে খুনী আনিয়েছে তপনের গ্যাং—যাতে তাদের গায়ে আঁচড় না লাগে।"

কর্নেল হাসলেন। "সেটা অবশ্য সম্ভব। তবে—"

"তবে কী?"

"খুনী যে-ই হোক, সে একটু বেশি বুদ্ধিমান।"

তাপস রুদ্র হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। কর্নেলও উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "জাস্ট আ মিনিট, মিঃ রুদ্র!" তিনি ঘরে ঢুকে গেলেন। নোটবইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে কিছু লিখলেন। তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, "খুব গোপনীয়। আপনি ছাড়া কেউ জানবে না। এতে কয়েকটা প্রশ্ন আছে। সেগুলো অবিলম্বে তদন্ত করে লিখিতভাবে আমাকে গোপনে দেবেন। ইটস এ জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট বিটুইন য়ু অ্যান্ড মি, মিঃ রুদ্র।"

তাপস রুদ্র একবার চোখ বুলিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, "ওক্কে!"...

রাইটার্স বিল্ডিংসের স্বাস্থ্যদফতরের অফিসে পৌঁছেই ঘনশ্যাম খবরটা পেয়েছিল। সে তখনই পাগলের মতো বিকট আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল! জ্ঞান হওয়ার পরও সে অসম্বন্ধ প্রলাপ বকছিল। "এ হতে পারে না! মিথ্যা! এ অসম্ভব!" তার মাথায় জল ঢেলে অনেক চেষ্টায় শান্ত করার পর দুজন কর্মী ট্যাক্সি করে তাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সাড়ে বারোটায় ট্রেন। ততক্ষণে ঘনশ্যাম কিছুটা শান্ত হয়েছিল। ট্রেনে তাকে তুলে দিয়ে ওঁরা বলেছিলেন, "দেখুন, সঙ্গে আমরা যাব নাকি।"

ঘনশ্যাম আস্তে বলেছিল, "না। পারব যেতে।" তারপর আবার কেঁদে উঠেছিল। কামরাভর্তি যাত্রীরা জানতে চাইছিল, কী হয়েছে। ঘনশ্যাম কোনও জবাব দেয়নি। তারপর ট্রেন যত এগোচ্ছিল, তত সে নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছিল। তার কেঠো চেহারা অপটু হাতে আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছিল।

কাঁটালিয়াঘাট পৌঁছুতে অসম্ভব সময় নিল ট্রেন। সাড়ে ছটায় প্ল্যাটফর্মে সে নেমেই দেখল হাসপাতালের একদল কর্মী তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে ভাবতে পারেনি,

তার মতো একলা স্বভাবের মানুষের বিপদে এত সব মানুষ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। "আমি আর কেমন করে বেঁচে থাকব? আমার জীবন শ্মশান হয়ে গেল!"

সবাই তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে সাইকেলরিকশায় চাপাল। তার পাশে একজন বসল। অন্যেরা সাইকেলে এসেছিল। প্রথমে থানায় যেতে হবে। মর্গ থেকে বডি ডেলিভারির পারমিশন নিতে হবে। তারপর শ্মশানযাত্রা।

ও সি তারক মুখার্জি ছিলেন না। ডিউটি অফিসারের কাছে বডি ডেলিভারির পারমিশন নিয়ে মর্গে গেল ঘনশ্যাম। সঙ্গে এস আই রঞ্জিত মিত্রও গেলেন। রঞ্জিতবাবুর এক আত্মীয়া মানসিক হাসপাতালে আছেন। সেই সূত্রে চেনাজানা দু'জনের। তাঁর সাহায্যে বডি ডেলিভারি নিতে দেরি হলো না। নইলে ডোমদের টাকাকড়ি দিতে হতো। নানা ছলছুতোয় দেরি করিয়ে দিত। রঞ্জিতবাবু বললেন, "আজ রাত্তিরে আর দরকার নেই। কাল সকালে অবশ্য করে থানায় আসবেন। বড়বাবুকে সব খুলে বলবেন—যদি কিছু প্রাইভেট কথাবার্তা বলার থাকে, হেজিটেট করবেন না।"

ঘনশ্যাম ভাঙা গলায় বলল, "বলব। সব বলব।"

দাহকর্ম শেষ হতে রাত দশটা বেজে গেল। শ্মশানে ডাঃ চৌধুরীও গিয়েছিলেন ঘনশ্যাম গঙ্গাস্নান করে দেখল, তখনও তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, "চলো! তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। একটু কথাও আছে।"

বাড়ি ঢুকে আলো জ্বেলে ঘনশ্যাম দেখল, খাটের উপর গার্গীর সায়া, ব্লাউজ আর একটা শাড়ি পড়ে আছে। বেড়াতে যাওয়ার আগে পোশাক বদলেছিল। সে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলো সেগুলোর দিকে। সবটাই অবাস্তব অবিশ্বাস্য লাগছে।

ডাক্তার চৌধুরী বারান্দায় চেয়ারে বসে ডাকলেন, "শোন ঘনশ্যাম! যা হবার হয়ে গেছে। তোমার আর কত কী—আমারটা দেখ, একমাত্র সন্তান! তুমি আবার বিয়ে করবে। স্ত্রী পাবে, সন্তান পাবে। আমি—"

ঘনশ্যাম বলল, "অদৃষ্ট স্যার! কী আর বলব!"

"তুমি যদি একটু কঠোর হতে ঘনশ্যাম!"

"কেন স্যার?"

"গৌতমকে তুমি বড্ড বেশি প্রশ্রয় দিয়েছিলে!"

ঘনশ্যাম চুপ করে থাকল।

ডাক্তার চৌধুরী একটু কেসে বললেন, "গতকাল একটা বেনামী চিঠি এসেছিল গৌতমের নামে। কেউ লেটারবক্সে ফেলে গিয়েছিল। তাতে লেখা জুতোর বাক্স ফেরত না দিলে—"

ঘনশ্যাম শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, "জুতোর বাক্স?"

"হ্যাঁ। তুমি কি জ্ঞানো—আই মিন, গৌতম তো প্রায় সবসময় তোমার বাড়ি আসত—সে কিংবা তোমার স্ত্রী কি এমন কিছু আভাস দিয়েছিল—"

ঘনশ্যাম তাঁর কথার ওপর চাপা স্বরে বলল, "বুঝেছি। ব্যাপারটা আমি, গৌতম

আর গার্গী তিনজনে জানতুম। এসব ব্যাপার কাকেও বলা চলে না স্যার! শুনলেই বুঝতে পারবেন।"

সে পুরো ঘটনাটা বলল। তপু গৌতমকে জুতোর বাক্সে জুতোর ভেতর লুকিয়ে রাখা রিভলভার রাখতে দিয়েছিল। গৌতম সেটা গার্গীকে রাখতে দেয়। তারপর সাইকেল আর স্যুটকেসের সঙ্গে ওটাও চুরি যায়। ওটা আর ফেরত পায়নি। পুলিশকে শুধু এই কথাটিই বলেনি ঘনশ্যাম।

ডাঃ চৌধুরী শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "তুমি এবার পুলিশকে এটা জানাও ঘনশ্যাম! এখন প্রায় পৌনে এগারোটা। এখন তোমার বিশ্রাম দরকার। ট্রাংকুলাইজার খেয়ে নাও। কাল মর্নিংয়ে তুমি থানায় গিয়ে সব বলবে। তুমি যদি না বলো, আমাকে বলতেই হবে।"

ডাঃ চৌধুরী চলে গেলেন। ঘনশ্যাম দরজা বন্ধ করে উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল। সে আকাশ দেখছিল। নক্ষত্রলোকে দুটি মানুষের আভাস—গৌতম আর গার্গী! ঘনশ্যাম দু'হাতে মুখ ঢেকে চাপা আর্তনাদ করল, "না, না, না!"...

•

"জুতোর বাক্স? সত্যিকার জুতোর বাক্স?"

"হ্যাঁ স্যার! ভেতরে নতুন দুটো বুটজুতো ছিল। একটা জুতোর ভেতর ছোট্ট একটা রিভলভার। অন্যটার ভেতর কাগজে মোড়া বারোটা গুলি। দেখতে ছোট্ট লিপস্টিকের মতো।" ঘনশ্যাম রুমালে নাক ঝেড়ে চোখ মুছে বলল।

"আপনি কী করে জানলেন ওটা রিভলভার—পিস্তল নয়?"

"আমার এক ক্লাসফ্রেন্ড ক্যালকাটা পুলিশের অফিসার। তার কাছে একবার কথায় কথায়—"

ও সি তারক মুখার্জি প্রশ্ন করছিলেন। এস আই রঞ্জিত মিত্র রেকর্ড করছিলেন। তারকবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তো আপনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাননি কেন?"

"গৌতম আমার বসের ছেলে। তা ছাড়া তাকে আমি স্নেহ করতাম। বুঝতেই পারছেন স্যার, এটা এমন একটা ডেলিকেট ব্যাপার—আমি আসলে ভেবেছিলুম, গৌতম ওটা নিয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ বাড়িতে চুরি হয়ে গেল। রঞ্জিতবাবু সব জানেন স্যার!"

"আপনি তখনও কথাটা জানাননি আমাদের!"

"ঝামেলার ভয়ে স্যার! আমি নিরীহ মানুষ! কোনও সাতে পাঁচে থাকি না।"

একটু চুপ করে থেকে তারক মুখার্জি বললেন, "দেখুন ঘনশ্যামবাবু! আপনার স্ত্রী এবং গৌতমবাবু এখন বেঁচে নেই। কাজেই প্রশ্নের সত্যি জবাব দিতে অসুবিধা নেই। বলুন, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে গৌতমবাবুর কি কোনও গোপন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়েছে আপনার?"

ঘনশ্যাম জোরে মাথা নেড়ে বলল, "অ্যাবসার্ড! সন্দেহ করার মতো কিছু চোখে পড়েনি।"

"তা হলে আপনার স্ত্রীও কেন খুন হলেন বলে আপনার ধারণা?"

"কিছু বুঝতে পারছি না। তবে আমার মনে হয়"—ঘনশ্যাম একটু ইতস্তত করে বলল, "গৌতমকে মারার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল মার্ডারার। হয়তো পাচ্ছিল না তারপর পেয়ে গেল—মানে, জায়গাটা নিরিবিলি।"

"কিন্তু আপনার স্ত্রীকে মারার কারণ কী মনে করেন?"

ঘনশ্যাম একটু ভেবে নিয়ে বলল, "মার্ডারার সাক্ষী রাখতে চায়নি হয়তো। কিংবা—কিংবা দৈবাৎ একটা গুলি ওর মাথায় লেগেছিল।"

তারক মুখার্জি বললেন, "ঠিক আছে। দরকার হলে আবার ডাকব আপনাকে।"

রঞ্জিতবাবু বললেন, "এটা পড়ে নিয়ে তলায় সই করুন।"

ঘনশ্যাম স্টেটমেন্ট পড়ল। তলায় ইংরেজিতে নাম সই করে দিল। তারিখও লিখল।...

## ॥ নয় ॥

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আজ পঞ্চমুখী শিবের মন্দির অব্দি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ওদিকে একটা আশ্রম আছে। নিসর্গ দৃশ্যও অসাধারণ। ভাবছিলেন, পশ্চিমবঙ্গেই এত সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকতে কেন যে লোকে পুজোর সময় বাইরে ছোটে? শরৎকালের বাংলার নিসর্গের কোনও তুলনা হয় না। হয়তো সমতলবাসী বাঙালির সমতলের প্রতি একঘেয়েমি আছে, তা সমতলে যত সুন্দর করে স্বর্গোদ্যান প্রকৃতি সাজাক না কেন! উঁচু জায়গা অর্থাৎ পাহাড়পর্বত দর্শন একটা বিস্ময়কর বৈচিত্র্যও বটে সমতলবাসীর কাছে।

একটু সকাল-সকাল বাংলোয় ফিরলেন আজ। তাঁর কথামতো ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তাপস রুদ্র বাইরে গেছেন গতকাল। রাত্রে ফিরে থাকলে সকালেই কর্নেলের কাছে চলে আসবেন।

কারও জন্য প্রতীক্ষা মানুষের জীবনে একটা অসহ্য সময়—তা, যার জন্যই প্রতীক্ষা হোক কিংবা যে কারণেই প্রতীক্ষা হোক। নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ব্রেকফাস্ট খেলেন কর্নেল। তখনও তাপস রুদ্রের পাত্তা নেই। একটু উদ্বিগ্ন হলেন কর্নেল। অতি উৎসাহে কোনও হঠকারিতা করে বসেননি তো ডিটেকটিভ অফিসার? খুনী যে-ই হোক, তার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে এবং অতিশয় ধূর্ত। যদিও এই কেসে তার কিছু বুদ্ধির বাড়াবাড়ি ঘটে গেছে, এখন সে তা দৈবাৎ আঁচ করতে পারলে সতর্ক হয়ে যাবে। গা-ঢাকা দেওয়াও অসম্ভব নয়। তা ছাড়া তাপস রুদ্রকে যে-সব তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়েছেন কর্নেল, সেগুলো এই কেসে ভাইটাল সাক্ষ্যপ্রমাণ নয়। তা শুধু সহায়ক বা সেকেন্ডারি এভিডেন্স মাত্র।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হলো, ছটা বুলেট-নেল পেয়েছেন জঙ্গলের হিজল গাছটার গুঁড়িতে। তার মানে সিক্স রাউন্ডার রিভলভারে ছটা খালি কার্তুজ ফেলে দিতে হয়েছে খুনীকে। কোথায় ফেলেছে এটা খুঁজে দেখা উচিত ছিল। কাল ব্যাপারটা খেয়াল

হয়নি। এখন মনে হলো, এ-ও একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। পাঁচজনকে খুন করা হয়েছে পাঁচটা গুলিতে। তাহলে তার কাছে সম্ভবত বারোটা গুলি ছিল। এখনও একটা রয়ে গেছে। তাপসবাবুকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত ছিল। অবশ্য একজন ডিটেকটিভ অফিসারের পেশাগত অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর নির্ভর করা চলে। তবু সব মানুষের মধ্যে কোনও-কোনও মুহূর্তে হঠকারিতার ঝোঁক এসে যায়—আকস্মিক উত্তেজনাবশেও।

সাড়ে নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন কর্নেল। হারাধনকে বললেন, "কেউ আমার খোঁজে এলে বলবে, লাঞ্চের সময় ফিরব।"

হারাধন বলল, "স্যার, বুনো হাঁসের মাংস খান তো?"

"খেতে আপত্তি নেই।" কর্নেল একটু অবাক হয়ে বললেন, "কোথায় পাবে বুনো হাঁস?"

হারাধন হাসল। "কেন স্যার? ওই জলার জলে ফাঁদ পেতে লোকে হাঁস ধরে। ওই যে দেখছেন পঞ্চমুখী শিবের মন্দিরের কাছে একটা গ্রাম। ওখানে গেলে পাওয়া যায়। রাত্তিরে জালের মতো ফাঁদ পেতে রেখে যায় স্যার?"

"নাহ্। তুমি বরং কালকের মতো জেলেপাড়া থেকে মাছ এনো।" কর্নেল তাকে টাকা দিয়ে বেরুলেন।

আজ আকাশে টুকরো-টুকরো মেঘ। রোদ-ছায়ার মধ্যে জলার ধার দিয়ে হাঁটতে থাকলেন কর্নেল। মাঝেমাঝে বাইনোকুলারে উডডাক পাখিটাকে খুঁজছিলেন। পাখিটা নিপাত্তা হয়ে গেল কেন?

দক্ষিণের জঙ্গলে ঢুকে এগিয়ে গেলেন সেই হিজল গাছটার খোঁজে।

গাছটা থেকে প্রায় কুড়ি ফুট দূরে জলা। চারদিক তন্নতন্ন খুঁজে জলার ধারে গেলেন কর্নেল। জলটা খুব স্বচ্ছ। ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাটি। হঠাৎ চোখে পড়ল সোনালী রঙের কী একটা ছোট্ট জিনিস চকচক করছে জলের তলায়। পিঠের কিটব্যাগ থেকে প্রজাপতি ধরা জালের নেট-স্টিকটা বের করলেন। জল হাত দুয়েক গভীর। জিনিসটা টেনে কাছাকাছি এনে আস্তিন গুটিয়ে তুলে নিলেন। যা খুঁজছিলেন, তার একটা পাওয়া গেল।

ছোট্ট বুলেটের নিচের ফাঁপা অংশ। জলে ছুঁড়ে ফেলেছিল লোকটা। দৈবাৎ একটা ধারে পড়ে গিয়েছিল। জাল ফেলার ব্যবস্থা করলে বাকি পাঁচটাও নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

সতর্কভাবে বাইনোকুলারে চারদিকে জঙ্গলের ভেতরটা দেখে নিলেন কর্নেল। কেউ লক্ষ্য রাখেনি তাঁর দিকে। এতে খুনী সম্পর্কে একটা ধারণা পোক্ত হলো বলা চলে। সে নিজের বুদ্ধি-শুদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত আর আত্মবিশ্বাসী। শুধু তা-ই নয়, সে জানে, তার পরিকল্পনা নিখুঁত নিশ্ছিদ্র।

অথচ বরাবর দেখে আসছেন কর্নেল, সব খুনীই নিজের অজ্ঞাতসারে কোনও-না কোনও একটা ভাইটাল সূত্র রেখে দেয়— একচক্ষু হরিণের গল্পটা সব রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের হত্যাকারীর ক্ষেত্রে সত্য। এই কেসে কি তেমন সূত্র আছে?

হুঁ, গৌতমকে লেখা বেনামী চিঠিটা।

একটু চমকে উঠলেন কর্নেল। চুরুট ধরালেন। প্রত্যেকটি খুন একই লোক একই অস্ত্রে করেছে। অথচ চিঠিটা পাওয়া গেছে, যেদিন গৌতম খুন হয়, সেদিনই। কেন তার আগে নয়?

অবশ্য 'জুতোর বাক্স' বলতে কী বুঝিয়েছে, এটা জানার ওপর নির্ভর করছে এই সূত্রটা সত্যি ভাইটাল কি না।

জঙ্গল পেরিয়ে গিয়ে ধানক্ষেত। তারপর বিদ্যুৎকেন্দ্র। কর্নেল বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাশের রাস্তা ধরে হাঁটছিলেন। তাপস রুদ্রকে যে-সব তথ্য সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছেন, তার মধ্যে একটা হলো : কলকাতায় গার্গীর বিয়ের সময় কোনও প্রেমিক ছিল কি না। না থাকলে কাঁটালিয়াঘাটেও তেমন কেউ ছিল কি না, খুঁজে দেখা দরকার। একটা চমৎকার পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলেই এই তথ্যটা জানা জরুরি। গার্গীর কোনও প্রেমিক স্থানীয় হাঙ্গামার সুযোগ নিতে পারে।

আবার কথাটা মাথায় ভেসে এল কর্নেলের : হত্যার অস্ত্র এক। মোডাস অপারেন্ডি এক। হত্যাকারী ছয় রাউন্ড গুলি ফায়ার করে টার্গেটে হাত পাকিয়েছে। তারপর কাজে নেমেছে। নাহ্, ভাড়াটে খুনীর থিওরি টিকছে না। সে এমন লোক, যে এই প্রথম রিভলভার ব্যবহার করেছে এবং তার হত্যার মোটিভ প্রতিহিংসাচরিতার্থ।

গার্গীর কোনও প্রেমিক হওয়াই সম্ভব। তার আসল লক্ষ্য ছিল গার্গী ও গৌতম, দুটোই গ। তার ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। দুই গ-কে হত্যার জন্য সে হিটলিস্টে ক খ গ ঘ সাজিয়েছে। ঘ-কেও মেরেছে। ক খ ঘ তিনজনই বয়স্ক অশক্ত মানুষ। প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিল না। এই তিনটি হত্যার জন্য সে এদের বেছে নিয়েছে, যাতে হত্যার কাজটা খুব সহজ হয়। গ-য়ের ক্ষেত্রে সে একটু ঝুঁকি নিয়েছে অবশ্য, কুড়ি ফুট দূর থেকে গুলি করেছে। যদি মোট গুলি বারোটা হয়, তখন তার রিভলভারে চারটে গুলি ছিল। কাজেই ঝুঁকিটা তত কিছু না। কাছে এসে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করতে পারত—যদি প্রথম দুটো গুলি দৈবাত ফস্কে যেত। নির্জন জায়গা। সন্ত্রাসের আবহাওয়ায় এই নির্জনতা স্বাভাবিক।

টাউনশিপের মোড়ে কর্নেল একটা রিকশা নিলেন। বললেন, "থানা যাব।"

থানায় ও সি নেই। রঞ্জিত মিত্রও নেই। ডিউটি অফিসার জামাল আমেদ কর্নেলকে দেখে অভ্যর্থনা করে ও সির ঘরে বসালেন। বললেন, "জুতোর বাক্সের ব্যাপারটা জানা গেছে কর্নেল সরকার! ঘনশ্যামবাবু সকালে এসে স্টেটমেন্ট দিয়ে গেছেন। দেখাচ্ছি।"

কর্নেল দ্রুত পড়ে নিয়ে একটু হাসলেন। "মিঃ রুদ্রের খবর জানেন?"

"উনি আউট অব স্টেশন। এখনও ফেরেননি।"

"আমি উঠি।"

জামালসাহেব তাঁকে গেট অব্দি বিদায় দিতে এলেন। বললেন, "আজ আবার ঘাটবাজারে হাঙ্গামা। ও সি সায়েব ফোর্স নিয়ে গেছেন। এখানে যা অবস্থা চলছে, কহতব্য নয়। কথায়-কথায় বোমাবাজি আর খুনজখম!"...

ঘনশ্যাম অফিস যায়নি। যাবে ভেবেছিল, কারণ এই শূন্য ঘরে কাটানো তার পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু ডাঃ চৌধুরী এসে তাকে নিষেধ করে গেলেন। এই মানসিক অবস্থায় তার অফিস করা উচিত নয়। কাজপাগল মানুষ ঘনশ্যাম। এতদিন ধরে তাকে দেখেছেন ডাঃ চৌধুরী। হাসপাতালে সবসময় ছুটোছুটি, রোগীদের খোঁজখবর করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ—একটুও ফাঁকি দেয় না সে। এবার তার কয়েকটা দিন বিশ্রাম দরকার। তা না হলে এই সাংঘাতিক মেন্টাল শকে সে নিজেই মানসিক রোগী হয়ে পড়বে।

তাকে রান্না করতেও বারণ করে গেছেন ডাঃ চৌধুরী। বরং ঘাটবাজারে হোটেলে গিয়ে খাবে। নার্ভ শান্ত রাখার জন্য কিছু ট্যাবলেট দিয়ে গেছেন। ঘনশ্যাম খায়নি। চুপচাপ শুয়ে ছিল। দেয়ালে বিয়ের ছবির দিকে তাকাচ্ছিল মাঝে মাঝে। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল সবকিছু। এখান থেকে চলে যেতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচত। কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই। পুলিশের তদন্ত শেষ না হওয়া অব্দি তাকে থাকতে হবে, ও সি বলে দিয়েছেন।

এতক্ষণে অস্থিরতা তীব্র হলে সে একটা ট্যাবলেট খেল। তার কিছুক্ষণ পরে কেউ বাইরের দরজায় কড়া নাড়ল। ঘনশ্যাম চমকে উঠেছিল। একটু পরে বেরিয়ে সে সাড়া দিল, "কে?"

"আমি ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।"

ঘনশ্যাম উঠোনে নেমে গেল। দরজা খুলে একটু অবাক হলো সে। খ্রীস্টান ফাদারের মতো চেহারা, মুখে সাদা দাড়ি, মাথায় টুপি, বুকের ওপর ক্যামেরা আর কী একটা ঝুলছে এবং পিঠে একটা কিটব্যাগ। ঘনশ্যাম বলল, "আপনি কোত্থেকে আসছেন স্যার?"

"কলকাতা। আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

"আপনাকে তো চিনতে পারলুম না—"

"আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। এখানে বেড়াতে এসেছি।"

"আপনি ট্যুরিস্ট?"

"বলতে পারেন।" বলে কর্নেল তার পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। "ভয় পাওয়ার কিছু নেই ঘনশ্যামবাবু! আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলেই চলে যাব।"

ঘনশ্যাম খুব অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। কর্নেল বারান্দার চেয়ারে বসে বললেন, "আসুন? আপনাকে সব বলছি। আমি একজন নেচারিস্ট। পাখি দেখা, প্রজাপতি ধরা, কিংবা জঙ্গল খুঁজে অর্কিড কালেকশন আমার হবি। তবে কোথাও কোনও রহস্যময় খুনখারাপি ঘটলে আমি তাতে নাক গলাই। এ-ও হবি বলতে পারেন। এখানে এসে

শুনলুম, পর-পর কয়েকটা রহস্যজনক মার্ডার ঘটেছে এবং আপনার স্ত্রীও—যাই হোক, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আপনি নিশ্চয় চান আপনার স্ত্রীর খুনী ধরা পড়ুক?”

ঘনশ্যাম বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে রইল। কর্নেলকে দেখতে দেখতে বলল, “কিন্তু পুলিশ—”

কর্নেল হাত তুলে বলল, “পুলিশের ব্যাপার তো আজকাল জানেন! আমার মনে হয়েছে, সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যময়। পুলিশের তদন্ত দায়সারা এবং মোটা দাগের। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই!”

ঘনশ্যাম তাঁর দিকে তাকাল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল। একটু পরে সে সন্দিগ্ধভাবে বলল, “আপনি আউটসাইডার। আপনি কী করে—আপনি কি ডিটেকটিভ অফিসার?”

কর্নেল হাসতে হাসতে তার হাতে নিজের নেমকার্ড দিয়ে বললেন, “এই বয়সে আমি অফিসার হব কোন দুঃখে ঘনশ্যামবাবু? তা ছাড়া আমি রিটায়ার্ড কর্নেল।”

“কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী করে—”

“ঘনশ্যামবাবু, আপনি চান না আপনার স্ত্রীর খুনী ধরা পড়ুক?”

“দেখুন স্যার! আমার স্ত্রী দৈবাৎ মারা পড়েছে বলেই আমার ধারণা। এখন কথা হলো, যে যাবার সে চলে গেছে। আর তো তাকে ফিরে পাব না। মাঝখান থেকে গুণ্ডাগুলো আমাকে ফিনিশ করবে। আপনি আউটসাইটার। কে সারাক্ষণ আমার বডিগার্ড হয়ে আমাকে রক্ষা করবে? ভেবে দেখুন, আমাকে তো বেঁচেবর্তে থাকতে হবে এ বাজারে এই চাকরি খোয়ালে আর পাওয়াও অসম্ভব।” ঘনশ্যাম হাত জোড় করল “আপনি যেই হোন স্যার! খামোকা আমাকে বিপদে ফেলবেন না! আমি যা বলার সব পুলিশকে বলেছি। কিচ্ছু গোপন করিনি। পুলিশ যা করার করুক। আমি এখান থেকে ট্রান্সফারের চেষ্টা করছি।”

“একটা প্রশ্ন ঘনশ্যামবাবু! শুধু একটা প্রশ্নের জবাব দিন।”

“কী?”

“গৌতম ছাড়া এখানে আর কারও সঙ্গে আপনার স্ত্রীর কোনও সম্পর্ক ছিল কি না?”

ঘনশ্যাম ক্ষুব্ধভাবে বলল, “না! এ সব পার্সোনাল স্ক্যান্ডাল লোকে রটাচ্ছে!”

“আপনার স্ত্রীর নামে আসা চিঠিপত্র এখন খুঁজে দেখতে আপত্তি কী ঘনশ্যামবাবু? খুঁজে দেখলে—”

“অ্যাবসার্ড। কী সব বলছেন আপনি?”

“প্লিজ ঘনশ্যামবাবু! উত্তেজিত হবেন না। এমন তো হতে পারে, আপনার বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীর কোনও সম্পর্ক ছিল কারও সঙ্গে। প্রতিহিংসাবশে সে এতদিনে তাঁকে খুন করেছে!”

ঘনশ্যাম বিরক্ত হয়ে বলল, “আবার একই কথা! আমার স্ত্রী দৈবাত মারা পড়েছে।

ডাক্তারবাবুর ছেলের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে পাশাপাশি বসেছিল, কাজেই একটা গুলি তার গায়েও লেগেছে!"

"শুনলুম কপালে লেগেছিল।"

"একই কথা। আমি ট্র্যাংকুলাইজার খেয়েছি। ঘুম পাচ্ছে। আপনি আসুন স্যার!"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঘনশ্যামবাবু! খুনীর রিভলভারে এখনও একটা গুলি আছে।"

ঘনশ্যাম চমকে উঠে বলল, "সো হোয়াট?"

একটু সাবধানে থাকা উচিত আপনার। কারণ আপনার নামেও ঘ আছে।"

"আই ডোন্ট কেয়ার ফর এনিথিং! মারলে মারবে।" বলে সে রাগ করে সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো ছুঁড়ে ফেলল উঠোনে।

"কিন্তু আপনি একটু আগে বলছিলেন, আপনি বেঁচেবর্তে থাকতে চান।"

"কে না চায়?"

"আপনি বুদ্ধিমান, ঘনশ্যামবাবু! আসি। থ্যাংকস!"

কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে ঘরে ফিরল ঘনশ্যাম। ওপরের জানলা দিয়ে দেখল বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছাতিমগাছটার কাছে গিয়ে চোখে দূরবীন রেখে কী দেখছেন। পাগল নয় তো? মানসিক রোগী অনেক রকম আছে। এই ভদ্রলোকের ব্যাপার দেখে তা-ই মনে হচ্ছে। লোকের কাছে শুনে হুট করে তার বাড়িতে এসে ঢুকে পড়লেন! যেচে পড়ে নাক গলানো আর থ্রেটন করা। ঘনশ্যাম দেখল, কর্নেল বাঁধে গিয়ে উঠলেন। তারপর হঠাৎ চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন। নির্ঘাত মানসিক রোগী। বুড়ো বয়েসে নানা ধরনের উৎকট বাতিক অনেকের মাথায় চাগিয়ে ওঠে। ঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে বৃদ্ধ পাগল হয়ে যায়।...

কর্নেল বাইনোকুলারে দেখতে পেয়েছিলেন বাংলোর সামনে একটা জিপগাড়ি। স্লুইস গেটের কাছে গিয়ে আবার দেখলেন, বারান্দায় ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তাপস রুদ্র বসে আছে।

মিনিট কুড়ি লাগল বাংলোয় পৌঁছুতে। তাপস রুদ্রকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কর্নেলকে দেখে একটু হেসে বললেন, "ট্রেন লেট করছিল। পৌঁছে স্নানাহার সেরে নিতেও খানিকটা দেরি হলো। এসে শুনলুম, আপনি লাঞ্চের সময় ফিরবেন।"

কর্নেলকে একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিলেন তাপসবাবু। কর্নেল কাগজটা খুলে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "খুব ছোটাছুটি করেছেন দেখা যাচ্ছে। থ্যাংকস মিঃ রুদ্র।"

তাপসবাবু বললেন, "কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমার নিজের কাছেও ইনফরমেশনগুলো ভাইটাল মনে হচ্ছে না। যেমন ধরুন, গার্গীদেবীর বাবা-মা দুর্গাপুরে বড় মেয়ের বাড়িতে চলে গেছেন। বাড়িতে নতুন ভাড়াটে। লোকাল থানা যথেষ্ট হেল্প করল। পাড়ার

পুরনো বাসিন্দাদের কাছে গার্গীদের সম্পর্কে তেমন কোনও স্ক্যান্ডালের কথা জানা গেল না। বারাসাতে বিয়ের কথা অবশ্য অনেকে জানে। কিন্তু বারাসতেও একই ব্যাপার। একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন ঘনশ্যামবাবু। তাঁর স্ত্রীর নামে সেখানেও কোনও স্ক্যান্ডালের খবর নেই। ঘনশ্যামবাবুর দু'কাঠা জমি কেনা আছে ওখানে।"

কর্নেল কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে বললেন, "ইনফরমেশনগুলো সত্যি ভাইটাল, মিঃ রুদ্র।"

"বলেন কী!"

"হ্যাঁ। আমার থিওরি আরও স্ট্রং হলো এবার। কর্নেল চোখ বুজে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন। "মিঃ রুদ্র, আমার ধারণা, এবার খুনী নিজেই ধরা দেবে।"

তাপসবাবু অবাক হয়ে বললেন, "নিজে ধরা দেবে! কেন?"

রিভলভারের শেষ গুলিটা—"

"প্লিজ কর্নেল সরকার! আমার কার্ড শো করেছি। আপনারটা এবার শো করুন।"

কর্নেল জঙ্গলের ভেতর টার্গেট প্র্যাকটিসের ঘটনা বর্ণনা করে ছটা গুলির টুকরো এবং একটা ফাঁপা গুলির খোল দেখালেন। 'জুতোর বাক্স'র ঘটনাও শোনালেন। তাপস রুদ্র বললেন, "আমি থানায় এখনও যাইনি। কাজেই এই এপিসোডটার কথা জানতুম না। যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে কিলার তাহলে স্থানীয় লোক। কিন্তু সে নিজে ধরা দেবে কেন বলছেন?"

"শেষ গুলিটা সে নিজের জন্য রেখেছে।"

"ও মাই গড! স্যুইসাইড করবে নাকি?"

কর্নেল হাসলেন। "যে স্যুইসাইড করবে, সে পোস্টার সেঁটে ক খ গ ঘ হিটলিস্ট সাজাতে যাবে কেন মিঃ রুদ্র? অপেক্ষা করুন। আমার মনে হচ্ছে, আজ সন্ধ্যার পর যে-কোনও সময় খুনী ধরা দেবে। কোয়ার্টারে ফিরে বিশ্রাম নিন আপনি। যথেষ্ট ছোটাছুটি করেছেন। সন্ধ্যা ছটা নাগাদ থানায় আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।"...

থানায় ও সি তারক মুখার্জির ঘরে কর্নেল, তাপসবাবু, রঞ্জিত মিত্র ছাড়াও আরও দু'জন অফিসার আড্ডা দেওয়ার মতো বসেছিলেন। আজ আবার ঘাটবাজারে বোমাবাজি হয়েছে। দশ বারো জনকে গ্রেপ্তার করাও হয়েছে। কুখ্যাত কেলো ধরা পড়েছে। ঘোঁতন একটুর জন্য হাত ফস্কে পালিয়ে গেছে। গল্পে-গল্পে সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল। অনেক চা-কফি-স্ন্যাক্স খাওয়া হলো। তাপস রুদ্র বারবার কর্নেলের দিকে তাকাচ্ছিলেন। সাড়ে সাতটায় তিনি অধৈর্য হয়ে বললেন, "কর্নেল সরকার! আমার মনে হচ্ছে, আপনি—"

তাঁর কথায় বাধা পড়ল। কেউ আচমকা ঘরে ঢুকে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "স্যার! স্যার! আমাকে কে গুলি করেছিল! একটুর জন্য বেঁচে গেছি স্যার! জানালা দিয়ে গুলি ছুঁড়েছিল।"

রঞ্জিত মিত্র বললেন, "ঘনশ্যামবাবু! আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলুম?"

ঘনশ্যাম হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "লোডশেডিং বলে জানালা খুলে রেখেছিলুম। হঠাৎ গুলির শব্দ! দেয়ালের একটা ছবিতে গুলি লেগেছে। আবছা দেখলুম স্যার, একটা বেঁটে রোগামতো কে পালিয়ে যাচ্ছে। পরনে গেঞ্জি আর প্যান্ট!"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলুন ঘনশ্যামবাবু! গিয়ে ব্যাপারটা দেখি।"

ঘনশ্যাম কর্নেলকে দেখে অবাক হয়ে গেল। তারপর বলল, "আপনি তখন ঠিকই বলেছিলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি স্যার!"

"চলুন মিঃ রুদ্র! আসুন। মিঃ মুখার্জি! আর য়ু ইন্টারেস্টেড?"

"নিশ্চয়!" তারক মুখার্জি উঠলেন।

পাঁচ জন অফিসার আর জনা চারেক আর্মড কনস্টেবল বেরুলেন। পুলিশ ভ্যান আর একটা জিপে সবাই ব্যস্তভাবে উঠলেন। কর্নেল জিপের সামনে। পাশে ঘনশ্যামকে নিলেন। ঘনশ্যাম বারবার বলছিল, "আপনাকে চিনতে ভুল হয়েছিল স্যার! আপনি ঠিকই বলেছিলেন। তা ছাড়া দেখুন, আমার নামেও ঘ আছে।"

ঘনশ্যামের কোয়ার্টারের কাছাকাছি গিয়ে জিপ থামল। আশেপাশের কোয়ার্টারের বারান্দায় হেরিকেনের আলো আর ভিড় দেখা যাচ্ছিল। সবাই ঘনশ্যামের চ্যাঁচামেচি শুনেছে। কেউ কেউ গুলির শব্দও শুনেছে। কিন্তু বেরুতে সাহস পায়নি।

ঘরের তালা খুলল ঘনশ্যাম। ভেতরে একটা দম কমানো হেরিকেন জ্বলছিল। দম বাড়িয়ে দিল সে। বলল, "আমি এখানে দাঁড়িয়ে হেরিকেন ধরাচ্ছিলুম। হঠাৎ গুলি। ওই দেখুন, ছবি ভেঙে কাচ গুঁড়িয়ে গেছে!"

কর্নেল টর্চের আলোয় দেখে নিয়ে একটু হাসলেন। "আপনাদের বিয়ের পর ছবিটা তোলা হয়েছিল। তাই না ঘনশ্যামবাবু?"

"হ্যাঁ, স্যার!"

"আপনার স্ত্রীর দুর্ভাগ্য! গুলি এবার তার ছবির কপাল ফুঁড়ে দেয়ালে ঢুকেছে।" কর্নেল তার চোখে চোখ রেখে বললেন, "রিভলভারটি কি গঙ্গায় ফেলে দিলেন ঘনশ্যামবাবু?"

ঘনশ্যাম তাকাল। "আজ্ঞে?"

"রিভলভারটা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছেন। তাই না?" বলে কর্নেল তাপস রুদ্রের দিকে ঘুরলেন।

তাপস রুদ্র ঘনশ্যামের শার্টের কলার ধরে বললেন, "পাঁচটা মার্ডারের জন্য আপনাকে গ্রেফতার করা হলো ঘনশ্যামবাবু!"

ঘনশ্যাম শক্ত হয়ে গেল। মেঝের দিকে দৃষ্টি। কর্নেল পকেট থেকে একটা চারমিনারের খালি প্যাকেট বের করে বললেন, "খুব সংসারী মানুষ আমাদের এই ঘনশ্যাম রায়। সিগারেটের প্যাকেটে বাজারের হিসেব লেখার অভ্যাস আছে। নিজের বাড়িতে নিজেই চুরি করে চমৎকার অ্যালিবাই সাজিয়েছিলেন। জঙ্গলে টার্গেট প্র্যাকটিস করার সময়

অন্যমনস্কতার দরুন এই প্যাকেটটা ফেলে আসাই আপনার কাল হয়েছিল। ঘুড়ি সুতো ছেড়ে দেওয়ার মতো স্ত্রীকে গৌতমবাবুর সঙ্গে মিশতে দিয়ে আড়ালে লক্ষ রাখতেন। হ্যাঁ, অন্তত বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে খুন করতেনই। দৈবাত রিভলভারটা হাতে এসে গিয়ে নিরাপদে খুন করার প্ল্যান ছকেছিলেন। ব্যাকগ্রাউন্ড চমৎকার। দুই গ্যাংয়ে বিবাদ খুনজখম। কাজেই পোস্টারে হিটলিস্ট মানিয়ে যায়। আপনার টার্গেট ছিল গার্গীদে এবং গৌতম চৌধুরী। কিন্তু পুলিশকে ভুলপথে চালাতে নিরীহ বৃদ্ধ ক খ এবং ঘ-কে মারলেন। সকাল সওয়া দশটার ট্রেনের টিকিট কেটে ট্রেনে চাপলেন না। সারাদি কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থেকে তিনটে খুন করে ট্রেনে চাপলেন রাত দশটার ডাউনে অনবদ্য আপনার ঠাণ্ডা মাথার প্ল্যানিং। আমি জানতুম, শেষ গুলিটা খরচ করে নিজে একেবারে নির্দোষ প্রমাণ করতেই হবে আপনাকে। কারণ আপনার নামেও ঘ আছে তাই মিঃ রুদ্রকে বলেছিলুম, খুনী নিজেই ধরা দেবে।”

এইসময় বিদ্যুৎ ফিরে এল। দু’জন কনস্টেবল হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দিল ঘনশ্যামে হাতে।...

# স্টোনম্যান

ধারিয়া ফলসের মাথায় কয়েকটা পাথরের ওপর ওরা বসেছিল। দীপিতা, বিনীতা, রোমেনা এই তিন যুবতী। কিংশুক, রাতুল, সুপর্ণ এই তিন যুবক। আর ছিলেন তাদের কমন মামাবাবু চন্দ্রকান্ত। এই প্রমোদভ্রমণে তিনিই তাদের গার্জেন।

হুল্লোড়বাজ আমুদে মানুষ চন্দ্রকান্ত। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যে এই যুবক-যুবতীদের চেয়ে কোনও অংশে কম নন।

'ধারিয়া ফলস' নামের জলপ্রপাতটি তত কিছু বিখ্যাত নয়। ধারিয়ার ধারা ক্ষীণ বলা চলে। কিন্তু সত্তর ফুট ওপর থেকে নিচের পাথরে আছড়ে পড়ার সময় সেই ক্ষীণতা গুঁড়ো-গুঁড়ো ছড়িয়ে শেষবেলার রোদে বর্ণাঢ্য রামধনু এঁকেছে। দুধারে শরৎকালের সবুজের ঘোরলাগা বৃক্ষলতাগুল্ম স্তরে স্তরে সাজানো। তার ওপর কোথাও কোথাও ফুল ফুটে অমর্ত্যমায়া ছড়িয়ে রেখেছে।

রোমেনা পাথরে ফাঁকে গজিয়ে ওঠা ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল হঠাৎ। সাদা ফুলের ঝাঁক ঝোপটার মাথায়। কেউ তাকে লক্ষ্য না করার কারণ চন্দ্রকান্তের একটা বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর গল্প। চন্দ্রকান্ত রাঁচি জেলার নামকরা শিকারি ছিলেন। তাঁর গল্পের বাঘটা ছিল এই ধারিয়া এলাকার সাংঘাতিক এক মানুষখেকো।

রোমেনা কয়েকটা ফুল তুলে চুলে গুঁজল। তারপর ফুলপরী হওয়ার আকস্মিক নেশার মতোই তাকে পেয়ে বসল হারিয়ে যাওয়ার নেশা।

সে পাথরগুলোর আড়ালে গিয়ে বসে পড়ল। নিঝুম পরিবেশে শুধু জলপ্রপাতের শব্দ ছাপিয়ে চন্দ্রকান্তের চড়া গলায় গল্প বলার শব্দ ভেসে আসছিল। রোমেনা মুখ টিপে হাসছিল। যখন ওরা দেখবে রোমেনা নেই, ওরা নিশ্চয় ভাববে রোমেনাকে বাঘে তুলে নিয়ে গেছে। কী দারুণ হইচই না হবে!

চন্দ্রকান্ত বলছিলেন, "এলাকায় আর বাঘ নেই। তবে কিছু বলা যায় না।"

রোমেনা ভাবছিল, আচ্ছা, সত্যি যদি তাকে এখন বাঘে তুলে নিয়ে যায়, সুপর্ণ কী করবে? সুপর্ণের প্রতিক্রিয়া যাচাই করার এমন সুযোগ রোমেনা আর পাবে না। দেখা যাক না সুপর্ণ কী করে। রাতুল, কিংশুক, দীপিতা, বিনীতা সবাই জানে রোমেনার সঙ্গে সুপর্ণর একটা গোপন সম্পর্ক আছে। চন্দ্রকান্তও টের পেয়েছেন। উনি খোলা মনের মানুষ। চলাবলায় নাগরিকতার পালিশ কম। হাসতে হাসতে বলছিলেন, "কলকাতা যাওয়া হয়নি অনেকদিন। এবার যাওয়ার একটা চান্স পাব মনে হচ্ছে। সুপু আর রুমুর ঘটকালি না হয় আমিই করলুম।"

সবাই হেসে অস্থির। সুপর্ণ ও রোমেনাও। দীপিতা বলছিল, "ভেতরে-ভেতরে রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে মামাবাবু। আপনার ঘটকালির নো হোপ নো চান্স! তবে ইনফরম্যালি এখনই ওদের মালাবদল ঘটিয়ে দিতে পারেন।"

চন্দ্রকান্ত বলেছিলেন, "ওক্কে! ওক্কে! চলো, আজই বিকেলে ধারিয়া ফলসে গিয়ে বনদেবীকে সাক্ষী রেখে বুনো ফুলের মালাফালা গেঁথে—হুঁ, তোমরা ঝিম চাক ঝিম চাক নাচবে। ব্রেকড্রান্স!"

ধারিয়া ফলসের দিকটা পশ্চিম। ওদিকে অনেকদূর পাহাড় নেই। জঙ্গল আছে। তাই বিকেলের আলো এসে সরাসরি পড়ছে প্রপাতের ওপর। কিন্তু উত্তর, দক্ষিণ ও পুবে টিলাপাহাড় উঁচু-নিচু হয়ে ঢেউয়ের মতো চলে গেছে অনেকদূর। উত্তর দিকটায় খোয়া বিছানো রাস্তা। সেখানে সাদা অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা চন্দ্রকান্তের।

চন্দ্রকান্তের গল্পটা হঠাৎ থেমে গেল। "আরে! রুমুটা গেল কোথা?" বলে হাঁক দিলেন, "রুমু! রুমু! বাঘ আছে! চলে এসো!"

রাতুল বলল, "সুপু! খুঁজে আন ওকে। রুমু তোরই লায়েবিলিটি কিন্তু!"

সুপর্ণ গম্ভীর হয়ে গেল। "ওই সব ফানি কথাবার্তা বন্ধ কর তো তোরা।"

"যা বাবা!" দীপিতা বলল। "ফানি ব্যাপারটা এখানেই তো অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা! সুপুদা! ডোন্ট ফরগেট দ্যাট। মামাবাবু, দেখুন সুপু কেমন তুম্বো মুখে তাকাচ্ছে!"

চন্দ্রকান্ত আবার ডাকলেন, "রুমু! রুমু! চলে এস। জঙ্গল জায়গা। পোকামাকড় থাকবে।"

বিনীতা দীপিতার ছোট বোন। সে হাসতে হাসতে বলল, "ভূত আছে বলুন মামাবাবু! রুমু ভূতকে ভীষণ ভয় পায়।"

কিংশুক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "সুপু! তোর হয়ে আমি খুঁজে নিয়ে আসছি। হারিয়ে গেলে আমি বা রাতুল পস্তাব না। তুই পস্তাবি!"

সুপর্ণ বলল, "সব কিছুর একটা সীমা আছে। তোরা বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস!"

কিংশুক লম্বা পা ফেলে সেই ঝোপটার কাছে গেল। রোমেনাকে দেখতে পেল। রোমেনা সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করল ওকে। কিংশুক এক লাফে পাথরে উঠে কপট গাম্ভীর্যে ডাকল, "রুমু! ফিরে এসো। সুপু তোমার জন্য কাঁদছে!"

রাতুল কিন্তু লক্ষ্য রেখেছিল কিংশুকের দিকে। সে একটা কিছু আঁচ করে উঠে গেল ওর কাছে। তারপর রোমেনাকে দেখতে পেল। রাতুলও কপট গাম্ভীর্যে ডাকল, "রোমেনা! তুমি যেখানে থাকো, ফিরে এস। সুপর্ণ শয্যাশায়ী।"

চন্দ্রকান্ত বুদ্ধিমান মানুষ। হন্তদন্ত হয়ে এসে রোমেনার দিকে আঙুল তুলে বললেন, "পাষাণী অহল্যা হয়ে পড়ে আছিস দেখছি। রামচন্দ্র তো তুম্বো মুখে বসে আছে। কিন্তু ব্যাপারটা হল, পাথরের ফাটলে শঙ্খচূড় সাপ থাকতে পারে জানিস?"

রোমেনা তক্ষুণি লাফ দিয়ে উঠে সরে এল। "যান্! খালি মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছেন।" বলে সে হেসে ফেলল।

দীপিতা বলল, "রুমু! সুপু কী স্বার্থপর তাহলে বোঝ। চুপচাপ বসে আছে।"

বিনীতা বলল, "সুপুদা নিশ্চয় দেখেছিল রুমুকে ওখানে যেতে।"

কিংশুক চলে এল। বলল, "মোটে সাড়ে চারটে বাজে। চুপচাপ বসে গেঁজানোর মানে হয় না। আয় সুপু, মাউন্টেনিয়ারিং করি। ফলসের পাশ দিয়ে পাথর বেয়ে নিচে নামি আয়। রাতুল! কাম অন্।"

রাতুল বলল, "নাহ্। বরং চোরপুলিশ খেলা যাক। রুমু আইডিয়াটা আমার মাথায় এনে দিয়েছে।"

রোমেনা বলল, "হাইড অ্যান্ড সিক গেম, রাতুলদা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে খুঁজে বের না করতে পারলে ফাইন। ফাইনের রেট ঠিক করে দিন মামাবাবু!"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "হাইড অ্যান্ড সিক তো খেলবে! জঙ্গল জায়গা।"

দীপিতা উঠে দাঁড়াল। বলল, "অসাধারণ খেলা হবে। মামাবাবু, দেখেই বুঝেছি স্রেফ নিরিমিষ জঙ্গল। ফাইনের রেট ঠিক করে দিন!"

চন্দ্রকান্ত একটু দ্বিধা দেখিয়ে বললেন, "কিন্তু—আচ্ছা, বেশিক্ষণ নয়। তিনবার খেলবে। পাঁচ মিনিটে চোর খুঁজে না পেলে পাঁচ টাকা ফাইন প্রত্যেকের। আর চোর খুঁজে পেলে চোরের ফাইনও পাঁচ টাকা।"

রাতুল বলল, "আমি চোর হই।"

রোমেনা বলল, "না, আমি।"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "টস করি। আর কেউ চোর হতে চাও?"

রাতুল ও রোমেনা ছাড়া সবাই 'পুলিশ' হতে চায়। চন্দ্রকান্ত টস করলেন। রাতুল চোর হল। তারপর শুরু হল এক অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা।

রাতুল হনহন করে এগিয়ে একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল। চন্দ্রকান্ত বিচারক। পুলিশ হল কিংশুক, সুপর্ণ, দীপিতা, বিনীতা ও রোমেনা। চন্দ্রকান্ত ঘড়ি দেখে পাঁচ মিনিট পরে ঘোষণা করলেন, "সিক অ্যান্ড ক্যাচ হিম!"

'পাঁচ পুলিশ' এদিকে-ওদিকে চোর খুঁজতে ছুটে গেল।

ধারিয়া নদী ও প্রপাত পশ্চিম দিকে। ছোট্ট নদী এবং তার বুকে অজস্র পাথর পড়ে আছে। পাথরগুলো পিচ্ছিল। কাজেই নদী পেরিয়ে ওপারের ঘন জঙ্গলে রাতুলের লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা নেই। বাকি তিন দিকে উঁচু-নিচু টিলা। সমতলে নানা সাইজের পাথর আর ঘন জঙ্গল। পূর্বের জঙ্গল ও পাহাড় ভেদ করে একফালি খোয়া বিছানো রাস্তা প্রপাতের শ'দুই গজ দূরে বাঁক নিয়ে চলে গেছে দক্ষিণে। রোমেনা গেল রাস্তাটার দিকে। সে ভেবেছিল, রাতুল গাড়ির আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে।

দীপিতা গেল উত্তরের ঢালু টিলার দিকে। টিলাটা শালবন এবং গুল্মলতায় ঢাকা। গুল্মলতাগুলো পাথরের চাঁই ঢেকে সবুজ স্তূপের মতো দেখাচ্ছে। সে ভেবেছিল, এই সব স্তূপের আড়ালে রাতুল লুকিয়ে আছে।

বিনীতা গেল উত্তর-পূর্বে দুই টিলার মাঝখানে শুকনো গিরিখাতের দিকে।

কিংশুক উত্তর-পশ্চিমে নদীর ধারে ঝোপঝাড় খুঁজতে গেল।

সুপর্ণের এই খেলার ইচ্ছে তত ছিল না। সে নেহাত দায়সারাভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমে

প্রপাতের কিনারা ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা পাথরের ওপর উঠল। অনিচ্ছার দৃষ্টিতে 'চোর' খুঁজতে থাকল।

সুপর্ণের মনে গত রাত থেকে একটা দ্বিধা এসে ঢুকেছে। রোমেনার সঙ্গে তার অনেক দিনের সম্পর্ক ঠিকই। কিন্তু রোমেনাকে সে কখনই বিয়ে করার কথা ভাবেনি। রোমেনাও ভেবেছে কি না সে টের পায় না। একথা ঠিক, সে একবার রোমেনাকে চুমু খেয়েছিল। রোমেনা তার চুমুতে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু আজীবন সঙ্গিনী হিসেবে সুপর্ণ তাকে কল্পনা করতে পারে না। রোমেনার মধ্যে কী একটা দূরত্ব আছে বলে তার ধারণা। রোমেনা যেন একটা অদ্ভুত উঁচু বাড়ির মতো, যে-বাড়ির উঁচুতলায় ওঠার কোন সিঁড়ি নেই। সেন্ট পলস কলেজে পড়ার সময় দুজনের মধ্যে ওই সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে সুপর্ণ একটা কোম্পানির পারচেজ অফিসার হয়েছে এবং রোমেনা হয়েছে একটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী ম্যানেজার। দুজনেই মোটামুটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। সুপর্ণের বাবা-মা বেঁচে নেই। দাদার সঙ্গে থাকে। রোমেনার বাবা-মা বেঁচে আছেন। তবে রোমেনার বাবা রিটায়ার্ড আইনজীবী এবং মা চির-গৃহিণী। তাঁদের একমাত্র সন্তান রোমেনা।

গত রাতে দীপিতা হঠাৎ সুপর্ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। চন্দ্রকান্তের এক বোনের দুই মেয়ে দীপিতা আর বিনীতা। চন্দ্রকান্তের বাড়ির বিশাল লনে কিছু উঁচু বিদেশী গাছ আছে। সুপর্ণ মাঝে মাঝে কেন যেন বিষণ্ন বোধ করে। সে জ্যোৎস্নায় একটা গাছের ছায়ায় একা দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ দীপিতা পেছন থেকে পা টিপে টিপে এগিয়ে তার দুচোখ চেপে ধরেছিল। নিছক কৌতুক? কিন্তু দীপিতার মধ্যে কী একটা টান অনুভব করেছিল সুপর্ণ। দীপিতা যেন রোমেনার কাছ থেকে তাকে কেড়ে নিতে চাইছে।

নাকি মনের ভুল? দীপিতা অবশ্য একটু গায়েপড়া স্বভাবের মেয়ে।

কিংশুক ও দীপিতার মধ্যে আবেগময় সম্পর্ক ছিল বলে সুপর্ণের ধারণা। কিংশুককে আজ সকাল থেকে যেন এড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করছে দীপিতা। কিংশুক বিনীতার সঙ্গে বেশি কথা বলছে। কিছু কি ঘটেছে?

এদিকে রাতুল চন্দ্রকান্তের দূর সম্পর্কের এক বোনের ছেলে এবং সেই হিসেবে চন্দ্রকান্তের ভাগনে। রাতুল কাল থেকে রোমেনার সঙ্গে যেন ভাব জমানোর চেষ্টা করছে। অথচ তাতে সুপর্ণের আর ঈর্ষা হচ্ছে না। নিজের এই আকস্মিক পরিবর্তনে সুপর্ণ নিজেই বিস্মিত।

সে পাথরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। ঠিক এই সময় উত্তরে রোমেনার চিৎকার শোনা গেল, "পেয়েছি! পেয়েছি! রেডহ্যান্ডেড কট।"

সুপর্ণ দেখল, রাতুলের শার্টের কলার ধরে নিয়ে আসছে রোমেনা। দুজনের মুখেই উজ্জ্বল হাসি। চন্দ্রকান্ত ঘোষণা করলেন, "রাতুলের পাঁচ টাকা ফাইন!"

সবাই চন্দ্রকান্তের কাছে দৌড়ে গেল। এবার রোমেনা আর কিংশুক চোর হতে চায়। কিন্তু টসে জিতল কিংশুক। রোমেনা বাঁকা মুখে বলল, "ভ্যাট। আমার লাকটাই বাজে।"

কিংশুক দৌড়ে গিয়ে উত্তর-পূর্বের টিলার জঙ্গলে গা ঢাকা দিল। পাঁচ মিনিট লুকোনোর সময় দিয়ে চন্দ্রকান্ত আগের মতো হাঁকলেন, "হাইড অ্যান্ড সিক" রোমেনা, দীপিতা, বিনীতা, সুপর্ণ ও রাতুল খুঁজতে দৌড়ুল।

রাতুল দক্ষিণ-পশ্চিমে কিছু দূর এগিয়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল। একটা আশ্চর্য শিহরন খেলে গেল তার শরীরে। রোমেনা একটা ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিল। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রাতুল। তারপর কী এক হঠকারিতায় রোমেনার মুখটা দুহাতে ধরে সে চুমু খেয়ে ফেলল। আশ্চর্য ব্যাপার! রোমেনা সাড়া দিল। মাত্র আধ মিনিট। অথচ কী দীর্ঘ সময় ধরে যেন ওই চুম্বন। রোমেনার শরীরের সুঘ্রাণ এখনও রাতুল টের পাচ্ছে। শরীর কাঁপছে।

দীপিতার চিৎকার শোনা গেল গাড়িটার কাছে। "পেয়েছি! পেয়েছি!"

দীপিতা কিংশুকের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল চন্দ্রকান্তের কাছে। চন্দ্রকান্ত ঘোষণা করলেন, "পাঁচ টাকা ফাইন কিংশুকের।"

এবার শেষ খেলা। সুপর্ণ 'চোর' হতে চাইল। সবাই কিছুটা ক্লান্ত। রোমেনা এবার 'চোর' হতে চাইল না। একটু অবাক হল সুপর্ণ। কিংশুক বলল, "চোর হওয়ার চাইতে পুলিশ হওয়াই ভাল। অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চার হয়।"

রোমেনা সাড়া দিয়ে বলল, "ঠিক বলেছ কিংশুকদা। ডিসকভারারের আনন্দ অনেক বেশি।"

আগের মতো খেলা শুরু হল। সুপর্ণ দক্ষিণে ছুটে গিয়ে অদৃশ্য হল। পাঁচ মিনিট পরে চন্দ্রকান্ত ঘোষণা করলেন, "হাইড অ্যান্ড সিক!" সবাই দৌড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল জঙ্গল আর পাথরের আড়ালে।

দিনের আলো কমে আসছে। জঙ্গলে পাখিদের ডাক শোনা যাচ্ছে এবার। একটা হাওয়া উঠেছে এতক্ষণে। বৃক্ষলতাগুল্মে আলোড়ন শুরু হয়েছে। প্রপাতের শব্দ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

পাঁচ মিনিট পরে চন্দ্রকান্তের চিৎকার শোনা গেল, "কাম ব্যাক! কাম ব্যাক অল দা পোলিস ফোর্স। তোমরা হেরে গেছো।"

একে-একে এল রাতুল, কিংশুক, দীপিতা, বিনীতা ও রোমেনা। প্রত্যেকটি মুখে ব্যর্থতার কাঁচুমাচু হাসি। চন্দ্রকান্ত হাঁক দিলেন, "সুপু! কাম ব্যাক! তুমি খেলা জিতেছ!"

দীপিতা বলল, "রুমু! রেডি হও। বিজয়ীকে বরমাল্য দিয়ে রিসিভ করবে তুমি!" তারপর সে ঝোপটার কাছে গিয়ে উৎসাহে সেই সাদা বুনো ফুল ছিঁড়তে গেল।

কিন্তু সুপর্ণের সাড়া নেই।

চন্দ্রকান্ত চিৎকার করে ডাকলেন, "কী হচ্ছে সুপু, এবার আমরা বাড়ি ফিরব। কাম ব্যাক!"

কোনও সাড়া এল না।

রোমেনা ভুরু কুঁচকে বলল, "কোনও মানে হয়?"

দীপিতা বলল, "নিশ্চয় সুপুদা গাড়িতে বসে আছে। চলুন মামাবাবু গাড়ির কাছে যাই।"

সবাই গাড়ির কাছে গেল। সেখানে সুপর্ণ নেই। এতক্ষণে মুখগুলি একটু গম্ভীর হল। রোমেনা খাপ্পা হয়ে বলল, "ও বরাবর এমনি। সবটাতে বাড়াবাড়ি করা চাই।"

বিনীতা আস্তে বলল, "সুপুদাকে রাস্তায় পেয়ে যাব। নিশ্চয় রাস্তার ধারে কোথাও বসে আছে।"

চন্দ্রকান্ত গাড়িতে উঠে বললেন, "এস তো দেখি।" সবাই গাড়িতে উঠে বসল। কিংশুক, বিনীতা, দীপিতা ব্যাক সিটে। সামনে রাতুল, রোমেনা এবং চালক চন্দ্রকান্ত। শ'চারেক গজ এগিয়ে রাস্তার বাঁ পাশে আদিবাসীদের একটা থান। পাথরের সমতল চৌকো ও চওড়া বেদি। তার ওপর একগাদা ছাই। নিচে কবেকার পশুপাখি বলির রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে।

গাড়ি থামিয়ে চন্দ্রকান্ত বললেন, "আমি থানটা একবার দেখে আসি। তোমরা বসো।"

চন্দ্রকান্ত জঙ্গলের একফালি পায়ে চলা রাস্তা ধরে থানে গেলেন। গাড়ি থেকে রোমেনা বেরুল। থানটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

হঠাৎ চন্দ্রকান্ত থানের উল্টোদিকে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর চেঁচিয়ে ডাকলেন, "কিংশুক! রাতুল! তোমরা এস তো শিগগির!"

কিংশুক ও রাতুল ছুটে গেল। তিন যুবতীও তাদের পিছনে হন্তদন্ত ছুটে গেল।

থানের উল্টোদিকে ঝোপের ধারে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সুপর্ণ। মাথাটা রক্তাক্ত এবং থ্যাঁতলানো। পাশে এক টুকরো রক্তমাখা কালো পাথর পড়ে আছে। কেউ ওই পাথরটা দিয়ে সুপর্ণের মাথাটা থেঁতলে দিয়েছে। তিন যুবতীই আর্তনাদ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

চন্দ্রকান্ত সুপর্ণকে চিত করে শোয়ালেন। দুটি চোখ বিস্ফারিত। মুখ রক্তে লাল হয়ে আছে। চন্দ্রকান্ত পরীক্ষা করে দেখে আস্তে বললেন, "হি ইজ ডেড। বাট হু ডিড ইট!"

কিংশুক চেঁচিয়ে উঠল, "স্টোনম্যান! স্টোনম্যান!"

রাতুলও শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, "স্টোনম্যান!"

চন্দ্রকান্ত ব্যস্তভাবে বললেন, "তোমরা ধরো। গাড়িতে নিয়ে যাই।"

সেই সময় সামনের টিলা থেকে ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এলেন এক টুরিস্টবেশী বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মুখে সাদা দাড়ি। মাথায় টুপি। গলায় ঝুলন্ত বাইনোকুলার ও ক্যামেরা গম্ভীর স্বরে বললেন, "জাস্ট আ মিনিট।"

## ॥ দুই ॥

চন্দ্রকান্ত আগন্তুককে দেখে ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, "কর্নেল সরকার। আপনি এখানে?"

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার থানের পিছনে ঢালু হয়ে উঠে যাওয়া কতকটা ত্রিভুজাকৃতি টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে একটা পাখি খুঁজছিলেন। সেই সময় ধারিয়া ফল্‌সে দলটি তাঁর চোখে পড়েছিল। চন্দ্রকান্ত রায় তাঁর পুরনো বন্ধু। রাঁচি এলাকায় এলে

তাঁর বাড়িতেই উঠতেন। এবার উঠেছিলেন গালা গবেষণাকেন্দ্রের সরকারি গেস্টহাউসে। অভ্যাসমতো বিকেলে বেড়াতে এসে প্রায় চার কি.মি. পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে নাকবরাবর হেঁটে এই টিলার কাছে আসতেই একটা বিরল প্রজাতির পাখির ডাক শুনতে পেয়েছিলেন। পাখিটির ছবি তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকায় প্রপাতের মাথায় চন্দ্রকান্ত এবং এই যুবকযুবতীদের দিকে তত লক্ষ রাখেননি। একটু পরে চন্দ্রকান্তের গাড়ি আসতে দেখে কর্নেল টিলা থেকে নেমে আসছিলেন। তারপর হঠাৎ আদিবাসীদের থানের দিকে চোখ পড়ে চমকে উঠেছিলেন।

চন্দ্রকান্তের কথার জবাবে কর্নেল বললেন, "হাউ ইট হ্যাপন্‌ড মিঃ রায়?"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "চলুন। যেতে যেতে বলছি। এখনই একে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।"

"হি ইজ স্টোনডেড মিঃ রায়!" কর্নেল সুপর্ণকে পরীক্ষা করে দেখে বললেন। "হাসপাতালে অবশ্য নিয়ে যেতে হবে। তবে পুলিশকে আগে খবর দেওয়া দরকার। বডি এখানেই থাক। পুলিশ এসে নিয়ে যাক। তা না হলে আপনাদের ঝামেলায় পড়ার চান্স আছে। মিঃ রায়! এঁরা থাকুন এখানে। আপনি এখনই গাড়ি নিয়ে থানায় খবর দিন।"

চন্দ্রকান্ত তখনই গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

কিংশুক বলল, "এ নিশ্চয় স্টোনম্যানের কাজ।"

দীপিতা কান্না-জড়ানো গলায় বলল, "কলকাতা থেকে স্টোনম্যান এখানে এসেছে আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট।"

রাতুল কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি মামাবাবুর পরিচিত। কে আপনি জানতে পারি?"

"আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আপনাদের মামাবাবু আমার বন্ধু।"

রোমেনা একটা পাথরে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। দীপিতা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল।

"এমন সাংঘাতিক ঘটনা কীভাবে ঘটল বুঝতে পারছি না!" কিংশুক একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "তবে এটা ঠিক, কলকাতার স্টোনম্যানের সঙ্গে অদ্ভুত মিল দেখছি। এই দেখুন, পাথরটার ওজন অন্তত পনের-কুড়ি কেজির কম নয়।"

কর্নেল একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, "আগে বলুন ইনি কে? তারপর আপনাদের পরিচয় দিন প্লিজ!"

দীপিতা কান্না দমন করে সংক্ষেপে সব কথা বলল। তারা পরস্পর বন্ধু। কলকাতা থেকে তারা গতকাল মামাবাবু চন্দ্রকান্তের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। তারপর ধারিয়া ফল্‌সে এসে চোর পুলিশ বা হাইড অ্যান্ড সিক গেম খেলার থার্ড রাউন্ডে এই সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে।

রাতুল শ্বাস ছেড়ে বলল, "আমার ধারণা আদিবাসী কোনও উইচ আচমকা পেছন থেকে সুপর্ণের মাথায় এই পাথরটা ছুঁড়ে মেরেছে। সুপর্ণ উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। মামাবাবু ওকে চিত করেছেন। তার মানে পা টিপে টিপে এসে কোনও আদিবাসী

ওঝা ওর মাথায় পাথরটা মেরে সেই রক্ত—মাই গড! ওই দেখুন থানের বেদিতে টাটকা রক্ত মাখানো!"

কর্নেল দেখে এসে বললেন, "হ্যাঁ। মার্ডারার রক্ত মাখিয়েছে বটে!" তারপর একটু হাসলেনও। "রাতুলবাবু আর কিংশুকবাবুর হাতেও রক্ত দেখছি। আপনারা সুপর্ণবাবুর বডি তুলতে হাত লাগিয়েছিলেন বোঝা যাচ্ছে!"

কিংশুক বলল, "হোয়াট ডু য়ু মিন বাই দ্যাট!"

রাতুলও বলল, "ইওর রিমার্ক হিন্টস সামথিং অড কর্নেল সরকার!"

"ও নো নো মাইডিয়ার ইয়ং মেন!" কর্নেল বললেন। আপনারা দুজনেই বডি ওঠাতে সাহায্য করেছিলেন, সেটাই বলছি।'

রোমেনা ততক্ষণে একটু শান্ত হয়েছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে ধরা গলায় বলল, "কর্নেল সরকার! আমি যদি ভুল না করি, আপনি কি সেই গোয়েন্দা কর্নেল—দা ফেমাস প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর? আপনার কথা কাগজে পড়েছি।"

কর্নেল জিভ কেটে সাদা দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, "নাহ্। আমি গোয়েন্দা নই। আমি একজন নেচারিস্ট। প্রকৃতিপ্রেমিক মাত্র। প্রকৃতির রহস্যভেদে আমার আগ্রহ আছে। তবে যেহেতু মানুষও প্রকৃতির একটা অংশ, তাই মানুষের মধ্যেও প্রাকৃতিক রহস্য আছে। মাঝে মাঝে সেই রহস্য ভেদ করতে নাক গলাই এই যা।"

রোমেনা বলল, "আমার অনুরোধ কর্নেল সরকার! সুপর্ণকে কেন মরতে হল—"

রাতুল বাধা দিয়ে বলল, "রুমু! তুমি কী বলতে চাও?"

রোমেনা জবাব দিল না। কিংশুক বলল, "মাথা খারাপ কোরো না কেউ। ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো।"

বিনীতা বলল, "রাতুলদা! তুমিই চোর-পুলিশ খেলার প্রোপোজ্যাল দিয়েছিলে। না—না। আমি খারাপ কিছু মিন করছি না। বলতে চাইছি, এই খেলাই সুপুদার মৃত্যুর কারণ।"

রাতুল খাপ্পা হয়ে বলল, "আমি কেমন করে জানব, কে সুপুকে মার্ডার করবে? আমিও চোর হয়েছিলুম। আমাকেও তো মার্ডার করতে পারত মার্ডারার। পারেনি। কারণ আমি এত দূরে থানের কাছে লুকোতে অসিনি।"

রোমেনা বলল, "কর্নেল সরকার! মার্ডার কেসে প্রত্যেককে সন্দেহ করার নিয়ম। য়ু আস্ক কোয়েশ্চনস টু এভরিবডি!"

কর্নেল আস্তে বললেন, "পুলিশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত মিস রোমেনা—"

"রোমেনা চৌধুরি!"

"থ্যাংকস! তো আপাতত একটা প্রশ্ন শুধু করতে চাই। একে একে বলুন। আগে বলুন কিংশুকবাবু! আপনিও চোর হয়েছিলেন। এত দূর পর্যন্ত লুকোতে এসেছিলেন কি?"

কিংশুক বলল, "নাহ্।"

"রাতুলবাবু?"

"নাহ্।"

'কিংশুকবাবু পুলিশ হওয়ার সময় কি এর কাছাকাছি এসেছিলেন?"

"নাহ্।"

'রাতুলবাবু, আপনি?"

"নাহ্।"

'দীপিতা?"

"না।"

"বিনীতা?"

"না।"

"রোমেনা?"

রোমেনা একটু চুপ করে থেকে বলল, "যে পর্যন্ত এসেছিলুম, সেখান থেকে ়ই থানটা দেখা যায়।"

"থানের কথা বলেছিলেন কাউকে?"

রোমেনা আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, "মনে পড়ছে না। তবে আসার ়থে মামাবাবু এই থানটার কথা বলেছিলেন।"

দীপিতা বলল, "হ্যাঁ। বলেছিলেন।"

রাতুল বলল, "আমি শুনিনি। খেয়াল করিনি।"

কিংশুক বলল, "কী জানি! আমি সুপর্ণের সঙ্গে ফিল্ম নিয়ে আলোচনা করছিলুম। ়কু ম্যুভি তোলার নেশা আছে আমার।"

বিনীতা বলল, "আমি মামাবাবুর কথা শুনিনি। ফিল্ম নিয়ে ওদের আলোচনা শুনছিলুম। ়বে আমি জানতুম, ফল্সের এদিকে আদিবাসীদের থান আছে। জেলা গেজেটিয়ারে ়ড়েছি, মাঝে মাঝে নাকি নরবলি দেওয়া হত এক সময়।"

"আপনি কি ছাত্রী এখনও?"

"হ্যাঁ। অ্যানথ্রোপলজির ছাত্রী।"

'দীপিতা কি ছাত্রী?"

দীপিতা বলল, "নাহ্। আপনি স্বচ্ছন্দে আমাদের তুমি বলতে পারেন।"

কিংশুক বলল, "অবশ্যই পারেন।"

রাতুল সিগারেট ধরাল। বলল, "আমিও আপত্তি করব না। কিন্তু এখানে থাকতে আমার অসহ্য লাগছে। আমি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।"

সে চলে গেল রাস্তার দিকে। কিংশুক বলল, "অসহ্য আমারও লাগছে। বাট আই মাস্ট ফেস ইট!"

রোমেনা বলল, "হ্যাঁ—এটা একটা চ্যালেঞ্জ।"

দীপিতা কেঁদে উঠল। "কিন্তু আমি পারছি না। গা ঘুলোচ্ছে।" বলে সে রাতুলের মতো চলে গেল রাস্তার দিকে।

বিনীতা কান্না চেপে বলল, "ইটস আ রিচুয়াল কিলিং। নৃবিজ্ঞানে এমন অনেক

কেস স্টাডি করেছি। আদিবাসীদের মধ্যে এই কাস্টম আছে কোথাও-কোথাও! আমার ধারণা, রাতুলদা ইজ কারেক্ট। ওদের কোনও ওঝা এখানে ওত পেতেছিল।”

রোমেনা বলল, “অ্যাবসার্ড! এই পাথরটা মেয়েরাও আচমকা কারও মাথায় এই টিলার ওপর থেকে ফেললে যত শক্তিমান লোক হোক, মারা পড়তে পারে। আমাদের যে-কেউই এটা করতে পারে।”

কিংশুক হাসবার চেষ্টা করে বলল, “হোয়াটস দা মোটিভ? ভুলে যেও না, সব কিলিংয়ের একটা মোটিভ থাকে।”

রোমেনা গলার ভেতর বলল, “মোটিভ একটা থাকা কি অসম্ভব?”

“কী মোটিভ?”

“কিংশুকদা, আই মাস্ট বি ফ্র্যাংক নাও।” রোমেনা শক্ত মুখে বলল। “আমাদের মধ্যে পরস্পরের একটা এমোশন্যাল সম্পর্ক আছে। আমিও ও সুপর্ণ, রাতুল ও দীপিতা, তুমি ও বিনীতা—”

বিনীতা বলে উঠল বিকৃত স্বরে, “স্টপ ইট! অল দ্য ন্যাস্টি থিংস!”

সে হন হন করে চলে গেল রাস্তার দিকে। কিংশুক আস্তে বলল, “য়ু আর ম্যাড রুমু!”

রোমেনা বলল, “নাহ্। আমার মাথা খারাপ হয়নি। একটু আগে তুমি বলছিলে, আই মাস্ট ফেস ইট। নাও ফেস ইট কিংশুকদা! এমোশন্যাল সম্পর্ক কখনও এক জায়গায় থাকে না। এমন তো হতেই পারে আমি ও রাতুল, সুপর্ণ ও দীপিতা, রাতুল ও বিনীতা, তুমি ও দীপিতা—এভাবে এমোশনের চাকা ঘুরপাক খেতে খেতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রু হয়ে উঠতে পারি? পারি না?”

কিংশুক জবাব দিল না। রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। বললেন, “রোমেনা, তুমি এক্সেপশন্যালি ইনটেলিজেন্ট। আই এগ্রি উইদ ইওর পয়েন্ট। দা হুইল অব লাভ। পরশুরাম—রাজশেখর বসুর গল্পটা আশা করি পড়েছ। সেটা এক হাসির গল্প অবশ্য। কিন্তু—হ্যাঁ ডার্লিং, দিস ইজ আ পসিবিলিটি।”

কিংশুক কর্নেলের দিকে তাকাল।

কর্নেল তাকে বললেন, “রোমেনার বক্তব্য সম্পর্কে তোমার কী মত কিংশুক?”

“অ্যাবসার্ড। শি ইজ ম্যাড। এটা কোনও আদিবাসী স্টোনম্যানের কাজ। রিচুয়্যাল কিলিং।”

কর্নেল হাসলেন। “জানো? কলকাতার স্টোনম্যান সম্পর্কে আমার মত জানতে চাওয়া হয়েছিল। আমি বলেছি, রিচুয়্যাল কিলিংস। হত্যাকারীকে সম্ভবত কোনও তান্ত্রিক বলেছে, অন্তত তেরোটি নরহত্যা করতে পারলে মনোবাসনা পূর্ণ হবে। কিন্তু হত্যা তো সহজ কাজ নয়। সবার পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু একটা পদ্ধতিতে সহজে সম্ভব। ফুটপাতে ঘুমন্ত কোনও নিরীহ লোককে হত্যা করলে তদন্ত এগোবে না। কারণ সে তো ভবঘুরে, অজ্ঞাত পরিচয় কোনও ভিখারি-ভিখারিণী, পঙ্গু কিংবা রুগ্‌ণ লোক।

ধারালো অস্ত্র—ধরা যাক, ভোজালির এক কোপে হত্যা করা সম্ভব না হতেও পারে। সে ক্ষেত্রে ভারি পাথর খুব সহজ মার্ডার উইপন। আমি এ-ও বলেছি, হত্যাকারী স্টোনম্যানের নিশ্চয় গাড়ি আছে।"

রোমেনা বলল, "বুঝেছি। এক্সট্রিমলি রিচুয়্যাল কিলিংস। নিরাপদে নরহত্যা।"

"এ ক্ষেত্রেও স্টোনম্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে, আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে।"

কিংশুক বলল, "আপনার এই ডার্লিং বলাটা অদ্ভুত!"

রোমেনা বলল, "কাগজে পড়েছি উনি ম্যান-উওম্যান নির্বিশেষে যাকে স্নেহ করেন, তাকে ডার্লিং বলেন।"

"তুমি—" কিংশুক একটু অবাক হয়ে বলল, "য়ু আর সো কোল্ড রুমু! তুমি এত শিগগির সামলে উঠেছ!"

"কী বলতে চাও?"

কিংশুক হঠাৎ ফেটে পড়ল। "আমার ধারণা, তুমিই সুপুকে মার্ডার করিয়েছ।" বলেই সে হন হন করে রাস্তার দিকে চলে গেল।

রোমেনা রুষ্ট চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

কর্নেল ডাকলেন, "রোমেনা!"

রোমেনা কেঁদে ফেলল। বিকৃতস্বরে বলল, "উই আর অল ম্যাড, কর্নেল সরকার। আমরা শিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। আমরা কী বলছি, কী করছি, আমরা নিজেরাই জানি না। রিয়েল-আনরিয়েল ঘুলিয়ে গেছে আমাদের কাছে।"

"ফরগেট ইট, ডার্লিং!" বলে কর্নেল সুপর্ণের ডেডবডির কাছে গেলেন। একটু পিছিয়ে এলেন আবার। বললেন, "আবার প্রশ্নটা করছি। রাতুল চোর-পুলিশ খেলার প্রোপোজাল দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমিই প্রথমে লুকিয়ে থেকে হারিয়ে যাওয়ার ভান করেছিলুম।" রোমেনা আস্তে বলল, "আসলে আমি সুপর্ণের রিঅ্যাকশন দেখতে চেয়েছিলুম।"

"কী রিঅ্যাকশন দেখেছিলে?"

"নাথিং! ও নির্বিকার ছিল।" রোমেনা একটু থেমে আবার বলল, "এখানে গতকাল আসার পর সুপর্ণের মুডে কেমন একটা চেঞ্জ লক্ষ করেছিলুম। গতরাতে লনে আড্ডা দেওয়ার সময় ওকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। একবার হঠাৎ উঠে চলে গেল গাছপালার আড়ালে। জোৎস্নার মধ্যে একবার—"

রোমেনা থেমে গেল। কর্নেল বললেন, "ফ্র্যাংকলি বলো রোমেনা!"

"মনে হল—আমার ভুল হতেও পারে—ওর সঙ্গে সম্ভবত দীপুকে দেখেছিলাম।"

"দীপিতাকে?"

"হ্যাঁ। দীপুও উঠে গেল, বলল, আসছি। কিন্তু সে বাড়ির দিকেই গিয়েছিল। তারপর অন্য পথে—জানি না কর্নেল! আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না এমন কিছু কী ভাবে সম্ভব? সুপর্ণ জানত, দীপুর কিংশুকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।" রোমেনা রুমালে চোখ মুছে বলল, "আজ সারা দিন সুপর্ণকে অন্যমনস্ক দেখেছি।"

কর্নেল থানটার চারপাশ ঘুরে এলেন। তারপর বাইনোকুলারে চারদিক খুঁটিয়ে দেখলেন। বললেন, "এখানে সুপর্ণকে খুঁজতে আসার কথা কে প্রথম বলল?"

"প্রথম বিনীতা বলল রাস্তায় ওকে পেয়ে যাব। পরে মামাবাবু বললেন—"

"চন্দ্রকান্ত রায় কি তোমার আত্মীয়?"

"নাহ্। উনি দীপিতা-বিনীতার মামা। রাতুলেরও দূর সম্পর্কের মামা।"

"এখানে বেড়াতে আসার প্রপোজাল কার?"

"ধারিয়া ফল্‌সে? দীপিতার।"

"রাঁচি আসার প্রোপোজ্যাল?"

"রাতুলের।"

"রাতুল কী করে?"

"স্মলস্কেল ইন্ডাস্ট্রি। ওর একটা ছোট কারখানা আছে।"

রাস্তায় জিপের হর্ন শোনা গেল। পুলিশের গাড়ি এসে গেছে। চন্দ্রকান্তের গাড়ি পেছনে একটা অ্যাম্বুল্যান্স। পুলিশ অফিসার এবং কনস্টেবলরা আগে দৌড়ে এল। পুলিশ ইন্সপেক্টর হরিশ পাণ্ডে কর্নেলকে দেখে বললেন, "হাই ওল্ড বস! যেখানে আপনি, সেখানেই ডেডবডি—দ্যাট ইজ দা প্রোভার্ব।"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "আই কান্ট হেল্‌প ইট মিঃ পাণ্ডে! হয়তো এটা আমার নিয়তি।..."

## ॥ তিন ॥

যে-কোনও খুনের ঘটনায় পুলিশের কিছু ধরাবাঁধা ছক আছে, যেগুলি আইনের সূত্র ধরে তৈরি। পুলিশ দলটির সঙ্গে একজন ডাক্তার এবং একজন ফোটোগ্রাফার ছিলেন। ডাক্তার বাঙালি। রণধীর অধিকারী নাম। সুপর্ণের বডি পরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করলেন তিনি। ফোটোগ্রাফার সুরেন্দ্র সিং নানা অ্যাংগলে কয়েকটি ছবি তুললেন ক্যামেরায়। সেই ফাঁকে কর্নেলও ছবি তুললেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর হরিশ পাণ্ডে চটপটে মানুষ। বেলা পড়ে এসেছিল। অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে দুজন ডোম এসেছিল। তাদের বডি উঠিয়ে নিয়ে যেতে হুকুম দিলেন। বললেন, "বডি রেখে এসে এই পাথরটাও নিয়ে যাও।"

চন্দ্রকান্ত, রাতুল, কিংশুক, দীপিতা, বিনীতা পুলিশের সঙ্গে রাস্তা থেকে আবার ঘটনাস্থলে এসেছিল। হরিশ পাণ্ডে পুলিশি হাসি হেসে বললেন, "রায়সায়েব! এঁদের স্টেটমেন্ট নিতে হবে। সেটা এখানে সম্ভব নয়। থানায় যেতে হবে।"

চন্দ্রকান্ত গম্ভীর মুখে বললেন, "হ্যাঁ। চলো সব! কর্নেল সরকার! আপনি কি আমাদের গাড়িতে আসবেন?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "জায়গা হবে না মিঃ রায়। আমি একা দুজনের জায়গা নেব।"

মিঃ পাণ্ডে বললেন, "কর্নেল সরকার আমার জিপে যাবেন। আপনারা চলুন।"

"থ্যাংক্‌স্ মিঃ পাণ্ডে!" কর্নেল বললেন। "ধারিয়া ফল্‌সের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত না দেখে আমি যাচ্ছি না। আপনারা চলুন!"

রোমেনা বলল, "আমি কর্নেল সায়েবের সঙ্গে গেলে আপত্তি আছে মিঃ পাণ্ডে?"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "তোমার থাকার কি কোনও বিশেষ কারণ আছে রুমু?"

"কর্নেল সায়েবের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

চন্দ্রকান্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "কথা পরে বললেও চলবে। থানায় যাওয়াটা আগে দরকার।"

রাতুল বলল, "শি ইজ ম্যাড।"

"শাট আপ!" রোমেনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

দীপিতা এসে ওর হাত ধরল। "প্লিজ রুমু! মাথা ঠাণ্ডা রাখো! সিন ক্রিয়েট করো না!"

মিঃ পাণ্ডে বাঁকা হেসে বললেন, "আপনারা সবাই আন্ডার সাসপিসন। চলুন! রায়সায়েব! প্লিজ, এঁদের বুঝিয়ে দিন আইনত আমাকে যা করার করতেই হবে।"

চন্দ্রকান্ত তাড়া দিলেন, "চলো সব।"

রোমেনা গোঁ ধরে বলল, "আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলুন তা হলে—বাই ফোর্স। কিন্তু আমি বলছি, থানায় নিশ্চয় যাব। যা বলার বলব। এখন কর্নেল সায়েবের সঙ্গে আগে কিছু কথা বলা আমার খুব দরকার। প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, মিঃ পাণ্ডে!"

কর্নেলের দিকে তাকালেন হরিশ পাণ্ডে। কর্নেল আস্তে বললেন, "আমি রোমেনার সিওরিটি, মিঃ পাণ্ডে। আমি ওকে থানায় নিয়ে যাব। যদি আমার ওপর আপনার আস্থা থাকে—"

মিঃ পাণ্ডে হাসলেন। "দ্যাটস ওক্কে কর্নেল সরকার!"

কিংশুক রোমেনাকে কিছু বলবে বলে ঠোঁট ফাঁক করেছিল। বলল না। হন হন করে এগিয়ে গেল। ডোম দুজন ফিরে এসে মিঃ পাণ্ডের কথামতো রক্তমাখা পাথরটা নিয়ে গেল। পাথরটা কুড়ি কেজি হওয়াও আশ্চর্য নয়, কর্নেলের মনে হল। একটু পরে গাড়িগুলো চলে যাওয়ার পর আসন্ন সন্ধ্যার বনভূমিতে শুধু বাতাসের শব্দ। পাখিদের চ্যাঁচামেচি কমে যাচ্ছিল। কর্নেল বেদির একটা পাশে ঘাসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে ঘাস সরালেন। তারপর আরও দু পা এগিয়ে গেলেন। রোমেনা কাছে গিয়ে বলল, "কী দেখছেন?"

কর্নেল একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "বরাবর দেখে আসছি, বিশেষ করে আজকাল পুলিশ রুটিন ওয়ার্কসের বাইরে কিছু করে না। আসলে খুনোখুনি প্রচণ্ড বেড়ে যাচ্ছে। তাই একটা খুনের পেছনে বেশি সময় দেওয়ার সুযোগও পুলিশের কম।"

রোমেনা ঝাঁঝালো গলায় বললো, "আপনি কী দেখলেন অমন করে?"

"স্টোনম্যানের পায়ের রক্তের ছাপ।"

রোমেনা তাকিয়ে রইল।

শেষ রোদের লালচে ছটা ক্রমে ফিকে হতে হতে ধূসর হচ্ছে। কর্নেল আবার দু পা এগিয়ে পায়ের জুতোয় ঘাস সরিয়ে বললেন, "এই পথে স্টোনম্যান ফিরে গেছে।"

আরও খানিকটা এগিয়ে ছোট্ট একটা ডোবা। কিছু জল জমে আছে। রোমেনার চোখে পড়ল, জলের ধারে বালিতে জুতোর খুব আবছা ছাপ। কর্নেল জুতোর ছাপের

কাছে গিয়ে বললেন, "সাবধানী স্টোনম্যান এখানে রক্ত ধুয়েছে জুতোর। ছাপটা দে
মনে হচ্ছে, সে একজন বেঁটে মানুষ।"

দুটো উঁচু পাথরের মাঝখান দিয়ে কিছুটা এগিয়ে ঢালু ঘাসের জমি। জমিটার নিচে ধারিয়া ফল্সের ওপরের অংশ। রোমেনা বিস্ময়ে বলে উঠল, "এটা শর্টকাট দেখছি!"

"হ্যাঁ। সুপর্ণ এই শর্টকাটে এসে লুকিয়ে ছিল থানের কাছে। জানি না স্টোনম্যান শর্টকাট করে একই পথে এসেছিল, নাকি টিলা বেয়ে নেমেছিল।"

রোমেনা চমকে উঠল। "কিন্তু ফল্সের মাথায় আমরা ছিলুম! দেখতে পেতুম তাকে।"

"তখন ছিলে না। তোমার বর্ণনা অনুসারে সবাই ব্যস্তভাবে সুপর্ণকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলে।"

"মামাবাবু ছিলেন!"

"মিঃ রায় সম্ভবত অন্য দিকে ঘুরে বসেছিলেন। তাই দেখতে পাননি স্টোনম্যানকে।"

কর্নেল ফল্সের মাথায় গিয়ে দাঁড়ালেন। রোমেনা একটু ইতস্তত করে বলল, "আমার কিছু কথা বলার ছিল!"

"হুঁ, তুমি বলছিলে বটে। এবার বলতে পারো!" কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরালেন।

রোমেনা চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "এখানে আমার কেন কে জানে অস্বস্তি হচ্ছে। বরং চলুন, রাস্তায় যেতে যেতে বলব।"

কর্নেল হাসলেন। "পাঁচ মাইল রাস্তা। তোমার হাঁটার অভ্যাস নেই। শর্টকাটে দু মাইল নাক বরাবর। কিন্তু চড়াই ভাঙতে হবে। জঙ্গল আর পাথর প্রচুর।"

রোমেনা একটু ভেবে নিয়ে ধরা গলায় বলল, "আজ আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারব। আমার জীবন শূন্য হয়ে গেছে কর্নেল!"

"বুঝতে পারছি।" বলে হঠাৎ কর্নেল এগিয়ে গেলেন সেই পাথরে ফাঁকে ঝোপটার দিকে, যেখানে রোমেনা লুকিয়ে ছিল এবং ঝোপটায় সাদা ফুলের ঝাঁক।

রোমেনা দেখল, কর্নেল পিঠের কিটব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট স্টিক বের করলেন। স্টিকটা টেনে বড় করলেন। তারপর স্টিকের ডগায় একটা সূক্ষ্ম সবুজ রঙের জাল ছাতার মতো ছড়িয়ে গেল। ঝোপের ফুলে একটা প্রজাপতি অবেলায় ছটফট করে উড়ছিল। সেটা জালে আটকানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধূর্ত প্রজাপতিটা পালিয়ে গেল। জালটা গুটিয়ে স্টিকটা ছোট করে পিঠের কিটব্যাগে ভরে কর্নেল বললেন, "এস!"

দুজনে একটা খাত ধরে এগিয়ে একটা ঢালু টিলায় উঠলেন। রোমেনা টিলার মাথায় ওঠার পর থমকে দাঁড়াল। টিলার মাথায় এখনও দিনের আলো আছে। সে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, "আপনি দা হুইল অব লাভের কথা বলছিলেন!"

কর্নেল বাইনোকুলারে দূরে কিছু দেখতে দেখতে বললেন, 'হুঁ।"

"কিংশুক সুপর্ণকে ফল্সের পাশ দিয়ে নিচে নামার জন্য মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাডভেঞ্চারে ডাকছিল। সুপর্ণ গেল না। কিন্তু আমার কানে কিংশুকের ওই কথাটা ধাক্কা দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, সে সুপর্ণকে হয়তো—"

রোমেনা থেমে গেলে কর্নেল বললেন, "বুঝেছি।"

রোমেনা মুখ নিচু করে আস্তে বলল, "তারপর হাইড অ্যান্ড সিক গেমের সময় একটা ঝোপের আড়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ে হঠাৎ রাতুল আমাকে—আমাকে কিস করল।

ামি বাধা দেওয়ার সুযোগ পেলাম না। কিংশুক হয়তো ব্যাপারটা দেখেছিল। কিংশুক তুলের ওপর প্রচণ্ড ঈর্ষায় তাকে সুপর্ণের মার্ডারের জন্য যেন দায়ী করতে চায় ন হচ্ছিল।" রোমেনা বিহ্বলতার মধ্যে বলতে থাকল, "কিংশুকের সঙ্গে দীপিতার প্রম আছে। দীপিতা গতরাতে সুপর্ণের সঙ্গে লনের গাছপালার ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল ক্ষ্য করেছি। কিংশুক তাই সুপর্ণকে মেরে রাতুলের কাঁধে দায় চাপাতে চায়।"

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, "তোমার থিওরিতে—আমাকে ক্ষমা করো ডার্লিং, ফমিনিন লজিক কাজ করছে। তুমি হয়তো কেসটাকে জটিল করে ফেলছ।"

রোমেনা হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আপনি যা-ই বলুন, সুপর্ণকে রাতুল মেরেছে। লকাতার স্টোনম্যানের মোডাস অপারেন্ডি অনুসারে কাজটা সেই-ই করছে।"

আবার ঢাল বেয়ে নেমে জঙ্গলে আদিবাসীদের পায়ে চলা একফালি পথে পৌঁছুলেন র্নেল। তারপর বললেন, "সুপর্ণ এবং তোমার মধ্যে গভীর এমোশনাল সম্পর্ক ছিল। থচ তোমরা বিয়ে করোনি কেন?"

"সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারছিলুম না।" রোমেনা একটু চুপ করে থাকার পর ফের লল, "সুপর্ণও পারছিল না। তবে আমার বাবা-মা সুপর্ণকে পছন্দ করতেন না। পর্ণ তা জানত।"

"সুপর্ণের বাবা-মা?"

"ওর বাবা-মা বেঁচে নেই। দাদা-বউদির সঙ্গে থাকত।"

"কিংশুকের বাবা-মাকে চেনো?"

রোমেনা ঝাঁঝালো স্বরে বলল, "কিংশুকের বাবা ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের কারবার াছে। একবার ওঁদের বাড়িতে রেভেনিউ ইনটেলিজেন্স থেকে রেড হয়েছিল। কালো াকার যখ। জেল খাটতে হত। আমার বাবা তখন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। াচিয়ে দেন। লোকটার অডাসিটি! আমার সঙ্গে কিংশুকের বিয়ের প্রোপোজাল দিয়েছিল। াবা রাজি হয়নি।"

"ক্ষমা করো এ প্রশ্নের জন্য। কিংশুক কি তোমার সঙ্গে—"

রোমেনা দ্রুত বলল, "হি ইজ আ লোফার! আমাকে অ্যাপ্রোচ করেছিল। আই হট হিম!"

"তবু তুমি কিংশুক যে দলে আসছে, সেই দলে এসেছ?"

"সুপর্ণের এবং দীপিতার টানে।" রোমেনা হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল। "আপনাকে লা হয়নি, কিংশুকের সঙ্গে দীপিতার বিয়ের কথা হয়েছে। দীপিতার বাবা স্কুলটিচার। প্রোপোজাল পেয়ে বর্তে গেছেন।"

"কিংশুক ও দীপিতার মধ্যে এমোশনাল সম্পর্ক আছে?"

একটু পরে রোমেনা বলল, "আছে—মানে ছিল। এখানে এসে লক্ষ্য করেছি, কিংশুক ওর ছোট বোন বিনীতার সঙ্গে ভাব জমাতে চাইছে। এদিকে দীপিতা সুপর্ণের ঙ্গে—গতরাতের কথা তো বলেছি আপনাকে।"

এতক্ষণে টর্চ জ্বালাতে হল। আবার একটা চড়াই। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার াটতে কষ্ট হচ্ছে না তো?"

রোমেনা বলল, "নাহ্।"

কুড়ি মিনিট চড়াই ভেঙে উৎরাই শুরু হল। উৎরাইয়ের শেষে পিচের রাস্তা। কিছু দোকানপাট। সেখানে একটা সাইকেলরিকশো নিলেন কর্নেল। ল্যাক রিসার্চ সেন্টারের গেস্টহাউসে পৌঁছে বললেন, "কফি খেয়ে একটু বিশ্রাম করা যাক। তারপর তোমাকে থানায় পৌঁছে দেব।"

রোমেনা লনে হাঁটতে হাঁটতে দ্বিধাজড়ানো গলায় বলল, "থানায় যেতেই হবে আমাকে ?"

"হ্যাঁ ডার্লিং! তোমার স্টেটমেন্ট পুলিশ নেবে। আমি কথা দিয়েছি।"

রোমেনা আস্তে বলল, "আমি স্ট্রেটকাট বলব, কিংশুক মার্ডার করেছে সুপর্ণকে।"

"কিন্তু তুমি দেখনি!"

"দেখিনি—বাট আই সাসপেক্ট, হি ইজ দা কিলার।"

"না রোমেনা। যা যা ঘটেছে—মানে যা-যা দেখেছ, তা-ই বলবে পুলিশকে। তোমার কী ধারণা বা সন্দেহ, তা বলবে না। তাতে পুলিশ বিভ্রান্ত হবে।"

রোমেলা চুপ করে থাকল।

গেস্টহাউসের দোতলায় নিজের রুমে ঢুকে কর্নেল কিটব্যাগ, ক্যামেরা ও বাইনোকুলার রাখলেন। বোতাম টিপে বেয়ারাকে ডেকে ক্যান্টিন থেকে কফি আর কিছু স্ন্যাক্স আনতে বললেন। তারপর রোমেনাকে বললেন, "বাথরুমে যাও। মুখে-হাতে জল দিয়ে এস। পা ধুয়ে ফেলো ক্লান্তি চলে যাবে।"

রোমেনা বাধ্য মেয়ের মতো কথা শুনল। তাকে এবার একটু ফ্রেশ দেখাচ্ছিল। কফি আর স্ন্যাক্স দিয়ে গেল বেয়ারা। কর্নেল বললেন, "কফি নার্ভকে চাঙ্গা করে। কফি খেয়ে নাও।"

কফি খেতে খেতে রোমেনা বলল, "আমার ধারণা, কিংশুককে আপনি মার্ডারার বলে সন্দেহ করছেন না।"

কর্নেল একটু হেসে সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "নাহ্। করছি না।"

"কেন ?"

"প্রথম কারণ, ওই পাথর তুলে এক ঘায়ে সুপর্ণের মতো শক্তিমান যুবককে মেরে ফেলার জন্য যা শারীরিক ক্ষমতা দরকার, তা রোগা কিংশুকের নেই। দ্বিতীয় কারণ, সে ফিল্ম অনুরাগী। ডকু ম্যুভি-মেকার। কাজেই আর্টিস্ট। কোনও আর্টিস্ট যত এমোশনাল হোক, সে খুনের ব্যাপারে রিস্ক নিতে চাইবে না। ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তৃতীয় এবং ভাইটাল কারণ, তার খুনের মোটিভ অত্যন্ত অস্পষ্ট। শুধু তাই নয়, যথেষ্ট জোরালো নয়। ডার্লিং! নরহত্যা—অন্তত এই বিশেষ ক্ষেত্রে একটা দুঃসাহসী কাজ।"

রোমেনা মুখ নামিয়ে কফিতে চুমুক দিল। তারপর আস্তে বলল, "তা হলে রাতুল ফিট করে যায় আপনার থিওরির সঙ্গে। হি কিস্‌ড্ মি সাড্‌নলি। আই ওয়াজ সো মাচ শক্‌ড, আই কুড্‌ন্‌ট রেসিস্ট হিম। আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। বাধা দিতে পারিনি। ভীষণ—ভীষণ লজ্জা আর অবাক—" সে থেমে গেল। মুখ লাল হয়ে উঠল। নাসারন্ধ্র স্ফীত হল রোমেনার।

কর্নেল প্রায় অট্টহাসি হাসলেন। "নাহ্ রোমেনা! রাতুল তোমাকে পেতে চাইলে সুপর্ণকে তার খুন করার দরকার হবে কেন? তুমি তার এমোশানাল অ্যাটাচমেন্টে বাধা দাওনি। চুপ করে ছিলে। সে এ থেকে ভেবেছে, তোমার সম্মতি আছে। কাজেই সে যত দুঃসাহসী বা গোঁয়ার হোক, কিংবা সুপর্ণকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করুক, তাকে তার খুন করার প্রয়োজন হবে কেন?"

রোমেনা ভাঙা গলায় বলল, "তা হলে কে মারল সুপর্ণকে?"

"আমি ঘটনাস্থল দেখে এবং তোমার মুখে শুনে জাস্ট একটা থিওরি গড়ে তুলেছি—সেটা আপাতত মোডাস অপারেন্ডি সংক্রান্ত। খুনীর চেহারা এখনও তাতে অস্পষ্ট। আমাকে স্ট্রং মোটিভ খুঁজে বার করতে হবে আগে।" কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "সাইকিক খুনীদের প্রশ্ন এখানে উঠছে না। কারণ এই এলাকায় তেমন কোনও খুনখারাপি ঘটেনি। খুনের প্রধানত দুটো উদ্দেশ্য থাকে : ব্যক্তিগত লাভ এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ। আরেক ধরনের খুন আছে। দৈবাৎ আঘাতে মৃত্যু। ধরো, তুমি রাগের বশে কাউকে আঘাত করলে। সে মারা পড়ল। একে বলে ম্যানস্লটার। আবার এমনও হতে পারে, তোমার একটা অসতর্ক কাজের ফলে কেউ মারা পড়ল।"

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। "চলো, থানায় ওঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।"

সাইকেলরিকশোয় থানার দিকে যেতে-যেতে রোমেনা বলল, "আমাদের সবাইকে পুলিশ অ্যারেস্ট করবে তাই না?"

কর্নেল বললেন, "দ্যাট ডিপেন্ডস। পুলিশ নিজের পদ্ধতিতে কাজ করে।"

"মামাবাবুকেও কি অ্যারেস্ট করবে?"

"পুলিশের ইচ্ছা। তবে উনি এলাকার প্রভাবশালী মানুষ।" কর্নেল রোমেনার দিকে ঘুরলেন। "কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছ?"

রোমেনা আস্তে বলল, "এমনি।"

"ওঁর সঙ্গে তোমার আগে পরিচয় ছিল?"

"নাহ্। এই প্রথম দীপিতার সঙ্গে এসে পরিচয় হল। জলি মানুষ। শিগগির আপন করে নিতে পারেন। তা ছাড়া মডার্ন মাইন্ডেড।"

"হ্যাঁ, চন্দ্রকান্ত রায় চমৎকার মানুষ। এক সময় নামকরা শিকারি ছিলেন। বাই দা বাই, সুপর্ণের সঙ্গে ওঁর পরিচয় ছিল?"

"নাহ্। থাকলে আমি জানতে পারতুম।"

থানায় পৌঁছুলে পুলিশ ইন্সপেক্টার হরিশ পাণ্ডে সহাস্যে বললেন, "সরি কর্নেল সরকার! আপনি এ কেসে কোনও রহস্য খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হবেন। আই বি থেকে ইনফরমেশন আছে, ধারিয়া এলাকায় আদিবাসীরা আউটসাইডারদের বরদাস্ত করছে না। বিশেষ করে ওদের সম্প্রতি একটা গোপন মিটিং হয়েছে। ধারিয়া ফল্সের কাছে ওদের দেবতার থানে কোনও নন-ট্রাইবালকে পেলেই ওরা বলি দেবে। অফ কোর্স, মিস চৌধুরী এবং আপনার স্টেটমেন্ট ফরম্যালি নেব। মিস চৌধুরী, চলুন। পাশের

ঘরে গিয়ে স্টেটমেন্ট দেবেন। তারপর আপনারা ফ্রি। তবে দরকার হলেই আমরা ডাকব। আপনাদের আসতে হবে।”...

## ।। চার ।।

কর্নেল তাঁর সংক্ষিপ্ত স্টেটমেন্টে সই করে বললেন, “তা হলে আদিবাসী গ্রামগুলোতে আপনারা ধরপাকড় শুরু করবেন মিঃ পাণ্ডে?”

পাণ্ডে বললেন, “নিশ্চয়। আমরা ওদের সমিতির চাঁইগুলোকে আজ রাতেই ধরে ফেলব। তারপর থার্ড ডিগ্রিতে চড়ালে সব কথা বেরিয়ে আসবে।”

“প্লিজ মিঃ পাণ্ডে!” কর্নেল বললেন, “অন্তত একটা দিন আমাকে সময় দিন। তারপর আপনারা নিজের পথে চলবেন।”

পাণ্ডে হাসলেন। “আপনি রহস্যভেদী মানুষ। সর্বত্র রহস্য খুঁজে পান। আশা করি, কোনও ক্লু খুঁজে পেয়েছেন?”

“হয়তো পেয়েছি, কিংবা পাইনি। আমাকে সিওর হতে দিন মিঃ পাণ্ডে। আগামীকাল সূর্যাস্ত পর্যন্ত।”

“কিন্তু ততক্ষণে অপরাধীরা গা ঢাকা দেবে।” পাণ্ডে গোঁফে তা দিয়ে বললেন ফের, “কর্নেল! এটা আদিবাসীদের রিচুয়্যাল কিলিং। থানার রেকর্ডে আছে, একসময় এভাবে ওরা ননট্রাইবালদের বলি দিত দেবতার থানে।”

“মিঃ পাণ্ডে!” হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। “পাথরটা একবার আমি দেখতে চাই।”

পাণ্ডে উঠলেন। একটু হেসে বললেন, “তখন তো দেখেছেন!”

“দেখেছি বলেই আবার দেখতে চাইছি। আপনি দেবতার বলি কথাটা বলায় আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল।”

মহাফেজখানার ভেতর একটা টুলে পাথরটা রাখা ছিল। কর্নেল পকেট থেকে আতস কাচ বের করে পাথরে ওপর কী সব খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। পাণ্ডে বললেন, “ওজন করা হয়েছে। কত ওজন জানেন? প্রায় তেইশ কিলোগ্রাম।”

কর্নেল সাবধানে পাথরটার তলা কাত করে দেখেই বললেন, ‘মাই গুডনেস!”

“কী ব্যাপার?”

“এটা বীভৎস একটা মূর্তির মাথা।”

পাণ্ডে হাসতে লাগলেন। “হ্যাঁ—স্টোনম্যান বলা চলে তা হলে তাই না?”

“বলা চলে মিঃ পাণ্ডে!” কর্নেল বেরিয়ে এলেন। ফের বললেন, “আগামীকাল সূর্যাস্তের মধ্যে আমি এ রহস্য জেনে ফেলব মিঃ পাণ্ডে! আই প্রমিজ।”

চন্দ্রকান্ত ওদের নিয়ে লনে অপেক্ষা করছিলেন। কর্নেলকে দেখে বললেন, “মিঃ পাণ্ডে ইজ রাইট, কর্নেল সায়েব! ব্যাপারটা আমিও জানি। এ শহরের সবাই জানে। তবে শিকারি জীবনে এলাকার আদিবাসীদের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, সে তো আপনিও জানেন। তাই আমি এদের ধারিয়া ফল্‌সে নিয়ে গিয়েছিলাম।”

কিংশুক বলল, "তাই আমার সন্দেহ হচ্ছিল, ফল্‌সে কোন ট্যুরিস্ট নেই কেন? এলাকার সব ফল্‌সে লোকেদের ভিড় হয়। ধারিয়া ফল্‌স একেবারে নির্জন।"

গাড়িতে উঠতে গিয়ে রোমেনা হঠাৎ বলে উঠল, "বিনু! তোমার আঁচল ছিঁড়ল কী করে?"

বিনীতা আঁচলটা দেখে নিয়ে আস্তে বলল, "লক্ষ্য করিনি তো। কাঁটাঝোপে কখন আটকে ছিঁড়ে গেছে।"

দীপিতা বলল, "তুই যা ছোটাছুটি করছিলি!"

কিংশুক একটু হাসল। "অ্যানথ্রোপোলজি স্টাডি করে বেড়াচ্ছিল।"

বিনীতা চটে গিয়ে বিকৃত স্বরে বলল, "স্টপ ইট।"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "কর্নেলসায়েব! আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমরা ফিরব।"

কর্নেল বললেন, "থ্যাঙ্কস মিঃ রায়! আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এরা সবাই টায়ার্ড অ্যাণ্ড টেরিব্‌লি শকড্‌! আমি রিকশোয় ফিরব' খন। তো—সুপর্ণের দাদাকে ট্রাঙ্কল করা হয়েছে কি?"

"থানা থেকে চেষ্টা করলাম। সরাসরি লাইন না পেয়ে মিঃ পাণ্ডেকে বললাম লালবাজারে জানিয়ে দিতে। লালবাজার সুপর্ণের দাদাকে মেসেজ পৌঁছে দেবে।"

গাড়ি স্টার্ট দিলেন চন্দ্রকান্ত। কর্নেল তাঁর পাশে এসে বললেন, "একটা রিকোয়েস্ট মিঃ রায়!"

"বলুন!"

"আগামীকাল সকাল নটায় আমি ধারিয়া ফল্‌সের কাছে আদিবাসীদের থানে অপেক্ষা করব! আপনি এদের সবাইকে নিয়ে সেখানে ওই সময় যাবেন।"

"কী ব্যাপার?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "সুপর্ণকে সত্যিই স্টোনম্যান খুন করেছে। আমি সেটা প্রমাণ করব।"

গাড়ির ইঞ্জিন গরগর করছিল! গাড়ির ভেতর সবাই চুপ। একটু পরে চন্দ্রকান্ত শ্বাস ছেড়ে বললেন, "হ্যাঁ। যাব। সবাইকে নিয়ে যাব। আমরাও জানতে চাই কে খুন করল সুপুকে।"

কর্নেল রাস্তায় গিয়ে একটা রিকশো ডাকলেন।

চন্দ্রকান্তের গাড়ি এগোল বাড়ির দিকে। সারা পথ কেউ কোনও কথা বলল না।...

আদিবাসীদের থানের পেছনে উঠে গেছে একটা টিলা। টিলার মাথায় একটা ন্যাড়া বিশাল পাথরে বসে অপেক্ষা করছিলেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। দাঁতের ফাঁকে চুরুট, চোখে বাইনোকুলার। উজ্জ্বল শারদ-রোদে দূরে চন্দ্রকান্তের সাদা গাড়িটা আসছে। আঁকাবাঁকা খোয়া বিছানো রাস্তাটার সংস্কার হয়নি কয়েক বছর। এলাকায় ঝাড়খণ্ডীদের আন্দোলন একটা কারণ। অন্য কারণ এ রাস্তায় টুরিস্ট আসা বন্ধ হয়ে গেছে।

নটা বাজার পনের মিনিট আগেই এসে পৌঁছুলেন চন্দ্রকান্ত। কিংশুক, রাতুল,

রোমেনা, দীপিকা, বিনীতা সবাই এসেছে। প্রতিটি মুখে চাপা উত্তেজনা থমথম করছে। চন্দ্রকান্ত আজ সঙ্গে তাঁর রাইফেল এনেছেন।

কর্নেল তাঁদের অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে থানের কাছে নেমে এলেন! "মর্নিং অল অব য়ু!"

চন্দ্রকান্ত গম্ভীর মুখে বললেন, "মর্নিং!"

কর্নেল হাসলেন, "রাইফেল কেন মিঃ রায়?"

চন্দ্রকান্ত গলার ভেতর বললেন, "আই মাস্ট কিল দ্য ব্লাডি স্টোনম্যান।"

"মিঃ রায়! কলকাতায় কোন সাংবাদিক কিংবা পুলিশ অফিসার স্টোনম্যান কথাটা চালু করেছেন। পাবলিক নিয়েছে। কিন্তু এ হল ভাষার ওপর অত্যাচার।" কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন, "অবশ্য ভাষা আগে, ব্যাকরণ পরে। স্টোনম্যানের মতো আরেকটি শব্দ আছে, আয়রনম্যান। বাংলায় লৌহমানব বলা হয়। লোহার মতো কঠিন যে মানুষ। সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে ব্যাকরণ এই শব্দটা নিতে পারে। কিন্তু স্টোনম্যান? পাথরের মতো মানুষ অর্থে সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে একেও ব্যাকরণ পাতে নিতে আপত্তি করবে না। অথচ কলকাতার স্টোনম্যান মানে, পাথর দিয়ে যে মানুষ খুন করে। ভাষার ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার মিঃ রায়।"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "আপনি কী বলতে চাইছেন?"

"ধরিয়া ফল্স এলাকার স্টোনম্যানকে আমরা আক্ষরিক অর্থে নিতে চাই! স্টোনম্যান মানে, পাথরের মানুষ। বরং পাথরে তৈরি মানুষ বললে আরও স্পষ্ট হয় কথাটা।" কর্নেল টিলা বেয়ে উঠতে উঠতে বললেন, "আসুন মিঃ রায়! তোমরাও এস। দেখাচ্ছি।"

চন্দ্রকান্ত তাড়া দিলেন, "চলো সব!"

কিংশুক ও রাতুল আগে, তারপর রোমেনা ও দীপিতা, তাদের পেছনে বিনীতা টিলা বেয়ে উঠতে থাকল। ঝোপঝাড়ে ঢাকা টিলাটার ঢাল প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করেছে সমতল থেকে। প্রায় কুড়ি ফুট ওঠার পর একটা বুড়ো ঝাঁকড়া গাছ এবং তলায় ঘন ঝোপ। ঝোপের ধারে টুকরো-টুকরো নানা গড়নের পাথর পড়ে আছে। কর্নেল সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন, "বিনীতা, তুমি নৃবিজ্ঞানের ছাত্রী! দেখ তো এগুলো চিনতে পারো কি না?"

সে কিছু বলার আগেই রাতুল বলল, "একটা পাথরের মূর্তিটুর্তি ভেঙে পড়ে আছে।"

"কারেক্ট।" কর্নেল বললেন, "গতকাল বিকেলে আমি যখন তোমাদের জিজ্ঞেস করলুম, কেউ নিচের ওই থানের কাছে এসেছিলে কি না, সবাই বললে, আসেনি। কিন্তু একজন এসেছিলে। তার মানে একজন মিথ্যা বলেছ।"

চন্দ্রকান্ত ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কে সে?"

কেউ জবাব দিল না।

কর্নেল আস্তে বললেন, "মিথ্যা বলা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ সে ভাবতে পারেনি একটুর জন্য এমন সংঘাতিক অঘটন ঘটে যাবে।"

রোমেনা কান্না জড়ানো গলায় বলে উঠল, "দ্যাটস অ্যান অ্যাকসিডেন্ট।"

চন্দ্রকান্ত তার দিকে তাকালেন। "তুমি এসেছিলে?"

রোমেনা দু হাতে মুখ ঢেকে মাথা নাড়ল।

"তবে কে?"

কর্নেল বললেন, "পুলিশ-চোর খেলার পুলিশ হয়ে সে চোর খুঁজতে থানের ওই দিকটায় এসেছিল। সেখান থেকে এই পাথরের মূর্তির ভগ্নাবশেষ তার চোখে পড়ে। সে খেলা ভুলে ঝোপের ভেতর দিয়ে এখানে আসে। মূর্তির মাথাটা সে তুলে সোজা করার চেষ্টা করে। সেই সময় তার হাত ফস্কে তেইশ কিলো পাথরের মাথা—স্টোনম্যানেরই মাথা বলা উচিত—সোজা নিচে গড়িয়ে যায়। থানের আড়ালে সুপর্ণ লুকিয়ে ছিল। সে গুঁড়ি মেরে বসে ছিল সম্ভবত। তাই পাথরটা গিয়ে তার মাথায় পড়ে। রোমেনা ঠিকই বলেছে, "দ্যাটস অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। সে জানত না সুপর্ণ নীচে আছে।"

চন্দ্রকান্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "কে সে?"

কেউ জবাব দিল না। কর্নেল পকেট থেকে একটা জিনিস বের করে বললেন, "কী ঘটেছে দেখামাত্র সে ছুটে নেমে যায় এবং তখন কাঁটা ঝোপে তার শাড়ির আঁচলের এই টুকরোটা—"

"বিনু! তুই!" চন্দ্রকান্ত চমকে উঠে বললেন।

রোমেনা বিনীতাকে ধরল। সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বিনীতা। "আমি—আমি ভাবিনি এমন হবে।"

রোমেনা ভাঙা গলায় বলল, "রাত্রে আমাকে বিনু সব কথা বলেছে! ওর কোনও দোষ নেই।"

কর্নেল বললেন, "অ্যানথ্রোপোলজির ছাত্রীর পক্ষে এটা স্বাভাবিক। সে ট্রাইব্যাল দেবতার মূর্তি দেখতে পেয়ে খেলা ভুলে পরীক্ষা করতে এসেছিল। তবে হ্যাঁ, বিনীতার নার্ভ স্ট্রং।"

চন্দ্রকান্ত হতাশভাবে বললেন, "সুপুর মৃত্যু ঘটানোর জন্য আইনত বিনু দায়ী। এখন ওকে কী করে বাঁচাব বুঝতে পারছি না।"

বিনীতা চোখ মুছে বলল, "আমি পুলিশকে সব বলব। আমার শাস্তি হোক।"

রোমেনা বলল, "ফরগেট ইট বিনু! আমিও সুপর্ণের মৃত্যুর কারণ হতে পারতুম!"

রাতুল বলল, "আমিও হতে পারতুম।"

কিংশুকও বলল, "আমিও। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। এতে কিছু করার নেই।"

দীপিতা ফুঁসে উঠল। "আমি এখানে এলে পাথর টানাটানি করতুম না। বিনু একটা ইডিয়ট!"

চন্দ্রকান্ত চোখ মুছে বললেন, "হয়তো ট্রাইব্যাল দেবতার অভিশাপ। আমরা নন-ট্রাইবালরা ওদের ওপর যুগ যুগ ধরে উৎপাত করেছি।"

কর্নেল বললেন, "এবার আবার থানে নেমে যাই চলুন। এই শাড়ির আঁচলের টুকরোর মতো আর একটা জিনিস আপনাদের দেখাব। সেটা ঐ ডোবাটার কাছে ঝোপের ভেতর পড়ে আছে।"

বিনীতা বলল, "আমার রুমালটা!"

সবাই নামতে থাকল। চন্দ্রকান্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "রুমাল ফেলে রেখেছিস কেন হতচ্ছাড়া মেয়ে?"

কর্নেল বললেন, "বিনীতার নার্ভ স্ট্রং। সে যখন দেখল, যা হবার হয়ে গেছে, তখন সে রুমালে সুপর্ণের মাথার রক্ত মাখিয়ে থানে ঘষে রক্তমাখা রুমালটা ওখানে ফেলে গিয়েছিল। নৃবিজ্ঞানের ছাত্রী। ট্রাইব্যাল রিচুয়্যাল কিলিং বা বলির খুঁটিনাটি তথ্য তার জানা।"

নিচে নেমে সেই ছোট্ট ডোবার ধারে একটা ঝোপ থেকে শুকনো রক্তমাখা রুমালটা কুড়িয়ে নিলেন কর্নেল। শুকনো পাতা কুড়িয়ে আগুন ধরালেন। সেই আগুনে আঁচলের টুকরো আর রুমালটা পুড়িয়ে দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "প্রমাণ লোপও বেআইনি। কিন্তু অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট।"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "কিন্তু পুলিশ তো আদিবাসীদের ওপর খামোখা জুলুম চালাবে।"

কর্নেল বললেন, "নাহ্। আমি পুলিশকে বুঝিয়ে দেব, পাথরটা কোনও বুনো জন্তুর পায়ের চাপে হঠাৎ নিচে গিয়ে পড়েছে।"

"এ জঙ্গলে তো বুনো জন্তু নেই!"

"এ জঙ্গলে এখনও সম্বর আছে। আর সম্বরের স্বভাব হল শিঙ দিয়ে পাথর ওপড়ানো। এই দেখুন! গতরাতে এখানে এসে ফল্‌সের কাছে গাছের ডালে আমার ক্যামেরা পেতে রেখেছিলুম। শাটারে নাইলনের সুতো টানা ছিল জন্তুদের জল খেতে নামার পথে। সম্বরের পায়ে লেগে শাটার ক্লিক করেছে। ফ্ল্যাশে চমৎকার ছবি উঠেছে।" কর্নেল একটা ছবি বের করলেন। "ভোরে ডেভালাপ করে প্রিন্ট করেও ফেলেছি। সব সরঞ্জাম আমার সঙ্গে থাকে, আপনি তো জানেন।"

সবাই ছবিটার দিকে ঝুঁকে পড়ল। একটা সম্বর শিঙ দিয়ে পাথর ওপড়ানোর চেষ্টা করছে ধারিয়া ফলসের ধারে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, "হ্যাঁ, সম্বরদের এ স্বভাব আছে। তবে ঠিক পাথর ওপড়ানোর চেষ্টা বলা ঠিক হবে না। আসলে ওরা—"

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, "আসলে ওরা শিঙ ধারালো করতে চায়। কিন্তু তা-ই করতে গিয়ে পাথর খসে পড়ে পাহাড়ের গা থেকে। আশা করি, এই ছবি দেখে মিঃ পাণ্ডে আমার থিওরি মেনে নেবেন। চলুন, এবার ফেরা যাক।"...

# খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত

## ॥ প্রস্তাবনা ॥

ভদ্রলোক সোফায় বসেই তেতোমুখে বললেন,—সব চেয়ে বাজে আর সাংঘাতিক হোক্স যদি কিছু থাকে, তা আছে আর্কিওলজিতে। মাটির তলায় একটা নাকভাঙা পুতুল বেরুলেই গুপ্তযুগ! এক টুকরো মেটাল পাতে হিজিবিজি রেখা দেখলেই খরোষ্ঠী লিপি! ব্যাপারটা একটা ফাঁদের মতো। বাবা এই ফাঁদে পা দিয়ে এবার আমাদের ফ্যামিলিকে পথে বসাতে চলেছেন।

অবাক হয়ে লক্ষ করছিলাম ভদ্রলোককে। বয়স বেয়াল্লিশ হতে পারে, পঁয়তাল্লিশও হতে পারে। আবার পঞ্চাশ হলেও হতে পারে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। রোদপোড়া তামাটে গায়ের রঙ। চেহারায় মফস্বলের বনেদি আভিজাত্য স্পষ্ট। শক্ত হাড়ের কাঠামো। লম্বাটে গড়ন। পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি, তাঁতের ধুতি। হাতে একটা কালো শৌখিন ছড়ি। কাঁধের সুদৃশ্য ব্যাগটা গুছিয়ে পেটের কাছে রেখে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। এতক্ষণে আঙুলে গ্রহরত্ন বসানো কয়েকটা আংটিও চোখে পড়ল।

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চুরুট কামড়ে ধরে তাকিয়ে ছিলেন। সাদা দাড়ি থেকে একটুকরো ছাই গড়িয়ে পড়ল। টাকে হাত বুলিয়ে বললেন,—আপনি সোমদেব রায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এতক্ষণে ভদ্রলোক নমস্কার করলেন। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন—সাইকিয়াট্রিস্ট ডঃ মহেন্দ্র বোস আমার বন্ধু। গতরাত্রে কথায়-কথায় উনি আপনার কথা বলেছিলেন।

কর্নেল ওর কথার ওপর বললেন—আপনি কি আপনার বাবাকে সাইকিক পেশ্যান্ট ভেবেছিলেন?

—ভাবি আর না-ভাবি, বলুন? সোমদেব সিগারেট ধরিয়ে বিরক্তমুখে বললেন—বছর দশেক আগে স্কুল থেকে রিটায়ার করেছেন। স্কুলে থাকায় সময় এসব বাতিক একটু-আধটু ছিল। সেটা এখন বাড়তে বাড়তে একেবারে পাগলামিতে পৌঁছেছে। আজ কাল পঞ্চায়েত থেকে রাস্তা তৈরি, পুকুর সংস্কার এ সব কাজ আমাদের এলাকায় লেগেই আছে। বাবার বয়স পঁচাত্তর বছর। এই বয়সে কোথাও খোঁড়াখুঁড়ির খবর পেলেই সেখানে হাজির হবেন। আর রাজ্যের জঞ্জাল কুড়িয়ে এনে—মিউজিয়াম! বুঝলেন? ওয়েস্টে

চিঠি লেখালেখি করে সায়েব-মেমদের ডেকে আনা, তার ওপর বই লেখার বাতিক। পয়সা খরচ করে সেই বই ছাপানো—সংসার ফতুর হতে বসেছে।

—আপনার বাবার মিউজিয়াম থেকে কী হারিয়েছে বলেছিলেন?

সোমদেব সোজা হয়ে বসলেন। —বাবা বলছেন হারিয়েছে। সেই নিয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। আবোল-তাবোল বকছেন। সামলানো যাচ্ছে না। চূড়ান্ত পাগলামি!

—জিনিসটা কী?

—বলছেন নাকি ব্রোঞ্জের একটা সিল। খরোষ্ঠীলিপিতে কীসব লেখা ছিল। প্রায় নাকি ডিসাইফার করে ফেলেছিলেন। একটু বাকি ছিল।

কর্নেল একটু হাসলেন। —ডিসাইফার কথাটা ঠিক হল না। যতদূর জানি খরোষ্ঠীলিপি আলফাবেটিক রাইটিং সিস্টেম অর্থাৎ বর্ণমালা ভিত্তিক লিপি। এখন এ লিপি পড়া হয়। ডিসাইফার করা হয় বলা চলে না।

সোমদেব গম্ভীর মুখে বললেন—কে জানে! বাবা তা-ই বলছেন। যাই হোক, প্রশ্ন হল, বাবার ও-ঘরে পারতপক্ষে আমরা কেউ ঢুকি না। ঢুকলে উনি বিরক্ত হন। তা ছাড়া সব সময় দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। বাবা যখন বেরোন, তালা এঁটেই বেরোন। তালা কেউ ভাঙেনি। বাবার দৃষ্টিশক্তিও এ বয়সে খুব তীক্ষ্ণ। কাজেই আমরা ভেবে পাচ্ছি না কীভাবে ওটা চুরি যেতে পারে। সোমদেব কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর শ্বাসপ্রশ্বাসে মিশিয়ে ফের বললেন,—কিছুদিন থেকে আমার ধারণা হয়েছে, বাবা ইমাজিন্স্ থিংস। যা নেই, তা আছে বা ছিল বলে কল্পনা করেন। পরে অনেকসময় অবশ্য ভুলটা স্বীকারও করেন। এনিওয়ে, ডঃ বোস বললেন—

—হ্যাঁ! একটু আগে উনি আমাকে ফোন করেছিলেন। কর্নেল হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বললেন—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি! ব্রোঞ্জের সিল হারানোর কথা আপনার বাবা কি থানায় জানিয়েছেন?

—জানিয়েছেন। তবে লোকাল পুলিশ বাবার ব্যাপার-স্যাপার ভালই জানে।

ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি রেখে গেল। কর্নেল চোখ খুলে বললেন —কফি খান।

সোমদেব কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। —এঁকে তো চিনতে পারলাম না। ইনি কি আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট? শুনেছি, প্রাইভেট ডিটেকটিভদের অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে।

কর্নেল দ্রুত বললেন—একটু ভুল হয়েছে সোমদেববাবু! আমি ডিটেকটিভ নই।

সোমদেব একটু অবাক হয়ে বললেন—কিন্তু ডঃ বোস বললেন—

—আমি ডিটেকটিভ?

সোমদেব বিব্রতভাবে বললেন—না। মানে ঠিক এই কথাটা বলেননি। তবে মিসটিরিয়াস কিছু ঘটলে আপনি নাকি সল্‌ভ্ করতে পারেন।

কর্নেল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অট্টহাসিটি হেসে বললেন—আসলে আমি একজন নেচারিস্ট, সোমদেববাবু। প্রকৃতিতে অসীম রহস্য। তা-ই নিয়ে আমি নিজের পদ্ধতিতে মাথা

মাই। না—আমি বিজ্ঞানী নই। তবে মানুষও তো প্রকৃতির একটা অংশ। তাই কোথাও নুষের জীবনে রহস্যময় কিছু দৈবাৎ ঘটে গেলে আমি নাক গলাই। কর্নেল আমার কে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন—জয়ন্ত চৌধুরী। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার স্পেশাল রিপোর্টার।

আমরা সৌজন্যমূলক নমস্কার বিনিময় করলাম। তারপর বললাম—আপনি কি হারানো ব্রাঞ্জের সিল উদ্ধার করতে কর্নেলের কাছে এসেছেন?

সোমদেব একটু ইতস্তত করে বললেন—তার চেয়েও ব্যাপারটা সিরিয়াস। বাবার অবস্থা এখন হাফ-ম্যাড। শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। বিড়বিড় করে কী সব বলছেন বোঝা যাচ্ছে না—'পাল-পুকুর'... 'ধর্মপাল'...'পালগড়' এইসব কথা। কিন্তু বারবার পারু, মানে আমাদের ছোটবোন পারমিতাকে ডাকছেন। পারু ইজ ডেড! অথচ বলছেন, পারুকে ডাকো সে সব জানে!'

কর্নেল আস্তে বললেন,—আপনার বোন মারা গেছে?

—একটা মিসহ্যাপ। ব্যাপারটা খুলে বলি। আমরা তিন ভাই, এক বোন। আমি, শান্তিদেব, শান্তিদেব আর পারমিতা। মা বেঁচে নেই। আমরা একান্নবর্তী ফ্যামিলিতে থাকি। গতবছর বাবা আমাদের অমতে ওঁর এক প্রাক্তন ছাত্র কমলেশের সঙ্গে পারুর বিয়ে দেন। মাস তিনেক আগে পারু স্যুইসাইড করেছে। একটা স্যুইসাইড্যাল নোট ওর ঘরে পাওয়া গিয়েছিল। আমরা জমিদারবংশ। বংশের প্রথা হল, বাড়ির মেয়ে শ্বশুরঘর করতে যাবে না। আমার ছোটবেলায় জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু বাবা ট্রাডিশান ছাড়তে চাননি। কাজেই কমলেশ ঘরজামাই ছিল।

—কমলেশবাবু এখন কোথায়?

—বাবা ওকে যেতে দেননি। বাবার আর্কিওলজিতে বাতিক। আর কমলেশ ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট!

সোমদেবের মুখে বিকৃতি ফুটে উঠল। কর্নেল ফের বললেন—কমলেশবাবু এখন কোথায়?

—বাবার মিউজিয়ামের পাশের ঘরে থাকে। বাবার দেখাশোনা সে-ই করছে। আসলে বাবা আমাদের কাছ ঘেঁষতে দিচ্ছেন না। কিন্তু ওকে ঢুকতে অ্যালাউ করছেন।

—কমলেশবাবুর বাড়ির কোথায় ছিল?

—পাশের গ্রাম পালগড়ে। ছন্নছাড়া প্রকৃতির যাকে বলে। তিনকুলে কেউ নেই।

—কোনও চাকরিবাকরি করেন উনি?

—আমাদের কোদালিয়াগ্রামের স্কুলের মাস্টারি করে। জেলার সবচেয়ে পুরনো স্কুল আমাদের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার করা। এখন গভর্নমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-বোর্ড বসিয়ে দিয়েছেন। আমার জ্যাঠামশাই ছিলেন সেক্রেটারি। তিনি মারা গেছেন। বাবা ছিলেন হেডমাস্টার।

—আপনার জ্যাঠামশাইয়ের ফ্যামিলি কোথায় থাকেন?

—উনি চিরকুমার ছিলেন।

—কর্নেল কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে বললেন—আপ
কী করেন?

সোমদেব হাসবার চেষ্টা করে বললেন—কিছু না। থিয়েটার নিয়ে থাকি-টা
খুলে বলা উচিত, আমি বাবার প্রিয়পাত্র ছিলাম না কোনওদিন। টেনেটুনে বি
পাশ করেছিলাম। মেজ রন্তু—রন্তিদেব অবশ্য ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। বাবা তাকে ওয়ে
লেখাপড়া করতে পাঠিয়েছিলেন। সে এখন অ্যামেরিকার কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে এশি
স্টাডিজ ডিপার্টে পড়ায়। ছোট শান্তিদেব ইঞ্জিনিয়ার। দুর্গাপুরে ছিল। চাকরি ছে
গ্রামে ফিরে চাষবাস নিয়ে মেতে আছে। বাই দা বাই, আমি জ্যাঠামশাইয়ের ম
ব্যাচেলর।

—শান্তিদেববাবু?

—বিবাহিত। একটি মেয়ের বাবা। মেয়ের বয়স বছর সাতেক। স্কুলে প্রাইম
সেকশনে পড়ে।

কর্নেল আবার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজেছিলেন। সেই অবস্
বললেন—সম্প্রতি আপনার বাবার কাছে কোনও বিদেশী এসেছিলেন কি?

সোমদেব একটু চমকে উঠে বললেন—হ্যাঁ। মাসখানেক আগে রন্তু এক সায়েব
পাঠিয়েছিল চিঠি দিয়ে। কী একটা খটমটে নাম —হ্যাঁ, গ্যান্সলার। সাম গ্যান্সলার
আশ্চর্য! ব্যাপারটা আপনি বলায় এতক্ষণে কথাটি মাথায় এল। গ্যান্স্লারসায়েবই সিল
হাতাননি তো?

—আপনার বোন স্যুইসাইড করেছিল কী ভাবে?

অতর্কিত প্রশ্ন করা কর্নেলের স্বভাব। সোমদেব হকচকিয়ে বললেন—বাড়ির পেছনে
বাগানে একটা গাছে গলায় দড়ি দিয়েছিল। তবে পারু খুব জেদি আর হিস্টেরি
টাইপ ছিল। তা ছাড়া আমরা জানতাম, বিয়েটা সে মেনে নেয়নি। বাবা জোর কে
আমাদের অমতে বিয়ে দিয়েছিলেন। তো গ্যান্সলার সায়েব—

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে বললেন—আমি তা বলিনি। ওটা জা
একটা প্রশ্ন। আমি আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সোমদেবের মুখে স্বাভাবিকতা ফিরে এল। —আপনার পায়ের ধুলো পড়লে রায়ভ
ধন্য হবে। ডাঃ ঘোষের মুখে আপনার অনেক কীর্তিকলাপ শুনলাম। ডাঃ ঘো
ফ্যামিলি একসময় কোদালিয়ায় ছিল। সেইসূত্রে চেনাজানা। যাইহোক, আমার এ
শাস্তর প্রব্লেম হল বাবাকে নিয়ে। উনি পাগল হয়ে গেলে আমরা ভেসে যাব।

—কেন?

সোমদেব অন্যমনস্কভাবে বললেন—প্রব্লেমটা প্রপার্টিঘটিত। আপনি গেলে ঠা
মাথায় সব আলোচনা করব। আমি তাহলে উঠি। আপনি কখন যাচ্ছেন জানতে পার
স্টেশনে শান্তু জিপ নিয়ে যাবে।

সোমদেব উঠে দাঁড়ালে কর্নেল বললেন—ঠিক সময় দিতে পারছি না। তবে যাব, কোদালিয়া আমার চেনা জায়গা।

সোমদেব কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করলেন। কিন্তু বললেন না। নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল চোখে হেসে বললেন—কী বুঝলে বলো ডার্লিং?

বললাম—একটা গ্রাম্য বনেদি ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ড পাওয়া গেল। টিপিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড দ্য সেইম ক্যারেক্টার। সেই আদর্শবাদী স্কুলটিচার এবং পুরাতত্ত্বের বাতিক। আমি লক্ষ করেছি, গ্রামের লোকেরা নিজেদের এরিয়ায় সবসময় প্রাচীন ইতিহাস এবং বিখ্যাত রাজরাজড়াকে এনে বসাতে চায়। কাল্পনিক অতীত সমৃদ্ধির গৌরব নিয়ে জাবর কাটে। এই ভদ্রলোক—সোমদেব রায় ইজ কারেক্ট। মাটির তলায় পুতুল বা একটা কিছু পেয়ে গেলেই সটান গুপ্তযুগ! কলোনিয়্যাল হ্যাং-ওভার, কর্নেল! সম্প্রতি একটা বইয়ে পড়ছিলাম কলোনিয়ালিজম ইজ দ্য ওরিয়েন্টালিজম। কিংবা ওরিয়েন্টালিজমই কলোনিয়ালিজম!

—জয়ন্ত, তুমি উত্তেজিত!

—না। দেখুন, এই কবরখোঁড়া ব্যাপারটা আমার অসহ্য লাগে। আমার কাছে অতীতের চেয়ে বর্তমান নিয়ে মাথাঘামানোই বড় কাজ। কারণ ভবিষ্যৎ সৃষ্টি হয় এই বর্তমান থেকেই।

কর্নেল হাসলেন। —কিন্তু ডার্লিং, প্রব্লেম হল, অতীতের ভূত আমাদের পিছু ছাড়ে না। রবিঠাকুরের আর্যবাণী ভুলে যাচ্ছ। অতীত গোপনে-গোপনে ঠিকই কাজ করে যাচ্ছে। এনিওয়ে, রায়ভবনের এপিসোডটি ইন্টাররেস্টিং। হ্যাঁ—খরোষ্ঠী লিপির চেয়ে ইন্টারেস্টিং।

—খরোষ্ঠী লিপিটা কী?

—আদি বৌদ্ধযুগে উত্তর-পশ্চিম ভারত, উত্তর-পূর্ব ইরান, আফগানিস্তান থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বৌদ্ধরা এই লিপি ব্যবহার করতেন। এটা আসলে সেমিটিক লিপি। ডানদিক থেকে পড়তে হয়। প্রাচীন অ্যারামাইক লিপির হরফ ছিল মাত্র বাইশটা। সেই লিপি অনুকরণ করে বৌদ্ধ অনুশাসন লেখা হত প্রাকৃত ভাষায়। দক্ষিণবঙ্গে এই লিপি আবিষ্কারের দাবি কেউ-কেউ করেন। যেমন সোমদেববাবুর বাবা জয়দেববাবু। আমি ওঁর লেখা পড়েছি। কিন্তু এটাই আশ্চর্য, কোথায় পাহাড়ি পশ্চিম-ভারত আর কোথায় পূর্ব-ভারতের সমতল নিম্নাঞ্চল! বৌদ্ধদের বড় ঘাঁটি ছিল মগধ কলিঙ্গ অঞ্চলে। সেখানে রাশি-রাশি বৌদ্ধ পুরাদ্রব্য পাওয়া গেছে। অথচ কোনও খরোষ্ঠীলিপি মেলেনি। কাজেই প্রশ্নটা হল, পশ্চিম-পূর্ব যোগসূত্রটা কীভাবে মেলানো যাবে?

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—ওঃ! মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। চলি।

—জয়ন্ত, অতীতের ভূত পিছু ছাড়ে না। সেই ভূতকে দেখতে হলে কোদালিয়া

চলো। আই প্রমিজ ডার্লিং! তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা একটা অনবদ্য স্টো পাবে।

অবাক হয়ে বললাম—চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধারের কাজটা সরকার পুলিশকে দিয়ে আপনি পুলিশের রোলে নামবেন নাকি? ছ্যা ছ্যা! প্রখ্যাত কর্নেল নীলাদ্রি সরকা প্রেসটিজ পাংচার হয়ে যাবে যে!

কর্নেল হাসলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন—ন্যায়শাস্ত্রে অবভাসতত্ত্ব বলে এক টার্ম আছে। হোয়াট অ্যাপিয়ার্স, ইজ নট রিয়্যাল। ব্রোঞ্জের সিল এবং সেই সি চুরি যাওয়া সম্ভবত একটা ঘটনার মুখোশ, জয়ন্ত! মুখোশের তলায় অন্য কেউ কিছু আছে।

—কী করে বুঝলেন?

কর্নেল উঠে গিয়ে বুকশেলফ থেকে একটা বই টেনে বের করে আপনম বললেন—সোমদেববাবুর বোনের আত্মহত্যা, তারপর ব্রোঞ্জের সিল চুরি, জয়দেববাবু মধ্যে পাগলামির লক্ষণ। সম্পত্তিঘটিত কী একটা প্রব্লেম....আমার কেন যেন ব অস্বস্তি হচ্ছে। জাস্ট্ অ্যান আনক্যানি ফিলিং।

কর্নেল তাঁর ইজিচেয়ারে ফিরে বইটার পাতাখুলে বিড়বিড় করতে থাকলেন। কথাগুলে বুঝতে পারছিলাম না। বইটার কভারে লেখা আছে, 'দ্য ওরিজিন অ্যান্ড ডেভালাপমে অব খরোষ্ঠী স্ক্রিপ্ট্।'...

## ॥ এক ॥

পুজোর কয়েকটা দিন বড় বিশ্রী গেছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি যখন-তখন দশমীর দিন তো কলকাতা জুড়ে প্রায় বন্যার দুর্যোগ। তারপর থেকে আবহাওয়া চমৎকার প্রসন্ন। কথা ছিল, কর্নেলের সঙ্গে হিমালয়যাত্রা করব। ততদিন বাঙালি পর্যটকদের ভিড় ঘরমুখী হবে। স্থান বাছাই না হলেও আমাদের লক্ষ্য ছিল উত্তরপ্রদেশ। কিন্তু হঠাৎ ত্রয়োদশীর দিন কোন কোদালিয়া থেকে এক সোমদেব রায় এসে প্রোগ্রাম ভণ্ডুল করে দিলেন।

সোমদেবের বাবার চেয়ে কর্নেল কোনও অংশে কম যান না। মাথায় একটা কিছু ঢুকলেই হল। তা-ই নিয়ে একেবারে মরণপণ লড়াইয়ে নেমে যাবেন। সমস্যা হল, সেই লড়াইয়ে আমাকেও জড়িয়ে জেরবার করবেন। গতবছর এমনি শরতে ওড়িশার জঙ্গলে একটা পাখির পেছনে নিজে ছোটাছুটি করে সারাদিন কাটিয়েছিলেন এবং আমার হয়েছিল সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা। সঙ্গ ছাড়লে জঙ্গলে বেঘোরে প্রাণটি খোয়াতে হত। কাজেই পেছন-পেছন খালি পেটে অকারণ ছোটাছুটি করে কাটাতে হয়েছিল তবে হ্যাঁ, জঙ্গল থেকে বেআইনি কাঠপাচারের সরেজমিন অভিজ্ঞতা থেকে একটা রেপোর্টাজ উপহার দিতে পেরেছিলাম আমার রুজির মালিক দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকাকে তাই কথাটি তুলতেই কর্নেল আমাকে সেটা স্মরণ করিয়ে মুখ বন্ধ করে দেন।

পরদিন দুপুরঅব্দি কর্নেলের সাড়া নেই দেখে আশা করছিলাম, সম্ভবত হারানে

দিল পুলিশ উদ্ধার করে দিয়েছে। তাই কর্নেল কোদালিয়াযাত্রার প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছেন।

কিন্তু হঠাৎ দুটোয় ওঁর টেলিফোন এল। —জয়ন্ত! তৈরি হয়ে এস। শেয়ালদায় তিনটে দশে ট্রেন।

—কোদালিয়া?

—কোদালিয়া। কুইক ডার্লিং, কুইক!

... কিন্তু...

—আবার একটা মিসহ্যাপ হয়েছে রায়ভবনে। সোমদেববাবুর লোক এসে খবর দিয়ে গেল।

—মিসহ্যাপ? কমলেশবাবু...

—নাহ্। নন্দ নামে ওদের বাড়ির একজন পুরানো সারভ্যান্ট গতরাতে খুন হয়েছে। বডি পাওয়া গেছে বাড়ির বাগানে আজ ভোরবেলায়। চলে এস।

লাইন কেটে গেল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটা অতর্কিত ত্রাস আমার বুকের ভেতর ধাক্কা দিল। আজকাল দেশের আইন-শৃঙ্খলার যা অবস্থা, অজানা গ্রাম্য জায়গায় খুনোখুনির মধ্যে গিয়ে পড়া কি ঠিক হবে? একটু ইতস্তত করে আলমারির লকার থেকে সিক্স-রাউন্ডার অটোমেটিক রিভলভার বের করলাম। ক'বছর আগে চিৎপুর রেলইয়ার্ডে স্মাগলিং র‍্যাকেটের খবর কাগজে ফাঁস করার পর আমার ওপর হামলা হয়েছিল। তারপর পুলিশ কমিশনার উদ্যোগী হয়ে আমাকে এই অস্ত্রটার লাইসেন্স পাইয়ে দেন। কর্নেলেরও অবশ্য রিভলবার আছে। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারের পক্ষে লাইসেন্স পাওয়া সোজা। তবে কর্নেল বলেন,—বয়স হয়েছে। শারীরিক ক্ষমতার ওপর নির্ভরতা কমে যাচ্ছে। তবে ভেবে দেখ ডার্লিং! এই মরজগতে মৃত্যু অমোঘ। তবু বেঘোরে প্রাণের মতো দামি জিনিস খোয়ানোটা ভারি অসম্মানজনক। প্রাণ প্রকৃতির দান। প্রাণ নেওয়ার অধিকার শুধু প্রকৃতির আছে। অন্য কেউ এতে নাক গলাক, এটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

বিশালদেহী কর্নেলের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি হয়ে এল। অথচ মুখে উনি যা-ই বলুন, জানি এবং দেখছিও বটে, এবয়সেও অনেক শক্তিমান জোয়ানকে টিট করতে উনি পটু। সামরিক জীবনে হাতাহাতি লড়াইয়ের গেরিলা-কৌশল এখনও ভোলেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বর্মার জঙ্গলে মার্কিন সেনাদের গেরিলাযুদ্ধের তালিম দিয়েছেন। ছয়ের দশকেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর লাদাক ডিভিসনের গেরিলাগ্রুপকে পাহাড়ি অঞ্চলে যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়েছিলেন।

এইসব কথা ভাবলেই ওঁর সঙ্গী হওয়ার ঝুঁকি নিমেষে ঘুচে যায়। কর্নেলের হলিয়টরোডের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে যখন পৌঁছলাম, তখন আড়াইটে বাজে। উনি তৈরি হয়ে আমার অপেক্ষা করছিলেন। সেই চিরপরিচিত বেশভূষা। মাথায় টাক ঢাকা টুপি, পরনে

ফুলহাতা জ্যাকেট এবং ছাইরঙা আঁটো পাতলুম, পায়ে হান্টিং বুট। বুকে ঝুলন্ত বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা। পিঠে আঁটা প্রকাণ্ড কীটব্যাগ থেকে প্রজাপতিধরা নেট-স্টিক উঁকি মেরে আছে। মুখে শাদা দাড়ি ঝকমক করছে।

বড় রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বললাম—কাল আপনি আনক্যানি ফিলিংয়ের কথা বলছিলেন। তারপর এই খুনখারাপি। বস! আমার ধারণা, আপনার মধ্যে সত্যিই কোনও অতীন্দ্রিয় শক্তি আছে।

কর্নেল একটু হাসলেন। —নাহ্! ওসব বুজরুকি ব্যাপার। আসলে আমার মনে হয়েছিল, আবার কোনও একটা অঘটন ঘটবে।

—কেন মনে হয়েছিল বলতে আপত্তি আছে?

—জানি না। তবে সোমদেববাবুর বিবরণকে যদি নিখুঁততথ্য, মানে 'ডেটা' ধরে নিই, তা হলে দেয়ার ওয়জ সামথিং অড সাম-হোয়্যার। কী একটা গোপন ঘটনা থেকে এই 'ডেটা' গড়ে উঠেছে। মানুষের মগজ আসলে একটা জটিল কম্পিউটার, ডার্লিং।

—উঃ! বড্ড হেঁয়ালি হয়ে গেল বস্!

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন—ও! তোমাকে বলা হয়নি। নন্দের ডেডবডি দেখে প্রথমে সবাই ভেবেছিল স্যুইসাইড। একই গাছ থেকে গলায় দড়ির ফাঁস আটকে ঝুলছিল। মর্গে সদ্য নতুন একজন ডাক্তার এসেছেন। তাঁর চোখে পড়ে, বডির পিঠে হার্টের উল্টোদিকে ইনজেকশনের চিহ্ন। রক্তে সাংঘাতিক নিকোটিন পয়জন পাওয়া গেছে।

চমকে উঠে বললাম—সর্বনাশ! তা হলে তো—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন—সেটাই প্রশ্ন। নন্দ রবিঠাকুরের কথায় 'পুরাতন ভৃত্য।' সে কি কিছু জানত, যেজন্য তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া হল?

—সিলচুরির ব্যাপারে?

—জানি না।

কর্নেল অন্যমনস্ক ভাবে আস্তে কথাটা বললেন। মৌলালিতে প্রচণ্ড জ্যাম। ট্যাক্সিড্রাইভার তেতোমুখে গজগজ করতে থাকল। তার বক্তব্য, শেয়ালদার মুখে ফ্লাইওভার করে হলটা কী? জ্যামটা সরিয়ে আনা হল শুধু। 'গোর্মিনলোক খালি উল্টাকো সিধা আউর সিধাকো উল্টা করতা। দেখিয়ে সাব, দেখিয়ে! মিনিবাস টেরামলাইনকা উপ্পর খাড়া হোকে পেসেঞ্জার উঠাতা! কৈ কানুন হ্যায়?'

স্টেশনে পৌঁছতে তিনটে বেজে গেল। টিকিটকাউন্টারে লম্বা লাইন। তবে ব্যস্ততার কারণ ছিল না। ট্রেন ছাড়ল সাড়ে তিনটেয়। ভয়াবহ ভিড়। স্টেশনের নাম কোদালিয়াঘাট রোড। কস্মিনকালে শুনিনি। কর্নেল উঁচুমানুষ হওয়ায় তাঁর দিকে লক্ষ রেখেছিলাম। ঘন্টাখানেক পরে ভিড় কমে গেল। জানালার ধারে বসার জায়গাও মিলল। কর্নেল বাইনোকুলারে পাখি-টাখি দেখতে লাগলেন।

সাড়ে পাঁচটায় কোদালিয়াঘাট রোডে নেমে দেখি, বেশ বড় স্টেশন। মেন গেট য়ে বেরুতেই বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়সের একজন শক্তসমর্থ গড়নের ভদ্রলোক কর্নেলের মনে এসে নমস্কার করলেন —আপনি কি কর্নেল সরকার?

—কর্নেল বললেন—শান্তিদেব রায়?

—আজ্ঞে। বড়দা আপনার চেহারায় ডেসক্রিপশন দিয়েছিলেন। তো আমরা আশা রেছিলাম, আপনি দুলালের সঙ্গে আসবেন। স্টেশনে জিপ নিয়ে এসেছিলাম। আসুন। বলে শান্তিদেব আমাকে নমস্কার করলেন। —আপনি সম্ভবত সাংবাদিক...

নমস্কার করে বললাম—জয়ন্ত চৌধুরি।

স্টেশনবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শান্তিদেব বললেন—আপনাকে পেয়ে আমার একটা বড় লাভ হবে মিঃ চৌধুরি! ওসব খুনোখুনি নিয়ে আমার মাথাব্যথা নই। দাদা ওসব দেখুক। আমার ফার্মহাউসে আপনাকে নিয়ে যাব। বিনা সারে নানা জায়গার মাটির মিশ্রণ ঘটিয়ে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করেছি। আই মাস্ট্ শো য়ু য় এক্সপেরিমেন্ট। নেচারের কাছে কত কৌশলে বেশি আদায় করা যায়—এদিকে প্লিজ! এখানে সাইকেলরিকশোর ভিড়ে গাড়ি পার্ক করা যায় না। জাস্ট্ একমিনিট হাঁটতে হবে।

বাজার ছাড়িয়ে গিয়ে রাস্তা একটা নদীর ব্রিজে পৌঁছেছে। নদীটা দেখেই তার প্রেমে পড়ে গেলাম। উৎরাইয়ের পর বাঁদিকে শুরু হয়েছে বসতি এলাকা। ব্রিজ থেকে দেখেই বুঝতে পারছিলাম কোদালিয়াকে ঠিক গ্রাম বলা চলে না। মফস্বল শহরের আকৃতি-প্রকৃতি।

জিপ বসতির শেষদিকটায় একটা পুরনো দোতলা বাড়ির ফটক দিয়ে ঢুকল। বনেদি জমিদারবাড়ি যেমন হয়। বিশাল চৌহদ্দি উঁচু জরাজীর্ণ পাঁচিলে ঘেরা। পেছনদিকে এলোমেলো উঁচু-নিচু গাছের জটলা দেখে বুঝলাম ওটাই সেই বাগান। অনুমান করলাম, বাগানের ওধারে কাছাকাছি নদীটা বয়ে গেছে। কিন্তু এ জায়গাটা যথেষ্ট উঁচু। ধাপবন্দি সিঁড়ি উঠে গেছে বাড়ির পোর্টিকো থেকে। প্রকাণ্ড দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সোমদেব রায়। পরনে এখন পাজামা-পানজাবি, হাতে সেই ছড়ি।

গতকাল কর্নেলের ড্রয়িংরুমে বসে একেবারে অনুমান করতে পারিনি, এঁরা এমন একটা অভিজাত পরিবারের মানুষ। দোতলা বাড়িটার স্থাপত্যশৈলী প্রমাণ দিচ্ছে পুরনো ঐতিহাসিক সমৃদ্ধির। এখন ক্ষয়াটে, নির্জীব, অপরিচ্ছন্ন দেখালেও উদ্ধত অতীত আভিজাত্যের লক্ষণ স্পষ্ট। স্থবির সিংহের মতো বাড়িটা ধূসর চোখে তাকিয়ে আছে। সোমদেব অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা একটা হলঘর। একটা ফায়ারপ্লেস পর্যন্ত আছে। দেয়ালে কয়েকটা মলিন পোর্ট্রেট। এককোণে পুরনো সেকেলে সোফা। কয়েকটা গদিছেঁড়া চেয়ার দেয়ালে দাঁড় করানো। মাঝখানে বেখাপ্পা একটা বিশাল ডিমালো সাদা পাথরের টেবিল।

শান্তিদেব ঘরে ঢোকেননি। বাইরে ওঁর জিপের শব্দ শুনে বুঝলাম, চলে গেলে কোথাও। সোমদেবকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। গোঁফদাড়ি কামাননি আজ। ভেতরে একটা দরজার কাছে যেমন-তেমন প্যান্টশার্ট পরা বেঁটে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি কর্নেলকে নমস্কার করলেন। সোমদেব বললেন—দুলাল! কর্নেলসায়েবদে গেস্টরুমে নিয়ে যাও। তারপর কর্নেলকে বললেন —একটু বিশ্রাম করুন। আমি আসছি।

দুলালবাবু একটা খালি ঘরের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা কাঠে সিঁড়ির কাছে আমাদের নিয়ে গেলেন। বললেন—একটু কষ্ট করে ওপরে উঠতে হবে স্যার!

সিঁড়িটা মাত্র হাততিনেক চওড়া। ওঠার মুখে একটা দরজা খোলা ছিল। বাইরে খোলামেলা একটুকরো বারান্দা দেখতে পেলাম। বারান্দার নিচে দেশি-বিদেশি ফুলগাছ আর গুল্মের বাগান। অযত্নে জঙ্গল হয়ে আছে। ঘোরালো সিঁড়ি বেয়ে মোটামুটি বড় একটা ঘরে পৌঁছলাম। কর্নেল জানালার কাছে গিয়ে বললেন বাঃ!

নদী এবং ওপারের খাপচা-খাপচা ঝোপজঙ্গল আর ধানক্ষেত দেখা যাচ্ছিল। সূর্যাস্তের ফিকে রোদে নদীর জল ঝিলমিল করছিল। আমিও না বলে পারলাম না—বিউটিফুল

দুলালবাবু বললেন—এটা সাবেকি আমলের গেস্টরুম স্যার! শুনেছি, জমিদারি আমলে সায়েবরা এসে এ ঘরে থাকতেন। নদীর ওপারে তখন ঘন জঙ্গল ছিল বাঘ মারতে আসতেন সায়েবরা। এখন সব ধানক্ষেত হয়ে গেছে। একটা শেয়ালও নেই।

কর্নেল ছোট্ট ব্যালকনিতে গিয়ে বাইনোকুলারে হয়তো পাখি খুঁজতে থাকলেন দুলালবাবু দুটো চেয়ার দিয়ে গেলেন ব্যালকনিতে। বললেন—আমি আসছি স্যার আর একটা কথা। কোনও দরকার হলে ওই সুইচটা টিপবেন।

দুলালবাবু চলে গেলেন। চেয়ারে বসে বললাম—এই ভদ্রলোক কে?

কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখেই বললেন—শান্তিদেবের ফার্মহাউসের কর্মচারী বোঝা যাচ্ছে, নন্দ বেচারা মারা না পড়লে সেই আমাদের সেবা-টেবা করত। তার বদলে দুলালবাবুকে বহাল করা হয়েছে।

—একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগছে।

—কী?

—সেই কমলেশবাবুকে দেখলাম না।

—তাঁকে দেখতে হলে থানায় চলে যাও।

চমকে উঠে বললাম—তার মানে?

—পুলিশ ওঁকে অ্যারেস্ট করেছে।

—নন্দকে খুনের চার্জে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু উনি কেন নন্দকে খুন করবেন? মোটিভটা কী থাকতে পারে?

কাঠের সিঁড়িতে শব্দ শোনা গেল। কর্নেল চেয়ার টেনে বসলেন। সোমদেববাবুকে দেখা গেল। উনি একটা মোড়া তুলে এনে দরজার কাছে বসলেন। ব্যালকনিতে তিনজনের ঠাঁই হবে না, এত স্বল্পায়তন! সোমদেব বললেন—সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে তালগোল পাকিয়ে গেছে। এবার মনে হচ্ছে আমিও পাগল হয়ে যাব। কারণ পারুর ব্যাপারটা আমাকে হন্ট করছে। মর্গের আগের ডাক্তার ছিলেন বয়স্ক মানুষ। দায়সারা কাজ করতেন। নতুন ডাক্তারবাবুর মতো অ্যালার্ট থাকলে নিশ্চয় ধরা পড়ত, একইভাবে পারুকে—

চোখে জল এসে গিয়েছিল সোমদেবের। রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। কর্নেল বললেন—আপনার বাবা জানেন নন্দ মারা গেছে?

—নাহ্। ওঁকে আমরা বলিনি। বুঝতেই পারছেন, বাবা এখন আনপ্রেডিক্টেবল ম্যান হয়ে উঠেছেন। কী রিঅ্যাকশন হবে তা তো জানি না।

—আপনার বাবাকে দেখাশোনা করত কে?

—উনি বরাবর স্বাবলম্বী মানুষ। কারও সাহায্য নিতেন না। সিল চুরির পর কমলেশই ওঁকে দেখাশোনা করত। তা ছাড়া কেন জানি না, নন্দকে বাবা কিছুদিন থেকে বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। ধারে-কাছে দেখলেই ধমক দিয়ে সরে যেতে বলতেন।

—এটা কোন সময় থেকে?

সোমদেব একটু ভেবে নিয়ে বললেন—পারুর মৃত্যুর পর থেকে।

—এখন আপনার বাবার দেখাশোনা কে করছে?

—শাস্তুর বউ। এগারোটা নাগাদ পুলিস কমলেশকে বাজার থেকে অ্যারেস্ট করেছে। তারপর বাবা ওকে ডাকাডাকি করছিলেন। শাস্তুর বউকে বাবা মোটামুটি পছন্দ করেন। আমরা তাকে শিখিয়ে দিয়েছি। বাবা জিজ্ঞেস করলে যেন বলে, কমলেশ কলকাতা গেছে কী কাজে।

—শুনে উনি কী বলছেন?

—কিছু বলেননি। শাস্তুর বউকে আপনি বরং জিজ্ঞেস করবেন। ডিটেলস বলবে।

—কোন গাছে নন্দের বডি ঝুলছিল এখান থেকে দেখা যায়?

সোমদেব ছড়ি তুলে বললেন—ওই যে পাইনগাছটা দেখছেন, তার পেছনে আমগাছটা। ওদিকে একটা লম্বালম্বি ডাল আছে। সেই ডালে।

কর্নেল বাইনোকুলারে গাছটা দেখতে থাকলেন। আমি বললাম —আশ্চর্য তো! এই মাটিতে পাইনগাছ!

সোমদেব বললেন—শান্তর যেমন এগ্রিকালচারে বাতিক, আমার ঠাকুরদার তেমনি প্ল্যান্টেশনের বাতিক ছিল। নর্থবেঙ্গলে ওর কয়েকটা চা বাগিচা ছিল। তরাইয়ের জঙ্গল থেকে অনেক ধরনের গাছ এনে ওই বাগানে পুঁতেছিলেন। সব গাছ বাঁচেনি। কিভাবে ওই পাইনটা—

কর্নেল বললেন—পাইন দীর্ঘজীবী গাছ। ক্যালিফরনিয়ায় তিন হাজার বছরের সিকুইয়া পাইন আছে। অবশ্য এটা হিমালয়ান পাইন।

বললাম—কিন্তু এটা তো পাহাড়ী এলাকার মাটি নয়। এখানে পাইনগাছের বেঁচে থাকাটা আশ্চর্য!

কর্নেল হাসলেন। —আশ্চর্য হলেও তুমি গাছটা দেখতে পাচ্ছ!

সোমদেব বললেন—আসলে এই মাটিটা বাবার মতে প্রাচীন যুগের কোন ধ্বংসাবশেষ। বাবার ছোটবেলায় ঠাকুরদালানের ভিত খুঁড়তে নাকি পাথরের স্ল্যাব পাওয়া গিয়েছিল। দুটো স্ল্যাব বাবার ঘরে রাখা আছে। এটা নাকি একটা মাউন্ড ছিল। নাইন্‌টিন্থ্‌ সেঞ্চুরিতে তার ওপর এই বাড়িটা তৈরি। আমাদের বংশের কুলকারিকায় আছে সেভেন্‌টিন্থ্‌ সেঞ্চুরিতে মোগল সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষ এই এলাকায় এসেছিলেন। তো—

সিঁড়িতে আবার শব্দ শোনা গেল। দুলালবাবু একটা ট্রেতে স্ন্যাক্স আর কফির পট-পেয়ালা সাজিয়ে ঘরের টেবিল রাখলেন। আমরা ঘরে গেলাম। দুলালবাবু চেয়ার দুটো নিয়ে এলেন। তারপর আস্তে বললেন—মানিক এসেছে। বললাম, বড়দা এখন ব্যস্ত। বলল, খুব জরুরী দরকার। কী বলব?

সোমদেব ব্যস্তভাবে বললেন—বাবার ঘরে গিয়ে ঢোকেনি তো?

—নাহ্‌। ছোটবউদি আছেন বাবুমশাইয়ের কাছে। মানিক হলঘরে বসে আছে।

—জ্বালাতন! আসছি কর্নেলসাহেব।

বলে সোমদেব বেরিয়ে গেলেন। দুলালবাবু কুণ্ঠিতভাবে বললেন—স্যার কফি ছাড়া কিছু খান না শুনে ছোটবউদি কফি আনিয়ে রেখেছিলেন। টেস্ট ঠিক আছে স্যার?

কর্নেল চুমুক লাগিয়ে বললেন—ফাইন! আপনার ছোটবউদিকে থ্যাংকস জানিয়ে দেবেন।

দুলালবাবু বললেন—লক্ষ্মীপ্রতিমা স্যার! উনিই এতবড় সংসারটাকে রেখেছেন। পারুদিদিমণি তো জামাইবাবুর চেয়ে এক-কাঠি সরেস ছিল। পরনের শাড়িটা পর্যন্ত গুছিয়ে পরতে জানত না। আর কথায়-কথায় ভাঙচুর। ছোটবউদির হেনস্থা! তো ছোটবউদি মাটির মানুষ। ননদকে পেটের মেয়ের মতো সামলে রাখতেন। অথচ দেখুন, কলকাতার মেয়ে। অনার্স গ্র্যাজুয়েট। এদিকে পারুদিদিমণি হায়ারসেকেন্ডারি পাস। হেডমাস্টার বাবার মনের অবস্থা বুঝুন স্যার!

কর্নেল একটু হেসে বললেন—বড়ছেলে থিয়েটার করেন। এতে বাবার অমত ছিল না?

দুলালবাবুও হাসলেন।—অমত কী বলছেন স্যার! কতবার ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলে থ্রেটন করেছেন। তবে বড়দার থিয়েটার স্যার মাঝেমাঝে কলকাতায় গিয়ে প্রাইজ নিয়ে আসে। নিজেই নাটক লেখেন। ডাইরেকশন দেন। অ্যাক্টিং করেন। একেবারে অন্যরকমের থিয়েটার স্যার! এবার পুজোয় হওয়ার কথা ছিল। পারুদিদির মিসহ্যাপের জন্য ডেট পিছিয়ে গিয়েছিল। আবার নন্দের মিসহ্যাপ। ওদিকে বাবুমশাইয়ের হঠাৎ মাথাখারাপ।

—সিলচুরি!

—আজ্ঞে। আপনাকে তো বলেছি স্যার, বাবুমশাইয়ের ঘরে উঁকি মেরে অনেককিছু দেখেছি। কিন্তু তেমন কোনও জিনিস দেখিইনি। জার্মান সাহেব এলেন ওমাসে। বড়দা মেজদাকে অ্যামেরিকায় চিঠি লিখে ওর কাছে খোঁজ নিতে বলেছিলেন। সেদিন মেজদার চিঠি এল। সায়েব বলেছেন, না তাঁকে তেমন কিছু দেখাননি বাবুমশাই।

আমি কর্নেলের দিকে তাকালাম।—সোমদেববাবু তো কাল সকালে আপনার কথা শুনে—

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন—লিপিটা খরোষ্ঠি না খরোস্তি এসব পণ্ডিতরা ভাল বোঝেন। পাকিস্তানি আর পার্সিয়ান পণ্ডিতদের দাবি, কথাটা খারপোস্তি। খার মানে গাধা পোস্ত মানে চামড়া। সংস্কৃতে খার মানে গাধা! গাধার ভুঁড়ির চামড়ায় লেখা বলেই নাকি খারপোস্তি। যাই হোক, মহাজানী বৌদ্ধদের লেখা সংস্কৃতে বুদ্ধের জীবনী 'ললিত-বিস্তর' বইয়ে ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী নিয়ে ৬৪টা লিপির উল্লেখ আছে। বইটা রাজেন্দ্রলাল মিত্র গত শতকে ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। ব্যাপারটা বড্ড জটিল। বুঝলেন জয়ন্ত?

আমি তো থ। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম। দুলালবাবুও হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন কর্নেলের দিকে। বললেন—আজ্ঞে স্যার! ঠিক এইসব কথাবার্তা বলতে শুনেছি বাবুমশাইয়ের মুখে। কমলেশের সঙ্গে এই নিয়ে ডিসকাস করতেন।

কর্নেল বললেন—কখন শুনেছেন?

কর্নেলের প্রশ্নের ঝাঁকে একটু ভড়কে গিয়ে দুলালবাবু বললেন —আজ্ঞে রাত্রিবেলা। আমি তো সারাটা দিন ফার্মেই থেকেছি। সন্ধ্যার পর ছোটবাবুর সঙ্গে এসে চা-ফা খেয়ে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরতাম। ছোটবাবুর ড্রয়িং রুম থেকে বাবুমশাইয়ের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যায়।

—ফার্মে কতবিঘে জমি আছে?

—পঁচিশ একর। তিনভাই একবোনের নামে বাবুমশাইয়ের বাবা উইল করে গিয়েছিলেন। বাবুমশাই তো মাস্টারি আর ওইসব ছাইপাঁশ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। বাবুমশাইকে দিয়ে গেছেন শুধু এই বাড়িটা। তাও ছোটবাবু চাকরি ছেড়ে না এসে পড়লে বাবুমশাই বাড়িটা মিউজিয়াম আর লাইব্রেরি করার জন্য গভর্নমেন্টকে দান করে ফেলতেন। বরাবরই স্যার এইরকম পাগলামি ছিল। একবার খেয়াল হল, গার্লস স্কুলের জন্য বাড়িটা দান করবেন। তখন—

আবার কাঠের সিঁড়িতে শব্দ। দুলালবাবু চুপ করে গেলেন। সোমদেব এসে বললেন—বউমা তোমাকে ডাকছে।

দুলালবাবু বললেন—যাই। এঁদের খাওয়া হলে ট্রেটা নিয়ে যাব ভেবে ওয়েট করছিলাম।

—পরে নিয়ে যেও।

দুলালবাবু চলে গেলেন। সোমদেব মোড়ায় বসে বললেন— কমলেশের এক কলিগ এসেছিল। মানিক চ্যাটার্জি নাম। পলিটিক্যাল পার্টির মাতব্বর। দুপুরে একবার এসেছিল। এখন আবার এসে বলছে, কমলেশ একাজ করতেই পারে না। আমি বললাম, পুলিশ কেস। আমরা কেউই ওর নাম করিনি। পুলিশ সবাইকে জেরা করে গিয়ে ওকে অ্যারেস্ট করেছে। পুলিশকে গিয়ে বলো। মানিক বলছে, আমিও যেন ওর সঙ্গে যাই। তা কী করে হয়? আসল কথাটা এবার বলি। শাস্তর বউ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে না? সে স্পষ্ট দেখেছে—জ্যোৎস্না ছিল রাত্রে, কমলেশ আর নন্দ বাগানের দিকে যাচ্ছে। তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা কি এগারোটা হবে। শাস্ত খবর পাঠায়নি রাত্রে, ফার্মহাউসে থাকবে। তাই বউমা—

কর্নেল চুরুট ধরাচ্ছিলেন। তাঁর কথার ওপর বললেন—ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সোমদেব গম্ভীর মুখে বললেন—আসবে। আমি বলে এলাম আসতে।...

## ॥ দুই ॥

সোমদেব থিয়েটার নিয়ে কথা বলছিলেন। আমি ব্যালকনিতে গিয়ে দিনশেষের নদী দেখছিলাম। কর্নেল বলেন, এই সময়টাতে নাকি প্রকৃতিতে একটা আশ্চর্য সন্ধিকাল! প্রকৃতি জুড়ে একটা সাড়া পড়ে যায়। আমি অবশ্য তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। পাখিগুলো কেন যেন খুব ঝগড়াঝাঁটি করছিল। নদীর বাঁকে এক জেলে তার নৌকা থেকে শেষবার জাল ফেলে গুটিয়ে নিল। নৌকোটা ক্রমশ কালো হয়ে উঠছিল। ওপারের গাছপালার ওপর নীলাভ কুয়াশার স্তর জমে উঠল। বাঁদিকে পোর্টিকোর সামনে ঘাসের ওপর একটি ছোট্ট মেয়ে আপনমনে স্কিপিং করছিল। শাস্তদেবের মেয়েই হবে। মুখের একটা পাশে ঝকমকে উজ্জ্বলতা। বাবার গায়ের রঙ তো শ্যামবর্ণ। মায়ের রঙ?

ঘরের ভেতর স্যামুয়েল বেকেট, ইউনেস্কো, ইউজিন ও নিল, ব্রেখট্, শম্ভু মিত্র, বাদল সরকার, মনোজ মিত্র, বিভাস চক্রবর্তীরা হুল্লোড় করছেন। ...ব্রেখট্ ইজ অলরাইট। আমিও ককেসিয়ান চকসার্কেল করেছিলাম 'ব্যূহ' নাম দিয়ে—মাই কনসেপশন ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট কর্নেলসায়েব! সমাজচেতনা বা সমাজবদলানোর হাতিয়ার-টাতিয়ার, ওসবে আমি বিশ্বাস করি না। ফোকড্রামা লোকশিক্ষার বাহন ছিল কখন? যখন কিনা ওরাল ট্রাডিশানের যুগ। এখন লোকের শেখার অসংখ্য সোর্স আছে। ফোকফর্ম আমি প্রয়োগ করি। কখনও প্রসিনিয়াম থিয়েটারের অ্যাপ্রোচও ভেঙে ফেলি। কিন্তু শেষ

কথা রস। এনটারটেনমেন্ট! ওই যে গল্প আছে না? যাত্রার আসরে রাম সেজে সীতার জন্য কান্নাকাটি করে-টরে বাড়ি ফিরে দরজা খুলতে দেরি হওয়ার জন্য বউকে হারামজাদি বলে এক লাথি!

সোমদেব উঠে আলো জ্বেলে দিলেন। কাঠের সিঁড়িতে একটুও শব্দ শুনিনি। অথচ কেউ ঘরে ঢুকল। চোখ জ্বলে দেখে। রবি ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের সেই মহিলা একেবারে। টানা দুটি চোখে কী এক বিহ্বলতা। খোঁপা যেমন-তেমন করে বাঁধা। পরনে ফিকে নীল হাল্কা ডোরাকাটা শাড়ি। কর্নেলকে নমস্কার করলেন—নাকি করল বলব? মেয়েদের বয়স আমি কিছুতেই আঁচ করতে পারি না। তবে পঁচিশের বেশি হওয়া অসম্ভব।

কর্নেল বললেন—বসুন!

—আমার নাম রমা। আপনি নাম ধরে ডাকবেন এবং তুমি বলবেন।

সোমদেব আবার হাসতে হাসতে বললেন—হ্যাঁ। আপনার মেয়ের বয়সী। আমি সময়মতো বিয়ে করলে আমার মেয়েও এই বয়সের হত। বউমা, তুমি বসে কথা বলো।

কর্নেল সোমদেবের দিকে তাকিয়ে আস্তে বললেন—যদি কিছু মনে না করেন, আমি একটু নিরিবিলি কথা বলতে চাই।

সোমদেব ব্যস্তভাবে বললেন—অবশ্যই।

রমা বললেন—দুলালদাকে আমি একটু বাইরে পাঠিয়েছি। আপনি টিংকুকে একটু বকে দিন তো গিয়ে। ডাকলাম। এল না। শিশিরে ঠাণ্ডা বাধিয়ে বসবে।

সোমবাবু ছড়ি হাতে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন—আলাপ করিয়ে দিই। জয়ন্ত চৌধুরি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক।

রমা একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন—জানি। আপনাদের দুজনই আমার পরিচিত।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে বললেন—কী করে?

—দুর্গাপুরে থাকার সময় আমি দৈনিক সত্যসেবক পড়তাম। এখানে এসে কাগজ পড়ার অভ্যাস চলে গেছে।

কর্নেল হাসলেন।—জয়ন্ত! তোমার একজন পাঠিকার দর্শন পেলে! চলে এস এখানে। রমা একটু ইতস্তত করে বললেন—আমার কিছু কথা আছে। এক মিনিট। সিঁড়ির নিচের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

রমা বেরিয়ে তেমনই নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। কর্নেলের দিকে তাকালাম। দেখলাম বৃদ্ধ রহস্যভেদী টাকে হাত বুলোচ্ছেন। চোখ বন্ধ।

এ ঘরটার সঙ্গে দোতলার কোনও ঘরের সম্পর্ক নেই। দক্ষিণে ছোট্ট ব্যালকনি, পশ্চিমে দুটো বড়ো জানালার নিচে সেই জংলি ফুলবাগান, উত্তরে দরজার পর কাঠের সিঁড়ি এবং পুবদিকটায় নিরেট দেয়াল। সেদিকেই বাড়ির দরজা বা জানালা আছে কি না কে জানে।

রমা এসে উত্তরের দরজাটাও বন্ধ করে একটা চেয়ারে বসলেন। ঘরের দুধারে

দুটো সিঙ্গল খাট। একটায় আমি বসলাম। কর্নেল চোখ খুলে বললেন—তুমি গত রাতে কমলেশ আর নন্দকে বাগানের দিকে যেতে দেখেছিলে?

রমা চাপাস্বরে বললেন—হ্যাঁ। তবে শুধু গতরাতে নয়, দশমীর রাতেও দেখেছিলাম।

—ওদের কাকেও জিজ্ঞেস করোনি সে সম্পর্কে?

—নন্দকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও বলেছিল, 'জামাইবাবু নদীর ধারে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। আমিও গেলাম।' ওদিকে একটা দরজা আছে। নদীর ধারে যাওয়া যায়। বাঁধানো একটা ঘাট আছে। রমা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন—গতরাতে টিংকুর বাবা বাড়ি ফিরল না। খবরও পাঠায়নি। তাই ঘর-বার করছিলাম। তো জানালা দিয়ে দেখি, দুজনে বাগানের দিকে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম, খিড়কি দিয়ে নদীর ঘাটে বেড়াতে যাচ্ছে।

—তোমার শ্বশুরমশাইয়ের কোনও সাড়া পাচ্ছিলে?

—নাহ্। কদিন থেকে ওঁকে ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে দিই। উনি ঘুমিয়ে পড়েন।

—কমলেশ তো ওঁর পাশের ঘরে শোয়।

—হ্যাঁ। বাবামশাইয়ের ঘর থেকে ওর ঘরে যাওয়া যায়। আমার ননদ বেঁচে থাকার সময় ওরা দোতলায় থাকত। শেষের দিকে ঝগড়াঝাঁটিতে অতিষ্ঠ হয়ে জামাইবাবু নিচের ওই ঘরে এসে শুত।

—সেইসময় ব্রোঞ্জের সিল চুরি যায়?

—হ্যাঁ। বাবা বলছেন সিল চুরি যাওয়ার কথা। আমি ও-ঘরে তেমন কিছু দেখিনি।

—কিছু মনে কোরো না। তোমার এডুকেশন?

পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে য়ুনিভার্সিটিতে পড়ছিলাম। হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। তারপর একটার পর একটা বিপদ। মামাবাবু দুর্গাপুরে ইঞ্জিনিয়ার। বিয়ে লাগিয়ে দিলেন।

—গতরাতে তুমি কমলেশ আর নন্দকে বাগানে যেতে দেখেছিলে। তখন কটা বাজে?

ঘড়ি দেখিনি। তবে এগারোটা হবে। রমা গলার স্বর আরও নামিয়ে বললেন—পুলিশকে যেটা বলিনি, আপনাকে বলছি। আমার ঘুম আসছিল না। টিংকুর বাবা ফিরলে ফটকের ওদিকে হর্ন বাজাবে। তখন নন্দ যদি ঘুমিয়ে পড়ে, ফটক কে খুলবে ভেবে জেগে ছিলাম। তারপর লোডশেডিং হয়ে গেল। হেরিকেন জ্বেলে দম কমিয়ে জানালার কাছে গেলাম। বাইরে পরিষ্কার জ্যোৎস্না। হঠাৎ দেখি, জামাইবাবু পালিয়ে আসার মতো ছুটে আসছে। তারপর ওঁর ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনলাম।

—গিয়ে খোঁজ নিলে না কেন?

রমা চুপচাপ কিছুক্ষণ আঙুল খুঁটে মুখ তুললেন। ছোট্ট শ্বাস ছেড়ে বললেন—তখন জামাইবাবু যে পালিয়ে আসার মতো ছুটে আসছে, সেটা কিন্তু তত মনে হয়নি। মানে, গুরুত্ব দিইনি। হয়তো তাড়াতাড়ি ফিরছেন। তবু একবার মনে হয়েছিল, বেশ জোরেই আসছেন—ব্যাপারটা যেন একটু অস্বাভাবিকও। কিন্তু ভোরে নন্দের সাড়া না পেয়ে ওর ঘরে গিয়ে দেখি, দরজা বাইরে থেকে আটকানো। ভেতরে সে নেই।

খাটিয়ায় বিছানা গুটোনো। তখন ভাবলাম বাথরুম করতে বেরিয়েছে। সাতটা বাজল। তখনও পাত্তা নেই ওর। টিংকুর জেঠুকে চা দিতে গিয়ে কথাটা বললাম। উনি গ্রাহ্য করলেন না। বাবামশাইকে চা দিয়ে এলাম। দেখলাম, আজ একটু যেন স্বাভাবিক হাবভাব। জামাইবাবুর দরজায় টোকা দিলাম। বাবামশাই বললেন—ঘুমোক। ওকে ডিসটার্ব কোরো না। সাড়ে সাতটায় টিংকুর বাবা এল। বলল, কী সব ধান-টান পেকেছে। চোরের উপদ্রব। আমার ধারণা—

রমা হঠাৎ চুপ করলে কর্নেল বললেন—হুঁ, বলো!

—ড্রাংক হয়ে পড়েছিল। রমা একটু ফুঁসে উঠলেন।—ওই দুলালদাকে দেখছেন, সে-ও একই দলের লোক। সে-ও গতরাতে বাড়ি ফেরেনি।

—নন্দের বডি কখন দেখতে পেলে তোমরা?

—লক্ষ্মী নামে একটা মেয়ে এসে সারাদিন কাজ করে। সন্ধ্যার আগেই বাড়ি চলে যায়। ও আসে সকাল আটটা নাগাদ। আজ ফটকে ঢুকেই নাকি বাগানের দিকে তাকিয়েছিল। আসলে ওর ব্যাপারটা বুঝি। আমার ননদ স্যুইসাইড করার পর থেকে ওর চোখ সবসময় বাগানের দিকে থাকে। সন্ধ্যার আগেই কেটে পড়ে। বুঝতেই পারছেন, প্রচণ্ড সুপারস্টিশন ওদের। কতদিন বানিয়ে বলেছে আমাকে, আমগাছটার তলায় নাকি দিনদুপুরে একটা মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। আজও ওর কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু লক্ষ্মী কান্নাকাটি করে বলতে লাগল। টিংকুর জ্যাঠা বললেন, দেখাই যাক না অমন করে বলছে যখন।

—সোমদেববাবু গিয়ে দেখতে পেলেন?

হ্যাঁ। টিংকুর বাবাও দৌড়ে গেল। আমি দূর থেকে একটু দেখেই চলে এলাম। ওঃ!

রমা শিউরে ওঠার ভঙ্গি করলেন। কর্নেল বললেন—তখন কমলেশ কোথায় ছিল?

—ঘরে ছিল না। আমরা অবশ্য কেউই লক্ষ্য করিনি। পুলিশ এসে বডি নিয়ে গেল। তখনও ওকে দেখিনি। দুলালদা এসে বলল, বাজারে একটা স্টেশনারি দোকানে বসে আছে। ঘণ্টাদুই পরে আবার পুলিশ এল। তখন শুনলাম, ডাক্তার পিঠে ইঞ্জেক্শনের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। পুলিশ হলঘরে প্রত্যেককে আলাদা ডেকে জেরা করল। আমি জামাইবাবুর সঙ্গে নন্দের যাওয়ার কথাটা শুধু বললাম। ওর পালিয়ে আসার ব্যাপারটা বললাম না। রমার চোখে জল এসে গেল। মুখ নামিয়ে বললেন—ওর জন্য আমার কষ্ট হত। এখনও হচ্ছে। আমার ধারণা, কমলেশ কখনও নন্দকে মার্ডার করেনি। তা ছাড়া ও রোগী মানুষ। নন্দকে গাছের ডালে ঝোলানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি বললাম—সঙ্গে লোকজন থাকতে পারে!

রমা জোর দিয়ে বললেন—নন্দকে কেন মারবে জামাইবাবু? তা ছাড়া আমি এখন সিওর, আমার ননদকেও একইভাবে কেউ মেরে গাছে ঝুলিয়েছিল। এ একই লোকের কাজ।

কর্নেল বললেন—সে কে হতে পারে?

—জানি না। আপনি খুঁজে বের করুন। আমি জানি, আপনি তা পারবেন।

—পারমিতার ডেডবডি কে প্রথম দেখতে পেয়েছিল?

—জামাইবাবু। ও মাঝেমাঝে বাগানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকত।

—নন্দকে কেন মারা হল বলে তোমার ধারণা?

একটু চুপ করে থেকে রমা খুব আস্তে বললেন—নন্দ হয়তো টের পেয়েছিল কে টিংকুর পিসিকে মেরে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে। তাই তার মুখ বন্ধ করা হল।

—পারুকে কেন মারা হয়েছে? মানে, তোমার কী ধারণা?

—আমি কথাটা ভেবেছি। কোনও উত্তর খুঁজে পাইনি। তবে...

—তবে?

—জামাইবাবু হয়তো জানে। না জানলেও ওর একটা আইডিয়া থাকতে পারে। কারণ পারুর মৃত্যুর পর একদিন কথায়-কথায় আমাকে বলেছিল, পারু আর যা-ই করুক, মরার ইচ্ছে ওর ছিল না। অথচ ওকে মরতে হল। এটাই কি নিয়তি বউদি? জামাইবাবু আমাকে বউদি বলে।

—তুমি কী বলেছিলে ওকে?

—কী বলব? আসলে তখন ওসব কথার আলাদা কোনও মানে তো খুঁজিনি। জাস্ট কথা। এখন মানে খুঁজে পাচ্ছি।

—পারুর মৃত্যুতে তোমার শ্বশুরমশাইয়ের কী রিঅ্যাকশন হয়েছিল?

—প্রচণ্ড শক পেয়েছিলেন। চুপচাপ বসে থাকতেন। সেই প্রথম পাগলামির লক্ষণ শুরু হল। আমার ধারণা, সিল চুরি ওঁর ইমাজিনেশন। লোকাল ডাক্তার বলেছেন, সিজোফ্রেনিয়া। তাই টিংকুর জেঠু সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিলেন।

কর্নেল এতক্ষণে চুরুটের কেস থেকে একটা চুরুট বের করে ধরালেন। তারপর বললেন—আমি এখনও বুঝতে পারছি না কেন সাইকিয়াট্রিস্ট ডঃ ঘোষ সোমদেববাবুকে আমার কাছে পাঠালেন। আচ্ছা, তুমি কি জানো ডঃ ঘোষ এখানকার লোক?

—শুনেছি।

কর্নেল চোখ বুজে বললেন—পারুর অমতে কমলেশের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। জানো কি?

—হুঁ।

—অমতের কোনও বিশেষ কারণ ছিল?

রমা মুখ নামিয়ে আস্তে বললেন—কাঞ্চন নামে একটা ছেলের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল। ছেলেটাকে আমি বার দু-তিন দেখেছি। মস্তানটাইপ বাজে ছেলে। হাফ এডুকেটেড। তবে ওর বাবার বড় বিজনেস আছে ট্রান্সপোর্টের। কলকাতার একটা মেয়েকে এলোপ করে এনেছিল। পুলিশকেস হয়েছিল। মিটে গেছে শুনেছি।

—মেয়েটি?

—এখন ওর বউ। কাঞ্চনের বাবা মেনে নিয়েছেন।

—তোমাদের শ্বশুরমশাই সিল হারানোর ব্যাপারে নাকি বলেন, 'পারু সব জানে। তাকে ডাকো।'

—হ্যাঁ। প্রায়ই বলেন। উনি বিশ্বাস করেন না পারু মারা গেছে।

আমি বললাম—কিন্তু সোমদেববাবু বলছিলেন, পারুর একটা নিজের হাতে লেখা স্যুইসাইডাল নোট পাওয়া গিয়েছিল?

রমা আমার দিকে তাকালেন। একটু পরে বললেন—সেই কথাটাই কর্নেলসায়েবকে গোপনে বলতে চাই। আমি পারুর হাতের লেখা চিনি। ও লেখা পারুর হাতের লেখার মতো। কিন্তু কিছুতেই পারুর নয়।

কর্নেল বললেন—নয় বলছ?

—নাহ্। লোকাল পুলিশের ব্যাপার তো জানেন। তাড়াহুড়ো করে সব হাশ আপ করতে চায়।

—তুমি এ কথা কাকেও বলেছিলে?

—টিংকুর বাবাকে বলেছিলাম। বিশ্বাস করেনি।

—আর কাকেও?

—নাহ্। টিংকুর বাবা নিষেধ করেছিল। বাড়িতে অশান্তি শুরু হত।

—চিঠিটা কোথায় আছে জানো?

—পুলিশ নিয়ে গিয়েছিল।

—পুলিশ পারুর লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেনি ওটা?

—জানি না। রমা উঠে দাঁড়ালেন।—আপনি খুব কফির ভক্ত জানি। জয়ন্তবাবুর ফিচারে পড়েছি। কফি পাঠিয়ে দিই।

কর্নেল হাসলেন।—দিতে পারো। তো একটা কথা। এই যে তুমি নিচের দরজা বন্ধ করে আমার সঙ্গে কথা বললে, এত সতর্কতার কি বিশেষ কোনও কারণ আছে?

—দুলালদার খুব আড়িপাতার অভ্যাস আছে। তা ছাড়া আমি...একটু ইতস্তত করে রমা খুব আস্তে বললেন—টিংকুর জেঠু সম্পর্কে সিওর নই। মানে, ওঁর হাবভাব চালচলন আমার কেমন অস্বাভাবিক লাগে। উনি থিয়েটারের লোক। কখন অভিনয় করছেন, কখন করছেন না, আমি বুঝতে পারি না।

—আর দুটোমাত্র প্রশ্ন করব তোমাকে।

—করুন না!

—তোমার স্বামী কোন ডিপার্টে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন?

—ইরিগেশন।

—হঠাৎ চাকরি ছেড়ে এখানে এসে চাষবাসে মেতে উঠলেন কেন জানো?

—বাবামশাই চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, টিংকুর জেঠু দুলালদাকে দিয়ে চাষ করাচ্ছেন। বর্গাদারের নাম বসানো ঠেকানো গেছে বটে; কিন্তু ওঁর সন্দেহ, ভেতরে-ভেতরে কিছু জমিও বেচে দিয়েছেন। 'এজমালি প্রপার্টি' না কী বলে যেন। বন্টন হওয়ার আগে এভাবে কোনও শরিক নাকি আইনত জমি বেচতে পারে না। তা ছাড়া মেজভাসুরের

অংশও তো আছে। টিংকুর বাবার কাছে শুনেছি, ওর ঠাকুরদার উইলে তিরিশ এক লেখা আছে। সেটা ঠেকেছে পঁচিশ একরে। তবে ভাইদের মধ্যে বনিবনা আছে টিংকুর বাবা দাদার বিরুদ্ধে কিছু বলেনি।

—এই বাড়িটা তোমার শ্বশুরমশাইয়ের নামে দেওয়া আছে?

রমা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বললেন—যত গণ্ডগোল এই বাড়ি। বাবামশাই না মাস তিনেক আগে আমার ননদ আর জামাইবাবুর নামে এই বাড়ি উইল করে দিয়েছেন সত্যিমিথ্যা জানি না। টিংকুর বাবা কার কাছে শুনেছিল। তবে এনিয়ে প্রকাশ্যে কোন অশান্তি হয়নি। বাবামশাইকে দুই ছেলেই এ নিয়ে চার্জ করেনি। করলে জানতে পারতাম আপনি যেন দয়া করে এ ব্যাপারে আমার নাম করবেন না। তা হলে...

কর্নেল হাত তুলে ঋষিসুলভ বরাভয়ের ভঙ্গিতে বললেন—হুঁ, কফি।

রমা চলে গেলেন। একটু পরে আমি বললাম—দ্য মিস্ট্রি ইজ সলভ্‌ড্‌, বস!

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—কী ভাবে?

সোজা হিসেব। এতবড় একটা বাড়ি। চারদিকে বিশাল জায়গা। নির্ঘাত কয়ে লাখ টাকার সম্পত্তি। আজকাল মানুষের যা ব্যাপার-স্যাপার, ভাই-বোন রক্তের সম্পর্কে চেয়ে প্রপার্টির মূল্য অনেক বেশি। দুই ভাই মিলে চক্রান্ত করে বোনকে মেরে বোনে স্বামীকে ফাঁসানোর জন্য শেষে নন্দকে মেরেছে। নন্দ নিশ্চয় ব্যাপারটা জানত। তারপর এই ভদ্রমহিলাকে দিয়ে গত রাতের গল্পটা সাজিয়েছে। মেয়েরা জন্ম অভিনেত্রী। সোজা ব্যাপার।

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন।—সোজা ব্যাপার আর রইল না ডার্লিং! রহস্য বরং আরও জটিল হল।

কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হচ্ছিল। তাই চুপ করে গেলাম। শান্তিদেব এলেন এবার।...

## ॥ তিন ॥

শান্তিদেব বললেন—ফার্মে গিয়েছিলাম। আজকাল চোরের বড় উপদ্রব। এক জাতের হাই-ইল্ডিং ভ্যারাইটির ধান বেমরশুমে ফলে। কাঁটাতারের বেড়া কেটে চোর ঢুকেছিল পরশুরাতে। বলছি বটে চোর, ব্যাপারটা ঈর্ষাজনিত শত্রুতা। যাইহোক, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনাদের?

কর্নেল বললেন—একটুও না। আপনার স্ত্রী আমার ফ্যান। জানেন কি?

—জানি মানে? শান্তিদেব হাসলেন। বড়দা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাচ্ছে শুনে রমাই আমাকে আপনার কথা সাজেস্ট করল। সমস্ত ব্যাপারটা মিসটিরিয়াস—আঃ মিন, সিল চুরি এবং বাবার অদ্ভুত পাগলামি। তো দুজনে কনসাল্ট করে বড়দা রওন হওয়ার আগেই আমি ডাঃ ঘোষকে ট্রাঙ্ককল করে অনুরোধ করলাম, বড়দা গেলে উনি যেন তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেন। ফোনগাইডে নিশ্চয়ই আপনার ঠিকানা পাওয়া যাবে, সে-কথাও বললাম।

—আই সি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে দেখুন, তারপর মিস্ট্রিটা সাংঘাতিক জটিল হয়েও গেল। াপনি আসছেন, এদিকে নন্দ মার্ডার হয়ে গেল। রমা ইজ ইনটেলিজেন্ট। মেয়েদের া সত্যিই অন্য একরকম ইনটুইশন আছে, আই বিলিভ ইট।

—আপনার স্ত্রীর বিশ্বাস, তার ননদকেও কেউ একইভাবে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

শান্তিদেব গোঁফ চুলকে একটু দ্বিধার সঙ্গে বললেন—এখন আমাদেরও তা-ই মনে চ্ছে। কমলেশকে সন্দেহ করা ছাড়া কোনও উপায় থাকছে না। আরও বড় কথা, মলেশকে লোকাল পলিটিক্যাল পার্টির এক মাতব্বর মানিক চ্যাটার্জি ডিফেন্ড করার ন্য উঠেপড়ে লেগেছে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, কমলেশের পেছনে দলবল আছে। ড়ি গাছে ঝোলানোর মতো লোকের অভাব থাকছে না তা হলে। বলুন, পয়েন্টটা কারেক্ট কি না?

কর্নেল আস্তে বললেন—হুঁ। দ্যাটস পসিব্‌ল্‌।

শান্তিদেব জোর দিয়ে বললেন—রিলায়েব্‌ল্‌ সোর্সে জেনেছি, বাবা পারু এবং কমলেশের নামে এই বাড়ি সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তিসহ উইল করে রেখেছেন। শর্ত হল, বাড়িটা মিউজিয়াম হবে এবং একাংশে ওরা দুজনে বসবাস করতে পারবে। কমলেশ হবে মিউজিয়ামের কিউরেটর ইত্যাদি। এদিকে মানিক চ্যাটার্জিরাও এটা চাইছিল অনেকদিন থেকে। বাবাকে ওরাই তাতিয়েছে বরাবর। সো কমলেশের মোটিভ ইজ ক্লিয়ার।

—আপনার স্ত্রীর মতে, স্যুইসাইডাল নোটের লেখা আপনার বোনের নয়।

শান্তিদেব নড়ে বসলেন।—হ্যাঁ। রমা আমাকে বলেছিল কথাটা। আমি পাত্তা দিইনি। কারণ পারু হিস্টেরিক টাইপ মেয়ে। ওর বিয়েটা বাবা জোর করেই দিয়েছিলেন বলা যায়। বড়দা তো থিয়েটারপাগল মানুষ। ইন্টারফেয়ার করেনি। আমি তখন দুর্গাপুরে। এনিওয়ে, স্যুইসাইড করার আগে হাতের লেখা অন্তত পারুর মতো মেয়ের পক্ষে একটু অন্যরকম হতেই পারে। তাড়াহুড়ো করে লেখা আঁকাবাঁকা হরফ।

আমি বললাম—মর্গের ডাক্তারের কোনও সন্দেহ হয়নি, এটা অবাক লাগছে।

শান্তিদেব একটু চুপ করে থেকে বললেন—মফস্বলের মর্গের অবস্থা আপনি জানেন না। ডোমই বডি কাটাছেঁড়া করে। ডাক্তার দায়সারাভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। স্যুইসাইড না হোমিসাইড! তো নতুন ডাক্তার ভদ্রলোক ইয়ংম্যান। ভেরি পার্টিকুলার সব ব্যাপারে। আলাপ করে মনে হল, ডাক্তারিটা চাকরি হিসেবে নেননি এবং প্রফেশনের ব্যাপারে হি ইজ অ্যামবিশাস।

কর্নেল বললেন—আপনার দাদা বলছিলেন, বাবা পাগল হয়ে গেলে আপনারা নাকি ভেসে যাবেন। হোয়াটস দ্যাট?

শান্তিদেব গম্ভীর হয়ে বললেন—দাদা বলেছে আপনাকে?

—হ্যাঁ।

শান্তিদেবকে বিস্মিত দেখাচ্ছিল। বললেন—কেন এ কথা দাদা বলেছে বুঝতে

পারছি না। ঠাকুর্দা অতসব ধানী জমি আমাদের তিন ভাই-বোনকে দিয়ে গেছে রন্তুদা সম্ভবত অ্যামেরিকায় থেকে যাবে। পারু বেঁচে নেই। কাজেই সব জমি আর আমার হাফ হাফ শেয়ার। ভেসে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি বললাম—তা হলে হয়তো এই বাড়ির ব্যাপারেই কথা বলেছেন আপ দাদা।

শান্তিদেব আমার দিকে তাকালেন।—বাবার উইলের ব্যাপারটা নিয়ে দাদার স আলোচনা করেছিলাম। বাবা পাগল হয়ে গেলে তো উইলের এগেনস্টে স্ট্রং লিগা অপজিশন দাঁড় করানো সহজ হবে। শান্তিদেব মাথা দোলালেন।—থিয়েটারের নে দাদার মাথাটা খেয়েছে। কী বলতে কী বলেন। জানেন? আমাদের বংশটাই বাতিকগ্রস্ত কেউ ছিলেন গাছপাগলা। কেউ ধর্মপাগল। কেউ সর্বস্বান্ত হয়ে সমাজসেবী। এদি বাবা আর্কিওলজিপাগল। দাদা থিয়েটারপাগল। আর আমি হলাম চাষপাগল।

শান্তিদেব হেসে ফেললেন। সিঁড়িতে শব্দ হচ্ছিল। দুলালবাবু আরেকবার কফি নি এলেন। শান্তিদেব বললেন—তুমি এখনও ফার্মে যাওনি?

দুলালবাবু বললেন—যাচ্ছিলাম। বউদি বললেন স্যারদের কফি দিয়ে যেতে।

—শিগগির চলে যাও। দেরি কোরো না। রমা আমাকে বললেই পারত।

দুলালবাবু চলে গেলেন। কর্নেল বললেন—আপনি গতরাতে ফার্মে ছিলেন?

—হ্যাঁ। নিজে না থাকলে চলে না—আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন। আ রাত্রেও থাকার কথা ছিল। রমা নিষেধ করল। আপনারা এসেছেন। দাদা এইমা থিয়েটারক্লাবে চলে গেল। বড্ড ইরেসপনসিবল টাইপ।

—আপনার বাবা এখন কী করছেন?

—দরজা বন্ধ আছে দেখে এলাম। বাবার যা কাজ! মিউজিয়ামের জিনিসপত্র নাড়াঘাঁট কিংবা একটা ভাঙাচোরা পুতুল হাতে নিয়ে তাকিয়ে থাকা আর বিড়বিড় করে প্রলা বকা।

—কমলেশবাবুকে খুঁজছেন না, খোঁজেননি আজ?

—খুঁজছিলেন নাকি। রমা বলেছে, কলকাতা গেছে। বাবার সঙ্গে এখন দে করবেন?

—কোনও অসুবিধে না হলে...

—রমা ক্যান ম্যানেজ ইট। কফি খেয়ে নিন। রমাকে বলছি।

শান্তিদেব চলে গেলেন। কফি খেতে ইচ্ছে করছিল না। আসলে এ কফি কর্নেলে বাড়ির পারকোলেটারে তৈরি নির্ভেজাল কফি নয়। বাজারচলতি গুঁড়ো কফি। বি কর্নেলের কাছে 'কফি' নামটাই যথেষ্ট। তারিয়ে-তারিয়ে খেতে খেতে বললেন—খাস

বাইরের দিকে তাকিয়ে বললাম—তার চেয়ে খাসা জিনিস আপনার মাদারনে ঝুলিয়ে দিয়েছে আকাশে। একেবারে ঢাকাই পরোটা।

—ডার্লিং! নদীর শিয়রে চাঁদ প্রকৃতির এক অলৌকিক উপহার। ঢাকাই পরে নিছক লৌকিক জিনিস। খেতেও আহামরি নয়। কর্নেল কফির জাগ হাতে ব্যালকনি গেলেন।

আমিও গেলাম। গিয়েই চোখ পড়ল বাগানের গাঢ় ছায়ার ভেতর টর্চের আলো। লোটা যেন সাবধানী। নিচে কয়েকবার কয়েকটি ছোট্ট আলোর বৃত্ত গড়ে নিভে ল। বললাম—ওখানে কে কী করছে এখন?

কর্নেল কোনও জবাব দিলেন না।

—শান্তিদেববাবু নাকি?

কর্নেল তবুও চুপ করে রইলেন।

—একটু বিরক্ত হয়ে বললাম—ব্যাপারটা মিসটিরিয়াস কিন্তু!

—হুঁ!

কী আশ্চর্য! ওই ভুতুড়ে জঙ্গলে আলো দেখে আপনার কিছু মনে হচ্ছে না?

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন—যতদূর জানি, ভূতেরা টর্চ ব্যবহার করে া।

—আহা, আমি তা বলছি না।

এবার নিচে বাঁদিকে পোর্টিকোর তলা থেকে জোরালো টর্চের আলো দেখা গেল। াড়ির বাইরে কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। ঘাসেভরা লনের ওপর জ্যোৎস্নায় এতক্ষণে াকটা মূর্তি বেরিয়ে এল। আলো ফেলতে ফেলতে সে জঙ্গলে বাগানের দিকে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল। লোকটাকে চিনতে পারলাম। শান্তিদেব!

একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটতে চলেছে ভেবে বললাম—কর্নেল। আমাদেরও যাওয়া চিত। শান্তিদেববাবু বিপদে পড়তে পারেন। নিশ্চয় কোনও আউটসাইডারকে তাড়া রতে গেলেন উনি।

কর্নেল ঘরে গেলেন। কফির পাত্র রেখে চুরুট ধরিয়ে চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসলেন। খে নির্বিকার ভাব।

ঘরে ঢুকে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর দেখি, বৃদ্ধ রহস্যভেদী দাড়িতে াত বুলোচ্ছেন। চোখদুটি বন্ধ। এমন অবস্থায় কী আর করা যাবে, হতাশভাবে বসে াড়লাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজায় রমাকে দেখা গেল। আশ্চর্য ব্যাপার! ভদ্রমহিলা এমন নঃশব্দে চলাফেরা করতে পারেন। পুরনো কাঠের সিঁড়িকেও ওঁর পা চুপ করিয়ে াখে কী কৌশলে? তারপর ওঁর পায়ের দিকে চোখ পড়ল। খালি পায়ে হাঁটেন দখছি। তাই এমন নিঃশব্দ চলাফেরা।

রমা আস্তে বললেন—বাবামশাইয়ের অদ্ভুত ব্যাপার। কখন বেরিয়ে বাগানে ঢুকছিলেন, াক্ষ করিনি। টিংকুর বাবা ধরে নিয়ে এল।

কর্নেল তাকালেন।

—আপনি কথা বলবেন বলেছেন। আসুন। একটু স্বাভাবিক মনে হচ্ছে এখন।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমার কী পরিচয় দিয়েছেন ওঁকে?

রমা একটু আড়ষ্ট হেসে বললেন—আমি বললাম আরকিওলজিস্ট। কাগজে আপনার াবিষ্কারের খবর পড়ে আলাপ করতে এসেছেন। শুনে বাবামশাই বললেন, আর্কিওলজি

ব্যাপারটাই গোড়ার দিকে মিলিটারি অফিসারদের একচেটিয়া ছিল। ওঁরাই সাই
এক্সক্যাভেশন, ফিল্ডরিসার্চ করতেন। ওঁকে নিয়ে এস।

সিঁড়িতে নামতে নামতে বললাম—বাগানে উনি কী করতে গিয়েছিলেন?

—হঠৎ নাকি ওঁর ভয় হয়েছিল পারুর মতো কমলেশও স্যুইসাইড্ করেছে। তা
তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। আমরা নাকি বানিয়ে বলেছি, কলকাতা গেছে। টিংকু
বাবা জোর করে নিয়ে এল বাগান থেকে। আসছিলেন না। তখন আপনার আসা
কথা বলেছেন। অমনি উনি ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠেছেন।

নিচের ঘরে নেমে কর্নেল হঠাৎ বললেন—তোমার ভাসুরমশাইয়ের হাতে সবসম
ছড়ি থাকে কেন জানো?

রমা যেন একটু চমকে উঠলেন।—জানি না। তবে প্রায় মাসখানেক থেকে দেখ
ছড়িটা। খাওয়ার টেবিলেও সঙ্গে থাকে। হলঘরে গিয়ে রমা অন্যমনস্কভা
বললেন—এবাড়ির যা অবস্থা, প্রায় সাপ বেরোয়। নন্দ একটা কেউটে মেরেছি
বর্ষার সময়। হয়তো সাপের ভয়েই উনি ছড়ি হাতের কাছে রাখেন। মানুষটা এক
ভিতুও।

হলঘরের ভেতরে একটা দরজা দিয়ে রমা আমাদের যেখানে নিয়ে এলেন, সেখানে
দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। পাশে সংকীর্ণ করিডর। ডানদিকের দরজায় পর্দা ঝুলছে। ভেতরে
উজ্জ্বল আলো। রমা পর্দা ফাঁক করে বললেন—বাবামশাই! কর্নেলসায়েব এসেছেন।

রুগ্ণ এবং ফ্যাসফেঁসে গলায় সাড়া এল—স্বাগতম! সুস্বাগতম!

কর্নেল আগে ঢুকলেন। তাঁর পেছনে আমি। ঘরটা বিশাল। প্রথমেই চোখে পড়
এলোমেলো পাথর। আবর্জনার ডাঁই। দেয়াল ঘেঁসে দাঁড় করানো সারিবন্দি আলমারিতে
জরাজীর্ণ বই ঠাসা। আলমারিগুলোর মাথায় পাথর আর পোড়ামাটির ভাঙাচোরা অসংখ্য
মূর্তি। বিবর্ণ তৈজসপত্র। এক কোনায় প্রকাণ্ড একটা সেকেলে খাট। খাটের পাশে
একটা টেবিলের ওপর হাতখানেক উঁচুতে আলাদা একটা জ্বলন্ত শেড-ল্যাম্প ঝুলছে।
টেবিল জুড়ে ভাঙাচোরা খেলনাপাতির মতো জিনিস। চশমার খাপ। একগাদা কলম।
হোমিওপ্যাথিক বাকসোর মতো একটা বাকসো পর্যন্ত। খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন
অবিকল সোমদেববাবুর বৃদ্ধ এক প্রতিমূর্তি। সন্ন্যাসীদের মত লম্বা চুল, পেল্লায় গোঁফ—সবই
সাদা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়ে আছে মুখে। এক হাতে একটা আতসকাচ, অন্যহাতে
একটা কালচে চাকতি। মনে মনে ভাবলাম, এ যে দেখছি কর্নেলেরই দোসর!

কর্নেল করজোড়ে নমস্কার করে কাছে গেলে জয়দেববাবু উঠে দাঁড়িয়ে ওঁর দু'টো
হাত চেপে ধরলেন। কর্নেলের মতোই মাথায় উঁচু। কিন্তু শীর্ণ আর একটু কুঁজো।
বললেন—আমার এই মিউজিয়ামে বিশ্বের বড়-বড় পণ্ডিতের পায়ের ধুলো পড়েছে।
রন্তু! আমার মধ্যম পুত্র। আমেরিকায় থাকে। তার কাছে খোঁজ পেয়ে সব চলে আসেন।
এই তো এক জার্মান সায়েব—মাথার চুল আঁকড়ে ধরে সম্ভবত নামটা স্মরণের চেষ্টা
করলেন।

কর্নেল বললেন—গ্যাঙ্গলার?

—গ্যাম্বলার! চেনেন আপনি?

রমা বললেন—বাবামশাই, এঁদের বসতে বলুন।

জয়দেব বললেন—আপনি কী যেন...

কর্নেল বললেন—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। এর নাম জয়ন্ত চৌধুরি। সাংবাদিক।

—কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! হাসলেন জয়দেব। দাঁতগুলো বাঁধানো মনে হল। আমরা টেবিলের পাশে রাখা দুটো গদিআঁটা চেয়ারে বসলে ফের বললেন—ওরা র বিরক্ত হয়। আমি বলি, মধু থাকলে মৌমাছি আসবেই। পালসাম্রাজ্যের স্মৃতিপিণ্ড! চক্ষে দর্শন করুন। বাট আই হ্যাভ ডিসকভার্ড মোর দ্যান দ্যাট।

বলে লম্বা হাত ছড়িয়ে পাথুরে আবর্জনার দিকটা দেখালেন জয়দেব। কর্নেল লেন—খরোষ্ঠীলিপির সিল?

—ইয়েস! আরও দেখাচ্ছি! জয়দেব এগিয়ে আলমারির পাশে রাখা একটা কালো লসি নিয়ে এলেন—পালপুকুর খোঁড়ার সময় এটা পাওয়া গেছে। এই দেখুন, খরোষ্ঠীতে লখা আছে—বলে চোখে চশমা পরলেন।—আমি পাঠোদ্ধার করেছি। 'ব্যাপয় কোশা' ার মানে সেচের পাত্র। 'কো'—টা মুছে গেছে। ওটা বোঝাই যায়। চলতি কথায় কাশা-কুশি বলি আমরা।

আমি না বলে পারলাম না—সেকালের লোকে কি জলের গ্লাসেও জলের গ্লাস লখত?

এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান আর্ট।

কর্নেল কী যেন ভাবছিলেন। আমি বললাম—এটা কত বছরের পুরনো?

জয়দেব বললেন—প্রায় দু'হাজার বছরের। খরোষ্ঠীলিপির যুগ! মাইন্ড দ্যাট।

—পুকুরের তলায় পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ। জয়দেব সস্নেহে পাত্রটার গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন।

—এটা মাটির তৈরি?

—হ্যাঁঃ।

—দু'হাজার বছরের মাটির কলসি পুকুরের তলায় এমন আস্ত থেকে গেছে?

জয়দেবের চোখদুটো জ্বলে উঠেছিল। দ্রুত কর্নেল বললেন—এটা সাংবাদিক সম্মেলন য়, জয়ন্ত! তাছাড়া আর্কিওলজির ছাত্রও তুমি ছিলে না। ওই লিপিই প্রমাণ দিচ্ছে—এনিওয়ে! জয়দেববাবু, আপনি এর আগেও নিশ্চয় সাংবাদিকদের পাল্লায় পড়েছেন?

জয়দেব খিক খিক করে হাসলেন।—পড়েছি। আই নো দেম ওয়েল। ইয়েস! আস্কস্ মি কোয়েশ্চনস্!

—আপনার মিউজিয়াম থেকে খরোষ্ঠীলিপির একটা ব্রোঞ্জ সিল হারিয়েছে শুনলাম?

জয়দেব কলসিটা টেবিলে সাবধানে রেখে চোখ থেকে চশমা খুললেন। হঠাৎ তাঁকে অত্যন্ত দুঃখিত মানুষ মনে হল, ফিসফিস করে বললেন—নন্দ! চোর! তেমনি ফিসফিস করে কথাটা উচ্চারণ করলেন জয়দেব—একের নম্বর চোর।

—নন্দ কি এবাড়ির সারভ্যান্ট?

—পারু, আমার মেয়ে পারু সব জানে। ওকে ডাকি।

জয়দেব ব্যস্তভাবে খাট থেকে উঠে দাঁড়ালে কর্নেল বললেন—আপনি বসুন। আমি আপনার মেয়ের কাছে জেনে নেব'খন।

জয়দেব বসলেন! হতাশভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন—তাকে পাচ্ছেন কোথায় আর? শি ইজ ডেড।

—তাই বুঝি?

—ডেড। বাট শি স্পিকস টু মি। এই তো গতরাতে...নাহ্। আপনি কর্নেল?

—হ্যাঁ। রিটায়ার্ড।

জয়দেবের মুখে সামান্য পাগলামির লক্ষণ ফুটে উঠল। বিড় বিড় করে বললেন—সিলটাতে লেখা ছিল 'য়েন্ন দাদভঃ'। প্রাকৃত ভাষা। সংস্কৃত করলে কথাটা হবে 'যেন দাদভঃ'। বাকি লেটারগুলো পড়তে বাকি ছিল...পালগড়! পালরাজারা বৌদ্ধ। বৌদ্ধরাই খরোষ্ঠীলিপি ব্যবহার করত। আর্লি প্রাকৃত ওয়াজ পালি।

—জয়দেববাবু!

—নন্দ সিল চুরি করবে কেন? ওটা নিয়ে কী করবে সে?

জয়দেববাবু একটু চুপ করে থাকার পর স্বাভাবিক হলেন। ফিসফিস করে বললেন—সায়েবকে বেচেছে। সায়েব—কী যেন নাম?

—গ্যান্সলার।

—গ্যান্সলার বলছিলেন মিউনিখ মিউজিয়াম পাকিস্তান থেকে একটা খরোষ্ঠী সিল কিনেছে ফর্টি থাউজ্যান্ড ডয়েটস মার্কে। স্মাগলিং র‍্যাকেটের থ্রু দিয়ে কিনেছে।

—নন্দ আজ কোথায় আছে জানেন?

—বউমা বলছিল, গতরাতে পালিয়ে গেছে। সোমুকে দিয়ে থানায় খবর দিয়েছি।

—আপনি ঘুম থেকে কখন ওঠেন?

—সাড়ে সাতটা। আগে ছটায় উঠতাম। ইদানীং কেন যেন ঘুম ভাঙে না।

—আজ সকালে বেরিয়েছিলেন?

—বেরিয়েছিলাম কি না জিজ্ঞেস করছেন? নাহ্। আর আমার বেরুনোর যো নেই। সব চুরি হয়ে যাবে। আর আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। বউমাকেও না। এই যে আপনারা বসে আছেন, আমি কিন্তু নজর রেখেছি।

জয়দেব ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন।

—সারাটা দিন কী করলেন ঘরে বসে?

একটা বাঁধানো মস্ত খাতা দেখিয়ে জয়দেব বললেন—মিউজিয়ামের প্রত্যেকটা জিনিসের তালিকা করেছি। আইটেম নাম্বার, ডেসক্রিপসন, আনুমানিক পিরিয়ড, প্লেস অব ডিসকভারি অ্যান্ড রিমার্কস! ফোর হানড্রেড থার্টি সেভেন পিসেস অব আর্কিওলজিক্যাল অবজেক্টস। মাইনাস ওয়ান—ওই ব্রোঞ্জ সিলটা।

—আপনার এই মিউজিয়ামে উত্তরাধিকারী কাকে ঠিক করেছেন?

—কমলেশ। আ ব্রিলিয়ান্ট বয়। আমার হাতে গড়া ছাত্র। আপনি জানেন আমি সারাজীবন শিক্ষকতা করেছি?

—শুনেছি। আপনি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। কমলেশবাবু আপনার জামাই, তা-ও শুনলাম।

জয়দেববাবু ফিস ফিস করে বললেন—আমার মেয়ে—জামাইয়ের নামে এই মিউজিয়ামসুদ্ধু গোটা বাড়িটা উইল করে রেখেছি।

—আপনার মেয়ে তো বেঁচে নেই।

—আত্মা অমর। শি স্পিক্স্ টু মি।

জয়দেববাবু পাঞ্জাবির একটা আস্তিনের ভেতর বাঁহাত ঢুকিয়ে বাহু চুলকোতে থাকলেন।

কর্নেল বললেন—আপনি কি কোনও ডাক্তারকে দিয়ে নিয়মিত চিকিৎসা করান?

জয়দেব বিকৃতসুরে বললেন—ওই যে নাড়ু ডাক্তার আছে। ইঞ্জেকশন দেয় মাসে একটা করে। চুলকোচ্ছে।

—অসুখটা কী?

—পালগড় মাউন্ড এক্সক্যাভেশন আমি নিজের খরচায় করিয়েছি, জানেন? কী কী করেছি শুনুন। জয়দেব বাঁধানো খাতাটার দিকে হাত বাড়ালেন।

কর্নেল ফের বললেন—আপনার অসুখটা কী?

—এক্সক্যাভেশন সাইটে সুপারভাইজ করছিলাম। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম।

—এনি সর্ট অব নার্ভাস ব্রেকডাউন?

—আই অ্যাম দ্য ম্যান অব স্ট্রং নার্ভ। পঁচাত্তর পেরিয়ে ছিয়াত্তরে পড়েছি। এখনও দৌড়ুতে পারি।

—ডাক্তারবাবু কি স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন?

ড্রয়ার থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করে দিলেন জয়দেব। —নাড়ুগোপাল মিত্তিরের চিত্তির! স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল। অঙ্কে আর সায়েন্সে গোল্লা পেত। কী করে যেন ডাক্তার হয়ে গেল!

প্রেসক্রিপশন দেখে কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। স্টেরয়েড। কিন্তু স্টেরয়েড বিপজ্জনক।

জয়দেব হাসলেন—আর নিই না ইঞ্জেকশন। নাড়ু এলেই দরজা আটকে দিই।

—আপনার বউমা ট্যাবলেট খাওয়ান রাত্রে?

—হ্যাঁ। ট্যাবলেটটা ভাল। ইনসমনিয়া সেরে গেছে।

—ওটা খাবেন। কিন্তু ইঞ্জেকশন আর নেবেন না।

বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। জয়দেব বললেন—চলে যাচ্ছেন? দেখার মত জিনিস দেখে যান।

—আমি আছি। সকালে দেখব'খন।

জয়দেব আমার উদ্দেশে বললেন—কাগজের লোক আপনি?

বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি কোন কাগজের?

—দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা।

—কী আশ্চর্য! এতক্ষণ বলবেন তো! আপনাদের কাগজই প্রথম আমার আবিষ্কারকে অনার দিয়েছিল। কাটিং দেখাচ্ছি।

রমা সম্ভবত বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘরে ঢুকে বললেন—সকালে দেখাবে। ওঁরা টায়ার্ড। কলকাতা থেকে একটু আগে এসেছেন।

জয়দেব কর্নেলের দু'হাত জড়িয়ে ধরে বললেন—আমার সৌভাগ্য! মেজর—

কর্নেল বললেন—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

—সরি! কর্নেল সায়েবকে ঠিকমতো যত্নআত্যি করো বউমা! রাতবিরেতে দরকার হলে পারু আছে। ডাকলেই সাড়া পাবেন। আত্মা অমর।...

হলঘরে গিয়ে রমা বললেন—আজ সকাল থেকেই বাবামশাই একেবারে নর্মাল। অন্যদিন কী অবস্থা করেন, সামলানো যায় না।

কর্নেল বললেন—অদ্ভুত ডাক্তার তো! এই বয়সে ওঁকে স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দিয়েছেন। কতগুলো দিয়েছেন এ পর্যন্ত?

—তিনটে।

—ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পিউলগুলো দেখেছিলে তুমি?

—না তো। ডাক্তারবাবু নিয়ে আসেন।

—অ্যাম্পিউল তো ফেলে দেবার কথা!

রমা অবাক হয়ে তাকাল।—আমি লক্ষ্য করিনি। হয় তো জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছেন।

কর্নেল বললেন—ডাক্তারবাবু শেষ ইঞ্জেকশন কবে দিয়েছেন?

—মহালয়ার দিন সন্ধ্যাবেলা।

—আগেও কি সন্ধ্যায় আসতেন ইঞ্জেকশন দিতে?

—হ্যাঁ। সারাদিন নাকি রোগীর ভিড়। তাই সন্ধ্যায় কল অ্যাটেন্ড করেন।

—ঠিক আছে। তোমাকে আর আসতে হবে না।

—আপনাদের খাবার ওপরে পাঠাব বরং! অ্যাটাচ্‌ড্ বাথ আছে। বেসিন আছে।

—ঠিক আছে বলে কর্নেল পা বাড়ালেন।—আমরা একটু বেরোচ্ছি এখন। সাড়ে নটার মধ্যে ফিরব। কোদালিয়া আমার চেনা জায়গা। আর শোন! হলঘরের দরজা বন্ধ করে দাও।...

## ॥ চার ॥

কর্নেল পোর্টিকো থেকে বেরিয়ে বাড়ির পুবদিকে ঘুরে ফটকের দিকে হাঁটছিলেন। কোথায় যাচ্ছেন, জিজ্ঞেস করলাম না। ওই পাগলবুড়োর এক দোষ। জিজ্ঞেস করলে কী জবাব পাব, সেটা অনিশ্চিত।

ঘরগুলোর মেঝে উঁচু। যেতে-যেতে একটা জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, শান্তিদেব

মেয়েকে নিয়ে পড়াতে বসেছেন। হঠাৎ মনে হল, এতটুকু মেয়ের এবাড়িতে দিন কাটে কী করে? একা স্কিপিং করে? এই নির্জন 'ক্ষুধিত পাষাণ' আর মাত্র চারজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক এখন। নন্দ বেঘোরে মারা পড়েছে। কমলেশবাবু পুলিশ হাজতে। জামিন পেলেও কি আর এবাড়িতে আসবেন ভদ্রলোক? কোন মুখে আসবেন?

একটা সাইকেল রিকশো ডাকলেন কর্নেল। বললেন—থানা।

রিকশোয় উঠে বললাম—পুলিশটুলিশের কাছে রাত্রিবেলায় যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে?

কর্নেল এত জোরে অট্টহাসি হাসলেন যে, রিকশোওয়ালা মুখ ঘোরাল।

বললাম—এতে হাসির কী আছে? রাতে পুলিশের মুড বদলে যায় দেখেছি। শিকারি বাঘের মতো হিংস্র হয়ে ওঠে। তাতে মফস্বলের পুলিশ।

কর্নেল চুপ করে থাকলেন। ঘিঞ্জি বাজার-এলাকা ছাড়িয়ে একটা চওড়া রাস্তায় রিকশোর গতি বাড়ল। রীতিমতো টাউনশিপ। কিছুদূর চলার পর একটা পাঁচিলঘেরা এলাকার গেটের কাছে রিকশো থামল। গেটের মাথায় বোগেনভিলিয়ার ঝাঁপি। চৌকো সাদা কাচের বোর্ডে নিয়ন আলোয় লেখা আছে, 'কোদালিয়া পি এস।' গেটে সেন্ট্রি বেয়নেট হাতে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দোতলা বাড়ি। করিডরে সাদা পোশাকের এক পুলিশকে কর্নেল বললেন—সি আই সায়েব আছেন?

সে নিঃশব্দে সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখাল। দোতলায় উঠে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলে সে ঘরটা দেখিয়ে দিল। কর্নেল পর্দা তুলে বললেন—আসতে পারি?

—হ্যাল্লো ওল্ড বস! ওয়েলকাম। ওয়েটিং ফর য়ু। আর দশ মিনিট দেখে চলে যেতাম।

সার্কেল ইন্সপেক্টর দীপক মুখার্জির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন কর্নেল।

আমার বয়সী লোক। স্মার্টনেস ঝকমক করছে চেহারায়। আমরা বসলে বোতাম টিপে একজনকে ডাকলেন।

বললেন—ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর সায়েবকে বলো কর্নেলসায়েব এসেছেন। ও সি সায়েব আছেন না বেরিয়েছেন?

—একটু আগে বেরোলেন স্যার!

—ওক্কে।

সে চলে গেলে মুখার্জি বললেন—আপনার ট্রাঙ্ককল পেয়ে আমি সত্যি বলতে কী, খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। দিব্যেশকে ডেকে বললাম, আপনি ওকে থাকতে বলেছেন। দিব্যেশ তো শুনে নার্ভাস হয়ে পড়ল। বিলিভ মি! আপনি এসেছিলেন মার্চের শেষাশেষি। তখন অবশ্য—তো একটু পরে দিব্যেশই আমাকে মনে করিয়ে দিল রায়ভবনের মার্ডার কেসের কথা। আর য়ু ইন্টারেস্টেড?

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন—আমরা রায়ভবনে গেস্ট হয়ে এসেছি। এখন সেখান থেকেই আসছি।

—সো দ্যাটস দ্যাট! কফির ব্যবস্থা করি আগে? আমার কোয়ার্টার পাশেই।

—থাক। বেশিক্ষণ বসব না।

একজন টাকমাথা গোলগাল ভদ্রলোক—দেখতে একেবারে সাদাসিধে এবং অমায়িক, ঘরে ঢুকে হাত বাড়িয়ে কর্নেলের করমর্দন করলেন। তারপর অন্যপাশে একটা চেয়ারে বসে বললেন—মশা মারতে কামান দাগার আয়োজন করল কেডা?

—দিব্যেশ, তুমি আমাকে কামান বলছ?

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর হাসলেন—হঃ! ত কী কমু?

মুখার্জি বললেন—হঠাৎ আজ দুপুর থেকে দিব্যেশ মাতৃভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে। আমি জানি, এটা ওর নার্ভাসনেস!

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—দৈনিক সত্যসেবক? খাইছেরে!

কর্নেল বললেন—বেশিক্ষণ বসব না। আসামী কী বলছে?

গোয়েন্দা অফিসার হাই তুলে বললেন—বিকেল চারটেয় নার্ভ ব্রেক করল। অ্যান্ড হি কনফেসড।

—বলল নন্দকে মার্ডার করে গাছে ঝুলিয়েছে?

—হঃ!

—কেন?

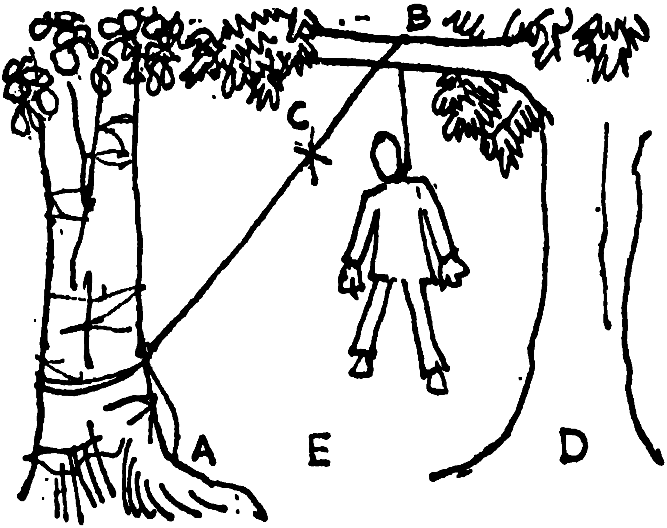
—নন্দ রায়বাবুর মিউজিয়ামের দামী একটা সিল চুরি করে নাকি এক সায়েবকে বেচেছিল। সেজন্যই নাকি রায়বাবু, মানে ওনার শ্বশুরমশাই পাগল হয়ে গেছেন। শ্বশুর-প্রেমিক জামাই। নন্দকে নদীর ঘাটে বেড়াতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরেছে। তারপর বডি এনে গাছে ঝুলিয়েছে। সিরিঞ্জ নদীতে ফেলে দিয়েছে।

—কী ভাবে ঝোলাল গাছে?

দিব্যেশবাবু পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করে দিলেন কর্নেলকে।—আসামীর নিজের হাতে আঁকা পিকচার। শুনুন। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, যে ভাবে আসামী বুঝিয়েছে আমাকে।

কর্নেল কাগজটা খুললে ঝুঁকে গেলাম দেখার জন্য। দিব্যেশবাবু বললেন—বডি এনে পয়েন্ট 'ই'-তে ফেলে রাখে। গলায় শক্ত নাইলনের দড়ির ফাঁস আটকে দেয়। আমগাছটা 'ডি' পয়েন্ট। পয়েন্ট 'বি'-র ওপর দিয়ে দড়ির অন্যপ্রান্ত ছুঁড়ে দেয়। এবার পয়েন্ট 'এ'-একটা অশোকগাছ। দড়িটা ধরে টান দিল এবং বডি উঠে পয়েন্ট 'বি'-তে ঝুলতে লাগল। দড়ির ডগাটা বাঁধল পয়েন্ট 'এ'-তে। এবার আমগাছে উঠে পয়েন্ট 'বি'-তে দড়ির ওপর দুই পা চাপ দিয়ে ব্লেড দিয়ে পয়েন্ট 'সি'-তে দড়িটা কাটল। তারপরের কাজটা সোজা। পয়েন্ট 'বি'-তে কাটা দড়ির ডগা ফাঁস দিয়ে আটকাল। বডি একটু নেমে এল বটে, কিন্তু টাইট হয়ে গেল ফাঁস। গাছ থেকে নেমে পয়েন্ট 'এ' থেকে দড়ির কাটা অংশ খুলে নদীতে ফেলে দিয়ে এল। সো ইজি! বাট টেরিব্লি ইনটেলিজেন্ট।

মুখার্জি বললেন—হরিফাইং জিওমেট্রিক্যাল প্যাটার্ন! একটা ত্রিভুজ। লোকটা তো স্কুল টিচার। কী পড়াতো?




—অঙ্ক আর জ্যামিতি।

—আই সি!

কর্নেল বললেন—দড়িটা পেল কোথায়, বলেছে?

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর বললেন—বাড়ির একটা ঘরে ছিল। ওই ঘরে সোমবাবুর থিয়েটারের স্টেজ সিনসিনারি থাকে। বাঁশ, তক্তা, দড়িও থাকে।

মুখার্জি চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন—এদিকে প্রেসার আসছে হেভি। মানিক চ্যাটার্জি, ইউ নো। এস ডি পি ও ইজ অলসো ইন্টারেস্টেড। ও সিকে ফোন করেছিলেন। উনি এসে আমাকে বলছিলেন, দেখুন তো কী করি! আই পি সি থ্রি জিরো টু কেস। থানা থেকে জামিনের প্রশ্নই ওঠে না। কাল কোর্টে প্রডিউস করে তারপর—এনিওয়ে, কর্নেল বলুন, হোয়াট ইজ ইওর ওপিনিয়ন?

কর্নেল ছবিটা দেখছিলেন। ফেরত দিয়ে বললেন—আপনাদের আসামীর সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চাই। সম্ভব হবে?

দিব্যেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন।—একটা অসুবিধা। অন্যান্য আসামীদের সঙ্গে রাখা হয়েছে ওকে। ফর হিজ সেফটি। কনফেস করা আসামীদের নিয়ে আমাদের দুর্ভাবনা থাকে।

মুখার্জি বললেন—হ্যান্ডকাফ দিয়ে এঘরে নিয়ে আসুন বরং।

—দেখছি। বলে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর বেরিয়ে গেলেন।

মুখার্জি হাসলেন।—কর্নেলসায়েব এখন হাতের কার্ড শো করবেন না, আই নো দ্যাট ওয়েল। একেবারে অকুস্থলে এসে উঠলেন। আমার ধারণা, ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়েছেনও। আপনার থিওরির সঙ্গে মিলছে?

কর্নেল বললেন—নাহ্।

—মাই গড! আসামীর কনফেসন অ্যান্ড দ্যাট পিকচার।

—ছবিটা ঠিকই আছে। মোডাস অপারেন্ডি ইজ অলরাইট।

—তা হলে কী ঠিক নেই?

—মোটিভ। দা মোটিভ ইজ উইক। বড্ড অস্পষ্ট। কিছুটা অ্যাবসার্ডও বটে।

—ধরুন, আসামী নিজেই সিল চুরি করে বেচেছে। নন্দ সেটা জানত। নন্দ রায়বাবুকে জানালে জামাইকে তাড়িয়ে দিতেন। এমন কি রায়বাবু সম্পর্কে যতটা জানি, আর্কিওলজিতে প্রচণ্ড বাতিক। এদিকে মেয়ে বেঁচে নেই। কাজেই প্রাক্তন জামাই আউটসাইডার। এক্ষেত্রে ওকে পুলিশে দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কাজেই—

—কমলেশবাবু আর মেয়ের নামে বাড়ি ও মিউজিয়াম উইল করে রেখেছেন রায়বাবু।

—শুনেছি। সোমবাবু বলছিলেন। মুখার্জি জোর দিয়ে বললেন—কাজেই কমলেশের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। অত বড় একটা প্রপার্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি ছিল। রায়বাবু উইল বদলাতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নন্দকে আর টাকা দিয়ে চুপ করানো যাচ্ছিল না। তাই তাকে মারল কমলেশ।

কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে বললেন—একটা ব্রোঞ্জের সিলের খরোষ্ঠী লিপি সম্পর্কে নন্দের কোনও ধারণা থাকা অসম্ভব, দীপক! ছোট্ট একটা সিল, যা পকেটে লুকোন যায়, তা গোপনে বেচাকেনাটা অন্তত নন্দের মতো লোকের কাছে ধরাপড়ার চান্স অত্যন্ত কম। গ্যান্সলার নামে এক জার্মান সায়েব এসেছিলেন। তারপর সিল হারিয়েছে! গ্যান্সলারকে কমলেশ সিল বেচলে সে এমন বোকা নয় যে, নন্দের চোখে পড়ার মত জায়গায় বেচবে। এগেন আই স্ট্রেস দ্য পয়েন্ট, নন্দের পক্ষে এমন ঘটনা জানার চান্স খুবই কম।

মুখার্জি টেবিলে ডান কনুই রেখে দুই ভুরুর মধ্যিখানটা খামচে ধরে বললেন—কোর্টে অবশ্যি এসব কনফেসনের লিগ্যাল ভ্যালু নেই। আসামী বললেই হল, পুলিশের চাপে পড়ে মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছে। সো উই নিড আদার এভিডেন্স। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শী নেই। অতএব সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সের ওপর নির্ভর করতে হবে।

—অ্যান্ড দ্য সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স বেসিক্যালি নিডস আ স্ট্রং মোটিভ অব দা মার্ডার।

—নিশ্চয়! যুক্তিপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য মোটিভ।

কর্নেল চুপচাপ কিছুক্ষণ চুরুট টানার পর বললেন—সিল চুরির ডায়েরি করা হয়েছিল থানায়?

—শুনলাম হয়েছিল। ওইদিন ডিউটি অফিসার ছিলেন এস আই মাখনবাবু। তিনি দলি হয়ে গেছেন। ডাইরি দেখবেন নাকি?

—নাহ্।

এই সময় গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর ফিরে এলেন। তাঁর পেছনে হ্যান্ডকাপ পরা একজন াগা যুবক। কোটরগত উজ্জ্বল চোখ। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। পরনে প্যান্টশার্ট। ায়ে জুতো নেই। তার পেছনে দু'জন তাগড়াই কনস্টেবল। তারা সি আই সায়েবকে নলাম দিয়ে প্রস্তরীভূত দাঁড়াল। সি আই মুখার্জি বললেন—বাহারমে যাও।

তারা বেরিয়ে গেল। কর্নেল বললেন—বসুন কমলেশবাবু।

কমলেশ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। দিব্যেশবাবু মিষ্টি গলায় বললেন—বসুন, বসুন। হবার হয়ে গেছে। নিয়তি কেন বাধ্যতে?

মুখার্জি বললেন—আলাপ করিয়ে দিই। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আর ইনি হলেন ৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি।

কমলেশ শান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল—যা বলার বলেছি। নিউজপেপারে স্টেটমেন্ট তে আমি বাধ্য নই।

দিব্যেশবাবু হাসলেন।—কী যে কন! স্টেটম্যান্ট চায় কেডা? কর্নেল সায়েবের গে আলাপ করেন। ইনিও আপনার শ্বশুরের লাইনের লোক। আর্কিওলজিস্ট।

মুখার্জিও হাসলেন—অ্যান্ড নেচারিস্ট্।

কর্নেলের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি কমলেশকে চোখ নামাতে বাধ্য করল। অন্যপাশের খালি েয়ারে সে বসল। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, এই রোগাপটকা যুবকটি কী করে াছের ডালে বডি ঝোলাল, পদ্ধতিটা কি সত্যিই 'ইজি'?

কর্নেল বললেন—সিলটা সম্পর্কে আমি ইন্টারেস্টেড কমলেশবাবু! আমাকে পুলিশের লাক ভাববেন না। খুন-খারাপির মধ্যে আমি নেই। খরোষ্ঠী সিল দক্ষিণ বাংলায় াওয়া একটা যুগান্তকারী ঘটনা। শুধু বাংলা কেন, সারা ভারতের ইতিহাস তাহলে তুন করে লিখতে হবে। তাই না?

কমলেশ ঠাণ্ডা গলায় বলল—হ্যাঁ কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না ওইসব লিপি খরোষ্ঠী। াস্টারমশাইয়ের সঙ্গে তর্ক করা চলে না। তাই কিছু বলিনি এতদিন।

—মাস্টারমশাই মানে আপনার শ্বশুর জয়দেব রায়?

—আমি মাস্টারমশাই বলি।

—হারানো সিলটা আপনি দেখেছিলেন?

—দেখেছি। হাজার-হাজার বছর মাটির তলায় পড়ে থাকা অবজেক্টে ন্যাচারাল কমিক্যাল কনট্যামিনেশন হয়। পুরনো লিপি পড়ার আগে অবজেক্টকে কেমিক্যাল প্রসেসে পরিষ্কার করে নিয়ে ফোটোকপিতে কয়েক গুণ বড় করে নিতে হয়। তারপর াঠের প্রশ্ন। আজকাল টেকনোলজির সুবিধে আছে। কম্পিউটার প্রসেসিংয়ের ব্যবস্থা আছে। তা না করে খালি চোখে—

কর্নেল তার কথার ওপর বললেন—প্রিন্সেপ ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠীর পাঠোদ্ধার করেছিলেন।

—জানি। কিন্তু তাঁকেও তখনকার টেকনোলজির সাহায্য নিতে হয়েছিল। মাস্টারমশাই একটা আনক্লিন এবং কনট্যামিনেটেড্ সিল আতস কাঁচে দেখেই খরোষ্ঠী বলেছেন। আপনি 'ললিত-বিস্তর' পড়েছেন?

—সংস্কৃত বই। বুদ্ধের জীবনী। তাতে ৬৪টি লিপির কথা আছে।

—তাহলে দেখুন, অসংখ্য লিপি হারিয়ে গেছে। তা ছাড়া মাস্টারমশাই একটু বেশি উৎসাহী। একটি মাটির কলসির গায়ে কী লিপি ছিল। উনি তার ওপর সাদা রঙ বুলিয়েছেন। আ সর্ট অব ম্যানিপুলেশন! উইশফুল ডিসাইফারিং। আমি দেখামাত্র বুঝতে পেরেছিলাম, কুমোরের তৈরি নকশামাত্র। কলসির গলায় নকশা এখনও করা হয়।

—সিলটা নন্দ চুরি করেছিল, আপনি সিওর হলেন কী করে?

—মাস্টারমশাই মিউজিয়ামের কোনায় বসে একটা পাথরের স্ল্যাব পরীক্ষা করছিলেন। আমি পাশের ঘরে থাকি। নন্দ গ্লাসে জল নিয়ে ঢুকছিল। খাটের পাশে একটা টেবিলে জল রেখে গেল। টেবিলেই সিলটা ছিল। আমি পর্দা তুলে ঢুকেছি, নন্দ তাড়াতাড়ি চলে গেল। দু'দিন পরে মাস্টারমশাই হৈচৈ শুরু করলেন। সিলটা নেই।

—নন্দ জল দিতে আসার সময় জার্মান সায়েব ছিলেন রায়ভবনে?

—ছিলেন। হঠাৎ সেদিনই বিকেলের ট্রেনে কলকাতা ফিরে গেলেন। গ্যান্সলার সিলটা দেখেছিলেন। নন্দ গেস্টরুমে ওঁর দেখাশোনা করত। দুইয়ে দুইয়ে চার।

—স্কুলে আপনি কী পড়ান?

—পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি।

—আপনি জানেন দেশের পুরাদ্রব্যসংক্রান্ত আইনে ব্যক্তিগত সংগ্রহে পুরাদ্রব্য রাখা যায় না। কিন্তু একটা ট্রাস্টি বোর্ড থাকলে তবেই রাখা যায়?

—জানি।

—জয়দেববাবুর উইলে আপনি এবং আপনার স্ত্রীকে রায়ভবনের সবকিছুর উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। বাড়ির ব্যাপারে প্রব্লেম নেই। কিন্তু মিউজিয়ামে আপনাদের আইনত অধিকার থাকছে না জানেন কি? ওটা সরকার ইচ্ছে করলে যে কোনও সময় নিতে পারেন।

কমলেশের ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা রেখা দেখলাম। সে বলল—মাস্টারমশাই বোকা নন। ওঁর অ্যাটর্নি আইন জানেন। মানিকদা—আমার কলিগ মানিক চ্যাটার্জি কোদালিয়া মিউজিয়ামের প্রেসিডেন্ট। আমি সেক্রেটারি। এই মিউজিয়াম 'কোদালিয়া প্রত্নউদ্ধার সমিতি' নামে অলরেডি রেজিস্টার্ড হয়ে আছে। মেম্বারদের মধ্যে লোকাল পঞ্চায়েত এবং স্কুল থেকে প্রতিনিধিরা আছেন।

—আপনি সিওর নন্দ সিল চুরি করে সায়েবকে বেচেছিল?

—সিওর। পরদিন নন্দ কলকাতা গিয়েছিল কী কাজে। ডলার বা মার্ক ভাঙাতেই য়েছিল। টাকা কোথায় লুকিয়ে রেখে গেছে। গতরাতে ওকে জেরা করে কবুল বানো গেল না। তখন—আই কিলড দা বাস্টার্ড।

—নিকোটিন অ্যাম্পিউল কোথায় পেলেন?

—পাওয়া যায়। পৃথিবীতে সবই পাওয়া যায়।

—কোদালিয়ায়?

পাওয়া অসম্ভব নয়। কোদালিয়া এখন শহর। বর্ডার বেশি দূরে নয়। পুলিশ অফিসারদের জ্ঞেস করুন, এটা ফরেন গুডসের কতবড় স্মাগলিং সেন্টার।

—আপনার শ্বশুরকে স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দেওয়া হত জানেন?

—হুঁউ, জানি। কিন্তু বাধা দিইনি। ওঁর ছেলেরা আছে। তবে...

—বলুন!

—মাস্টারমশাই ক'মাস আগে একটা এক্সক্যাভেশন সাইটে মাথা ঘুরে পড়ে য়েছিলেন। তারপর থেকে ভীষণ দুর্বল বোধ করতেন। চলাফেরা করতে কষ্ট হত। ই আমি স্টেরয়েড নিতে বাধা দিইনি। আই ফিল ফর হিম। ছোটবেলায় বাবা-মাকে রিয়েছি। পিসিমা মানুষ করছিলেন। মারা গেলেন। তখন মাস্টারমশাই আমাকে আশ্রয় য়েছিলেন। উনি ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার কে আছে? ওঁর মনে কেউ আঘাত লে তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি?

—আপনার স্ত্রী স্যুইসাইড করেছিলেন?

কমলেশ তাকাল। একটু পরে বলল—শি ওয়জ আ সাইকিক পেশ্যান্ট। সবাই নে।

—একই গাছের একই ডালে গলায় ফাঁস দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। ওই থেকে আমার মাথায় নন্দকে একইভাবে ঝোলানোর প্ল্যান এসেছিল।

—আপনার স্ত্রীও কি নাইলনের দড়ির ফাঁসে...

হ্যাঁ। বড়দার থিয়েটার রুমে অনেক দড়ি আছে।

—আমি যদি বলি, আপনি আপনার স্ত্রীকেও একইভাবে মেরে একই পদ্ধতিতে লিয়েছিলেন?

কমলেশ হাসল।—মাস্টারমশাইয়ের শিক্ষা, সমাজের হিতের জন্য কোনও কাজে প নেই।

—আই সি!

—আমার স্ত্রীকে মেরে সমাজের হিতসাধন হত না। অন্য দেশে পুরাদ্রব্য পাচারকারীদের গুলি করে মারা হয়। এদেশে সেই সভ্য আইন নেই। তাই আমি নিজে সভ্য দেশের আইন প্রয়োগ করেছি।

—নন্দকে মেরে?

—নন্দকে মেরে।

—কিন্তু আপনার স্ত্রীকে হত্যার প্রত্যক্ষ মোটিভ তো ছিল?

—হত্যা! এবং মোটিভ?

—হ্যাঁ। কাঞ্চন নামে একজনের সঙ্গে আপনার স্ত্রীর পূর্বপ্রণয় ছিল।

কমলেশ ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর হিসহিস করে বলল—হু আর য়ু? ডিটেকটি অফিসার, নাকি সি বি আই অফিসার?

—প্লিজ এক্সপ্লেন দিস পয়েন্ট!

—স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। শুধু মাস্টারমশাইয়ের কথা অমান্য কর পারিনি বলেই—নাহ্ স্যার! যার সঙ্গে এতটুকু ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট ছিল না, ত জন্য প্রতিহিংসার প্রশ্নই ওঠে না।

—কিন্তু আপনারা একই ঘরে রাত্রিবাস করতেন?

—না। পারু আমাকে পাশের ঘরে শুতে বলত। তা-ই শুতাম। পরে মাস্টারমশাইয়ে কানে গেলে উনি নিজের ঘরের পাশের ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।

—আপনি স্ত্রীর মৃত্যুর পর শান্তিবাবুর স্ত্রীকে বলেছিলেন 'এটাই কি নিয়তি বউদি'। এক্সপ্লেন ইউ।

—বউদি বলেছে আপনাকে?

—হ্যাঁ।

—বলে থাকতে পারি। মনে নেই। আত্মহত্যাও তো নিয়তি।

—স্ত্রীর ডেডবডি আপনিই আবিষ্কার করেছিলেন?

—হ্যাঁ। ভোরবেলা নদীর ধারে বেড়ানো আমার অভ্যাস। বাগানের ভেতর দিয়ে যেতে হয়।

—ওই ঘটনায় নন্দর রিঅ্যাকশন কী হয়েছিল, মনে পড়ে?

—কান্নাকাটি করেছিল। পারু—মানে আমার স্ত্রীকে নাকি সে-ই মানুষ করেছিল।

—নন্দের কোনও বিশেষ উক্তি—মানে স্মরণে রাখার মতো...

কমলেশ হাতকড়া পরা হাত দুটো টেবিলে রেখে দ্রুত বলল—নন্দের বিশেষ উক্তি...হুঁ, 'এরা পাগল বংশ—সবাই মাথা খারাপ'...তবে এটা লোকাল লোকেরা সবাই বলে। মাস্টারমশাই বলতেন, তাঁর কোন জমিদারই পূর্বপুরুষ নিরীহ প্রজাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা এনজয় করতেন।

—মেয়ের মৃত্যুর পরই কি জয়দেববাবুর মধ্যে পাগলামির লক্ষণ প্রথম দেখা যায়?

—হ্যাঁ। ভীষণ শক। তবে মাস্টারমশাই তার আগেও কোনও কোনও ব্যাপারে যা সব করতেন, সুস্থ মানুষ করে না।

—ফর এক্জাম্পল্?

—এত মনে নেই। বড্ড উইশফ্ল থিংকিং ছিল—যেমন এই খরোষ্ঠীলিপি। সামটাইমস হি ইমাজিনড থিংস।

আমি বলে উঠলাম—সোমদেববাবুও...কিন্তু কর্নেল চোখ কটমটিয়ে তাকাতেই চুপ করে গেলাম।

কমলেশ বলল—র‍্যাদার আ শিজোফ্রেনিক টাইপই বলব। রিয়্যাল—আনরিয়্যালের পার্থক্য হারিয়ে ফেলতেন মাঝে মাঝে। কী করতে কী করছেন টের পেতেন না মিউজিয়ামে কিছু প্রাচীন অস্ত্র আছে। একদিন দেখি, একটা তলোয়ার দিয়ে নিজে

াত কাটার জন্য ঘষছেন। ভাগ্যিস মরচে ধরা ভোঁতা তলোয়ার। বাধা দিলাম। তখন বললেন, 'এতে একটা স্ক্রিপ্ট আছে। ডিসাইফার করছি'। দিজ সর্ট অব থিংস্।

মুখার্জি বললেন—শিজোফ্রেনিয়া এবং প্যারানোইয়া প্রায় একই টাইপের অসুখ।

কমলেশ নিষ্পলক চোখে গোয়েন্দা ইনসপেক্টারের দিকে তাকাল।—আপনারা এবার আমাকেও এই অসুখ ধরাবেন। হোয়াই এনি মোর কোয়েশ্চনস? পরিষ্কার লিখে দিয়েছি তা, আমি নন্দকে মেরেছি।

দিব্যেশবাবু বললেন—আপনার সত্য বলার সাহস আছে। আই প্রেইজ য়ু। আর একটা কথা। আপনার শ্বশুরমশাইয়ের কোনও প্ররোচনা ছিল না তো? ওই যে ওনার মেসেজ কইলেন, সমাজের হিতের জন্য কিছু করনে পাপ নাই!

—নাহ্। প্রায় গর্জন করল কমলেশ। তারপর উঠে দাঁড়াল। —অন্য দেশ হলে জয়দেব রায়কে মাথায় তুলে রাখত। জীবদ্দশায় স্ট্যাচু বানিয়ে সম্মান জানাত। নিজের পয়সায় এক্সক্যাভেশন করেছেন। সরকার নিজে তো একটা পয়সা দেনইনি, উপরন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ যে সাহায্য করতে চেয়েছিল, তা-ও আটকে দিয়েছেন। ইউনেস্কোর টিমকে পর্যন্ত ভিজিটের পারমিশন দেওয়া হয়নি। এই দেশে সুস্থ মানুষের বেঁচে থাকতে আছে? আমার ফাঁসি হলে সুখে মরতে পারব।

কমলেশ পা বাড়ালে বাইরে থেকে সেই কনস্টেবলরা এসে ওর সামনে দাঁড়াল। দিব্যেশবাবু উঠে পড়লেন। কর্নেলকে বললেন—আর কিছু জিগাইবেন নাকি?

কর্নেল মাথা নাড়লেন। আসামীকে নিয়ে চলে গেলেন দিব্যেশবাবু।

মুখার্জি বললেন—পাগলবংশের পাল্লায় পড়ে এ-ও দেখছি এক পাগল।

কর্নেল বললেন—উঠি।

—কী বুঝলেন বলে যান।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—জানেন তো? স্বদেশীযুগে ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে উঠে বলেছিলেন, দড়িতে মোম দেওয়া হয়েছে কেন? উই আর প্রাউড অব আওয়ার কান্ট্রি—ক্ষুদিরামস আর স্টিল বর্ন্ অ্যান্ড ডাই।

মুখার্জি শুকনো অট্টহাসি হাসলেন।—বুঝি না মানুষ মেরে সমাজের কী হিত হয়! চলুন, আমিও বেরোই। কোয়ার্টারে গেলে শ্রাবণী খুশি হত। ওকে বলেছি, আপনি আসছেন।

—আগামী কাল যাব এবং কফি খাব।

—টাইম দিন।

—দশটা নাগাদ।

—থ্যাংকস ...

সাইকেল রিকশোয় রায়ভবনের ফটকে পৌঁছলাম। দেখি, শান্তিদেব টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন—দেরি দেখে রমা তাগিদ দিল। কোথায় বেরিয়েছিলেন?

কর্নেল বললেন—থানায় গিয়েছিলাম।

শান্তিদেব আলো ফেলে হাঁটতে হাঁটতে ব্যস্তভাবে বললেন—কমলেশকে মিট করলেন?

—হ্যাঁ। কমলেশ স্বীকার করেছে।

—বলেন কী!

—নন্দ সিল চুরি করে সায়েবকে বেচেছে, সে জানতে পেরেছিল।

—সে জন্য নন্দকে সে মারল? অদ্ভুত তো!

—সিল হারিয়ে তার মাস্টারমশাই পাগল হয়েছেন। তাই...

—অবিশ্বাস্য! অন্য কোনও গোপন ব্যাপার আছে। বাবার মিউজিয়াম থেকে জিনিসপ চুরি করত দুজনে। বখরা নিয়ে গণ্ডগোল। এখানে স্মাগলার্স গ্যাং আছে জানেন তো তাদের সাহায্য নিয়ে মেরেছে নন্দকে।

কর্নেল কোনও মন্তব্য করলেন না। হলঘরের দরজায় রমা দাঁড়িয়েছিলেন বললেন—রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে ভাবছিলাম।

শান্তিদেব বললেন—জানো? কমলেশ কবুল করেছে।

রমা কানে নিলেন না কথাটা। বললেন—তুমি এস। ওপরে খাবারটা পৌঁছে দেবে

আমরা গেস্টরুমে গিয়ে পোশাক বদলে পালাক্রমে বাথরুম সেরে নিলাম। এক পরে শান্তিদেব ট্রেতে রাতের খাবার এনে দিলেন। লুচি, আলুরদম, মাছভাজা, মুর্গি মাংস, সন্দেশ এবং একপট কফি।

যতক্ষণ খেলাম, শান্তিদেব কমলেশের কথা বলতে থাকলেন। তার পুরো জীবনী এবং কার্যকলাপ। শান্তিদেবের মতে মানিক চ্যাটার্জি ওর মুরুব্বি। কাজেই পুলিশ চার্জশি উইক করে দেবে। মামলা কেঁচে যাবে।

কর্নেল বললেন—আপনার দাদা ফিরেছেন?

—এখন কী? রাত এগারোটা বাজুক। চুটিয়ে রিহার্সাল দিচ্ছেন। পাগল! পাগল!..

## ॥ পাঁচ ॥

নতুন জায়গায় গেলে আমার ঘুম আসতে চায় না। কর্নেলের কথায় সিঁড়ির নিচে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এ ঘরের দরজাও বন্ধ। তবু কী অস্বস্তি আমাকে পে বসেছিল। বাইরে ঝলমলে জ্যোৎস্না। মশারির ভেতর থেকে বারবার ব্যালকনির দিকে তাকাচ্ছিলাম। জয়দেববাবুর 'আত্মা অমর' এবং 'পারু স্পিকস টু মি' কথাদুটো ক্রম আমার চেতনায় ঝাঁপিয়ে আসছিল। এমন একটা পুরনো ক্ষুধিত পাষাণ-টাইপ বাড়ি এবং একটা আত্মহত্যা, একটা সদ্য খুনখারাপি! ভূতে বিশ্বাস না করলেও ভূতে ভয় আমার আছে। রিভলভার আর টর্চ বালিশের পাশে রেখেছি! শিলিং ফ্যানে হাওয়ায় মশারি দুলছে। ঝুলন্ত ব্যালকনির দিকের দরজাটা কর্নেল বন্ধ করতে দেননি হঠাৎ-হঠাৎ সেখানে যেন একটা আবছায়া দেখছি। মশারি থেকে মুখ বেরও করা মাঝেমাঝে। এ এক অস্বস্তিকর রাত্রি।

কর্নেল নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। বিশ্বাস করা চলে জিম করবেটের মতো ওঁর গাছের ডালে ঘুমুনোর গল্প। আজীবন প্রকৃতিচর এবং সামরিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত লোকদের পক্ষে হয়তো এটাই স্বাভাবিক। যুদ্ধের ফ্রন্টে পরিখায় সৈনিকেরাও নাকি দিব্যি ঘুমিয়ে নেয়।

নিচের হলঘরে গ্র্যান্ডফাদার ঘড়ির অস্পষ্ট শব্দ শুনলাম একবার। একবার আমাকে কে দিয়ে কী একটা পাখি ক্র্যাক্র্যা করে চেরা গলায় ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। ম্ভবত পেঁচা। বহুদূরে ট্রেন বা মালগাড়ির শব্দ কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ নিচে কোথাও কটা শব্দ শুনতে পেলাম। কে যেন সিঁড়ির নিচের দরজাটা ঠেলছে। আস্তে কলাম—কর্নেল! কর্নেল!

কর্নেলের নাকডাকা থেমে গেল।

—কর্নেল! নিচের দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে।

—ভূত।

—কী আশ্চর্য! ওই শুনুন?

আবার কর্নেলের নাক ডাকতে থাকল। শব্দটাও থেমে গেল। আবার স্তব্ধতা। কতক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কে জানে! স্বপ্নে দেখছিলাম, দৈনিক সত্যসেবকের চিফ অব দা নিউজবুরো সুনীলদা সবুজরঙের নাইলনের দড়িতে ফাঁস বানিয়ে নিষ্ঠুর হেসে বলছেন—তুমি আজ কাগজকে ফাঁসিয়েছ। তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাব। সারা নিউজরুম জুড়ে সহকর্মীরা আমাকে তাড়া করে আসছেন। চ্যাঁচাতে চেষ্টা করছি—কর্নেল! কর্নেল! বেয়ারা হরিবন্ধু বলছে—জয়ন্তবাবু পাগল! জয়ন্তবাবু...

বাবু! বাবু!

তাকিয়ে দেখি, দিব্যি মশারির ভেতর শুয়ে আছি। ঘরে দিনের উজ্জ্বল আলো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটি মধ্যবয়সী গ্রাম্য মেয়ে ডাকছে—বাবু! বাবু কোফি এনিচি। উঠুন!

মশারি থেকে বেরিয়ে এলাম। মেয়েটি টেবিলে ট্রে রেখে চলে গেল। এই তাহলে কাজের মেয়ে লক্ষ্মী। কর্নেলের বিছানা খালি। মশারি গুটোনো। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন বোঝা গেল। বাথরুম সেরে এসে বিস্কুট দিয়ে কফি খেলাম।

ব্যালকনিতে গিয়ে চোখে পড়ল সেই নদী আর নির্জন প্রকৃতি। তারপর মনে পড়ল, রাতরাতে নিচের দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল। সোমদেববাবু কি ক্লাব থেকে ফিরে গল্প করতে আসছিলেন? কিন্তু তখন রাত প্রায় বারোটা বা একটা। তাছাড়া উনি যদি বিশেষ জরুরি কারণে এসেই থাকতেন, নিশ্চয় ডাকতেন।

দিনের উজ্জ্বল আলোয় ভূত ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা রহস্যজনক তো বটেই।

সওয়া আটটা বাজে। কর্নেল কখন ফিরবেন, সেটা ওঁর মর্জি। রাতের পোশাক বদলে প্যান্ট শার্ট পরে নিলাম। চুপচাপ ঘরে বসে থাকার মানে হয় না। সতর্কতার দরুন রিভলভারটা ঘরে রেখে যাওয়া ঠিক মনে করলাম না। পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবারের অস্ত্রটা প্যান্টের পকেটে দিব্যি ঢুকে যায়। রুমালে জড়িয়ে পকেটে ঢোকালাম। অস্ত্রটা অটোমেটিক। কিন্তু ট্রিগারের পিঠের ওপর ইঞ্চিটাক লম্বা ক্লিপটা টেনে নামিয়ে রাখলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ওটার সঙ্গে ভেতরে স্ট্রাইকিং হ্যামারের যোগ আছে। একটা গুলি ছুঁড়লে দ্বিতীয়টা ঘুরে এসে হ্যামারের সামনে বসে যায়। এই প্রক্রিয়াটাই অটোমেটিক।

পোর্টিকো নির্জন। জঙ্গলে লন পেরিয়ে বাগানে ঢুকলাম। সরু একফালি পায়ে চলা

পথ চোখে পড়ল। পাইনগাছের ওপাশে আমগাছটা যেন ভয়াল জৈব চোখে আগন্তুককে দেখছে। একমিনিট দাঁড়িয়ে লম্বা ছড়ানো ডালটা এবং বাঁদিকে লম্বাটে অশোকগাছের গোড়াটা লক্ষ্য করলাম। আমগাছের ডালে কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু অশোকগাছের গোড়ায় হাতখানেক উঁচুতে ঘষা দাগ স্পষ্ট। ছাল ঘষা খেয়েছে দড়ির বাঁধনে।

পায়ে চলা পথটা শেষ হয়েছে একটা ফুট সাতেক উঁচু এবং ফুট চারেক চওড়া জরাজীর্ণ দরজায়। ধূসর হয়ে গেছে কপাট। তার ওপর মাকড়শা হয়তো গতরাতেই জাল ছড়িয়েছে। উঁচু পাচিলের ধারে ফার্নের জঙ্গল। কপাটের মাঝামাঝি জায়গায় একটা লম্বা কাঠের হুড়কো বসানো। দরজা খুলেই দেখি দুধারে লাইনকংক্রিটের চাবড়া, গুল্মলতা, তার শেষে পাথরের স্ল্যাব বসানো ঘাট। ধাপের ফাটলে কাশ এবং আগাছা গজিয়ে আছে। শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে ধাপগুলো। ডাইনে একটা ন্যাড়া লাইমকংক্রিটের প্রকাণ্ড চাঁই। দেখে মনে হল, ওখানেই সম্ভবত কমলেশ এসে বসে থাকত।

রোদ্দুরে ওখানে বসার মানে হয় না। মন্থর নদীটাকে 'মাদালসা' ইত্যাদি উপমায় কাব্য করার অভ্যাস আমার নেই। তবে বারবার কর্নেলের সঙ্গে নিসর্গভ্রমণে গিয়ে বুঝেছি, মানুষ ছাড়া প্রকৃতি-ট্রকৃতি অর্থহীন জড়পদার্থ মাত্র। এই নির্জন প্রকৃতিকে মানুষই অর্থপূর্ণ আর উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তুলতে পারে।

কিন্তু আমি প্রকৃতিতে সবসময় নিজেকে আউটসাইডার আবিষ্কার করি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট শেষ করে নদীতে ছুঁড়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। তারপর পা বাড়িয়েই চোখে পড়ল, লাইমকংক্রিটের চাঁইঢাকা আগাছার ভেতর কোনাকুনি এসে পড়া রোদের মধ্যে কী একটা জিনিস চকচক করছে।

কাছে গিয়ে দেখি, একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ—সুচসুদ্ধ!

এটাই কি মার্ডার উইপন?

কর্নেলের সঙ্গগুণে জানি ওতে খুনির আঙুলের ছাপ থাকা সম্ভব। তাই রিভলভার জড়ানো রুমালটা সাবধানে বের করলাম। তারপর ঝোপে হাত ঢুকিয়ে রুমাল দিয়ে ওটা তুলে নিলাম।

এইসময় পেছনে একটা শব্দ হল। চমকে উঠে ঘুরে দেখি জয়দেববাবু। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। ফ্যাসফেঁসে গলায় বললেন—ব্রোঞ্জের সিল? খরোষ্ঠী স্ক্রিপ্ট?

বললাম—আজ্ঞে না। একটা ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ!

—দেখি, দেখি!

ওঁর সামনে হাতের তালুতে রুমালে রাখা সিরিঞ্জটা এগিয়ে দিলাম। অমনি উনি খপ করে সিরিঞ্জটা তুলে নিয়ে জোরে নদীতে ছুঁড়ে ফেললেন। উত্তেজিতভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—নাড়ুর ইঞ্জেকশন আর আমি নিচ্ছি না। আমাকে পাগল করার চক্রান্ত? আমি পুলিশ কেস করব। সোমু, রন্তু, শান্তু, পারু, বউমা সব্বাইকে আসামি করব। ওরা আমাকে পাগল সাব্যস্ত করে আমার উইল কেঁচিয়ে দেবে। হুঁ হুঁ বাবা! আমি সব বুঝি। লেট কমলেশ রায় ব্যাক ফ্রম ক্যালকাটা।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বললাম—কিন্তু সিরিঞ্জটা যে...

—চু-উ-প! আঙুল তুলে গর্জন করলেন জয়দেব রায়।—হু আর ইউ টু ইন্টারফিয়ার

ন মাই পার্সোনাল অ্যাফেয়ার? কে আপনি? এখানে ট্রেসপাস করেছেন কেন? লে দরজার দিকে ঘুরে চিড়-খাওয়া গলায় হাঁকলেন—নন্দ! নন্দ!

বাগানের ভেতর দিয়ে রমাকে হন্তদন্ত আসতে দেখলাম। এসেই শ্বশুরের হাত রে টেনে ভেতরে ঢোকালেন। জয়দেববাবু রুষ্ট চোখে বারবার ঘুরে আমাকে দেখছিলেন। মা বললেন—ঘরে চলুন তো!

—এই লোকটা আমার মিউজিয়ামে চুরি করতে এসেছে। ঘাপটি পেতে দাঁড়িয়ে আছে। চোর!

—আহ্! কাকে কী বলছেন! গতরাতে আলাপ হল না ওঁর সঙ্গে? কর্নেলসায়েবের সঙ্গে এসেছেন উনি। নিউজপেপারের লোক।

জয়দেববাবু ঘুরলেন। এবার মুখে হাসির ছাপ।—সরি জেন্টলম্যান। আজকাল লোক চেনা দায় বুঝলেন তো? আসুন, আসুন। আমি একটা স্টেটমেন্ট দেব। হেডিং দেবেন ফ্রম হিন্দুকুশ টু লোয়ার বেঙ্গল।' আমি প্রাচীন গ্রিকদের দেখা সেই 'গঙ্গারিডি' সাম্রাজ্য আবিষ্কার করেছি। লালযুগ পর্যন্ত সেই সাম্রাজ্য টিকে ছিল। হখমনশীয় পারস্য সাম্রাজ্যের কথা শুনেছেন? ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি এইট বিসি টু থ্রি হান্ড্রেড থার্টি বিসি। দারিয়ুসের রাজত্ব ছিল নীল নদ থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত। তখন অলরেডি বৌদ্ধযুগ চলেছে। হখমনিশীয়দের সাম্রাজ্যে প্রচলিত আরামাইক ভাষা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। কাজেই অশোক আরামাইকে অনুশাসন চালু করলেন। কান্দাহার ইডিক্টস, ইউ নো! হিন্দুকুশ এরিয়ার বৌদ্ধরা আরামাইক স্ক্রিপ্ট থেকে খরোষ্ঠী ইডিক্টস অন সিলভার লিফ।...

কথা বলতে বলতে হাঁটছিলেন জয়দেব। রমা শ্বশুরের একটা বাহু ধরে আছেন। একবার ঘুরে চোখের ইসারায় আমাকে কেটে পড়তে বললেন। সুন্দরী পরস্ত্রীর এই ভ্রূভঙ্গি বুকের ভেতর সেতারের ঝংকার তুলেই থেমে গেল। ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা এ মুহূর্তে আমার মাথায় বিপজ্জনকভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে।

রমা শ্বশুরকে পূর্বদিকে খোলা বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢোকালেন। দক্ষিণের কোণে গেস্টরুমের ব্যালকনিতে আমার চোখ পড়ল। কর্নেল চুরুট কামড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে বাইনোকুলার। ফিরেছেন তা হলে!

ওপরে গেস্টরুমে ঢুকেই বললাম—মার্ডার উইপন!

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখেই বললেন—হুঁ!

—শুনুন! মার্ডার উইপন সেই ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা নদীর ঘাটে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। ঝোপের ভেতর পড়ে ছিল। কিন্তু হঠাৎ জয়দেববাবু গিয়ে খপ করে কেড়ে নিয়ে নদীতে ছুঁড়ে ফেললেন।

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে ঘরে এলেন। বললেন—নদীতে ছুঁড়ে ফেললেন?

—হ্যাঁ। বললেন, নাড়ু ডাক্তার এই ইঞ্জেকশন দিয়ে ওঁকে পাগল করে দিচ্ছে। উনি পাগল সাব্যস্ত হলে ওঁর উইল নাকি কেঁচে যাবে। অসম্বদ্ধ প্রলাপ। তারপর আমাকে চার্জ—'হু আর ইউ টু ইন্টারফিয়ার ইন মাই পার্সোনাল অ্যাফেয়ার?' নন্দকে ডাকতে থাকলেন। ভাগ্যিস রমাদেবী গিয়ে বাঁচালেন।

—লক্ষ্য করেছি। তো সিরিঞ্জটাতে নিড্‌ল্ ফিট করা ছিল?

—ছিল। বোঝা যাচ্ছে কমলেশ্ তাড়াহুড়ো করে ছুঁড়ে ফেলেছিল। জলে পড়েনি।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন—দশটায় মুখার্জির কোয়ার্টারে কফির নেমন্তন্ন। কি[illegible] যাওয়া হচ্ছে না। ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরুব।

—কাল রাত্রে সিঁড়ির নিচের দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছিল। আপনাকে ডাকলাম—

কর্নেল একটু হাসলেন। —সব পুরনো অভিজাত বাড়িতে রাতবিরেতে পুরনো মানুষদের আত্মারা চলাফেরা করে। জয়দেববাবু বলছিলেন, আত্মা অমর। হি ইজ রাইট। তা ছাড়া আমিও রবিঠাকুর কোট করে বলেছিলাম, অতীত বর্তমানের মধ্যে কাজ করে।

বিরক্ত হয়ে বললাম—বাজে কথা। কেউ ঢোকার চেষ্টা করছিল। কোনও জ্যান্ত মানুষ।

—ডার্লিং! শেষ পর্যন্ত যা ঘটেনি, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

—সোমদেববাবুর পাত্তা নেই। ভারি অদ্ভুত লোক তো!

—শুনলাম উনি দায়ে না ঠেকলে নটা-সাড়ে নটার আগে বিছানা থেকে ওঠেন না।

দরজায় রমা দেখা দিলেন। কাঁচুমাচু মুখে বললেন—জয়ন্তবাবু রাগ করেননি তো?

বললাম—না, না। আমি তো জানি ওঁর অবস্থা। তবে ইঞ্জেকশনের...

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ওঁর ঘরের বাইরে জানালার নিচে কোনও ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পিউল খুঁজে পাইনি। রমা কি পেয়েছ?

রমা বললেন—নাহ্। আমি খুঁজছিলাম। সেইসময় বাবামশাইয়ের ডাকাডাকি শুনতে পেয়ে দৌড়ে গেলাম। আপনি এখন কফি খাবেন?

নাহ্।

কোনো অসুবিধে নেই। রেডি আছে। পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটা ছোট্ট শ্বাস ছেড়ে রমা ফের বললেন—লক্ষ্মীকে দিয়ে পাঠাচ্ছি। বাবামশাইয়ের দিকে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঘরে ফিরেই পাগলামি শুরু করেছেন। টিংকুর বাবা ফার্মে গেল। টিংকুর জেঠু এখনও ঘুমোচ্ছেন।

বলে রমা চলে গেলেন। কর্নেল পোশাক বদলাতে গেলেন বাথরুমে। তারপর বেসিনের জলে হাত ধুলেন। ফিরে এলে বললাম—ভদ্রমহিলা খালি পায়ে কেন চলাফেরা করেন? অবাক লাগছে।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—মেয়েরা নাকি প্রকৃতির অংশ। একটা বইয়ে পড়েছি, মধ্যযুগে ইউরোপের লোকেরা বিশ্বাস করত, 'উইমেন স্পিক টু দা নেচার অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ল্যাংগুয়েজ অব দা নেচার।' পায়ে জুতো থাকলে নেচারের সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে যায়। খালি পায়ে হেঁটে দেখো। ইউ মে ফিল দা রিদম অব নেচার। অবশ্য তুমি পুরুষ। মেয়েদের যে সব সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে, তোমার নেই।

হাসতে হাসতে বললাম—বোগাস! ভদ্রমহিলা হয়তো কোনও ব্রত পালন করছেন।

—মেয়েদের ব্রত ব্যাপারটাও কিন্তু টু কমিউনিকেট উইদ দা নেচার থ্রু সাম মিডিয়াম। সেগুলোই রিচুয়ালস।

—আপনি জয়দেববাবুর দোসর। উনি আমাকে ইতিহাস শোনাচ্ছিলেন। কাগজে স্টেটমেন্ট দেবেন। হেডিং দিতে হবে, 'ফ্রম হিন্দুকুশ টু লোয়ার বেঙ্গল।' আপনারটাও হেডিং হওয়া উচিত; 'উইমেন অ্যান্ড নেচার।'

—সুসান গ্রিফিনের ওই নামেরই একটা বই আছে। তোমাকে দেব। গ্রিফিন উইমেনস লিবের দুর্ধর্ষ প্রবক্তা। এই মার্কিন মহিলার কলমের জোর আছে বটে। উওমেন-নেচার সম্পর্কটা যে পুরুষদেরই বানানো চক্রান্ত, সেটা প্রমাণ করে ছেড়েছেন।

লক্ষ্মী ট্রে নিয়ে এল। প্রচুর টোস্ট, এগপোচ, কলা, আপেল, সন্দেশ। কফির পট।...

ফটক দিয়ে আমরা বেরিয়েই সাইকেল রিকশো পেলাম। কর্নেল রিকশোওয়ালাকে বললেন—ইন্দ্রপুরী আবাসন।

অনেক গলিঘুঁজি ঘুরে চওড়া রাস্তা। সেখান থেকে নদী দেখা গেল বাঁদিকে। ডানদিকে ছোট রাস্তায় মোড় নিল রিকশো। দুধারে একতলা সব নতুন বাড়ি। রিকশো একবার দাঁড় করিয়ে কর্নেল এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করলেন—সি থ্রি থ্রি কোন দিকটায় পড়বে বলতে পারেন?

—বাঁয়ে ঘুরে পার্ক দেখতে পাবেন। পার্কের নর্থে সি ব্লক।

বাড়িটা পাওয়া গেল। সামনে একটু করে ফুলবাগিচা। বারান্দায় গ্রিল। আমরা গেটের কাছে রিকশো থেকে নামলে একটি কিশোরী দৌড়ে এল। এসেই কর্নেলকে দেখে থমকে দাঁড়াল। সম্ভবত পাদ্রিসায়েব ভাবল।

কর্নেল বললেন—বেণীমাধববাবুকে খবর দাও। বলো কর্নেল সরকার এসেছেন।

—দাদু আমাকে বলেছে। আসুন!

আমরা বসার ঘরে ঢুকলাম। সাম্প্রতিক মফস্বলের সচ্ছল মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বাড়ি। বসার ঘরে সোফাটোফা। বুক শেলফ। একটা টিভি। কোনার টুলে ঝালরকাটা ঢাকনার ওপর টেলিফোন।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, রোগা, ফ্যাকাসে চেহারা, হাতে ছড়ি নিয়ে ঢুকলেন। —নমস্কার! নমস্কার! বলে কর্নেলের মুখোমুখি বসলেন। —আমাদের এই রিটায়ার্ড ফিজিশিয়ানদের আমৃত্যু কতকগুলো লায়েবিলিটি থেকে যায়। তাই থানা থেকে ফোন করল যখন, আমি বুঝলাম, আই মাস্ট বিয়ার দা লায়াবিলিটি, হোয়াটেভার দ্যাট ইজ। তো আপনি কর্নেল সায়েব। ইনি আপনার জুনিয়র অফিসার, আই থিংক।

কর্নেল সে-কথার জবাব দিলেন না। বললেন—কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করেই চলে যাব।

—কয়েকটা কেন? ইউ আস্ক মি হান্ড্রেড কোয়েশ্চেনস। আই উইল আনসার।

—আপনি হাসপাতালে সার্জারি ওয়ার্ডের হেড ছিলেন?

—ছিলাম। ডাঃ বেণীমাধব হাসলেন। —শেষ পর্যন্ত মর্গের চার্জে ঠেলল। বুঝলেন তো? আজকাল সবখানেই কেলোর কীর্তি চলেছে। তবে আই ওয়াজ অলওয়েজ স্যাটিসফায়েড উইদ মাই জব।

—জয়দেব রায়ের মেয়ে পারমিতার বডি—

ডাক্তার দ্রুত বললেন—আই সি! কিন্তু সে নিয়ে তো কোনও কেস হয়নি।

—পারমিতার মৃত্যুর কারণ কি শ্বাসরোধ?

—তা-ই। আপনি রিপোর্ট চেক করেছেন কি? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, এক্সকিউজ মি কর্নেলসায়েব, দা মেডিক্যাল টার্মস—ইউ নো!

—বডির এক্সটার্নাল চেক করেছিলেন কি?

—সিওর। যেহেতু হ্যাংগিং কনডিশনে পাওয়া গেছে, সেটা প্রাথমিক কাজ।

—বডির কোথাও ইঞ্জেকশনের চিহ্ন লক্ষ করেননি?

ডাক্তার ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—রিপোর্টে সব ডিটেলস আছে। হোয়াই আস্ক মি?

—প্লিজ! আপনার তেমন কিছু চোখে পড়েছিল কি না মনে আছে? একটু ভেবে বলুন।

ডাক্তার স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন—পিঠে এক ইঞ্চি ক্ষত ছিল। ছড়ে যাওয়ার চিহ্ন। দ্যাট ওয়াজ এক্সপ্লেনড। গাছ থেকে বডি নামাবার সময় নাকি হাত ফস্কে পড়ে যায়। মাটিতে ইটের টুকরো ছিল।

—তা হলে পিঠে ছড়ে যাওয়া চিহ্ন ছিল?

—ছিল। আমি সেটা মেনশন করেছি রিপোর্টে।

—একটু ভেবে বলুন। চিহ্নটা হার্টের উল্টোদিকে ছিল?

—পসিব্‌লি। রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখুন। নতুন-নতুন সব ছোকরা ডাক্তার এসেছে। উই আর ওল্ড হ্যাগার্ডস। রিপোর্টটা তাদের দেখান।

কর্নেল উঠলেন। —থ্যাংকস। এই যথেষ্ট।

—গৃহস্থবাড়ি এসেছেন। একটু চা অন্তত—

— নাহ্। থ্যাংকস।

ভদ্রলোক প্রায় হতবাক হয়ে বসে রইলেন। কর্নেল হন্তদন্ত হাঁটছিলেন। বাইরে গিয়ে দেখলাম, বারান্দায় বাড়ির মেয়েদের একটা ভিড়। পুতুলের মতো দেখাচ্ছে তাঁদের।

রাস্তার মোড়ে পার্কের কাছে গিয়ে বললেন—কী বুঝলে?

—মর্গে ঠেলে দেওয়ায় উনি খুশি ছিলেন না।

—কারেক্ট।

—কাজেই দায়সারা কাজ করতেন।

—একজ্যাক্টলি।

—পারমিতাকেও নন্দের মতো বিষাক্ত ইঞ্জেকশানে খুন করে বডি ঝোলানো হয়েছিল।

—ফাইন! তোমার মাথা খুলেছে।

—অ্যান্ড আই ডিসকভার্ড দা মার্ডার উইপন।

—হুঁ।

পার্ক পেরিয়ে গিয়ে খালি সাইকেল রিকশো পাওয়া গেল। কর্নেল রিকশোওয়ালাকে বললেন—নিউমার্কেট।

বলে কর্নেল হাসলেন। —বেতলা ফরেস্টে রাস্তার ধারে একবার 'পার্কহোটেলে' খেয়েছিলাম। টালির চালাঘর। নড়বড়ে কাঠের টেবিল-চেয়ার। তবে ঢ্যাঁড়সের তরকারিটা ছিল অপূর্ব। আসলে ব্যাপারটা হল, জয়দেববাবুর থিওরি অনুসারেই দেশটা চলছে।

উনি এখানে গ্রিকদের জানা গঙ্গারাইড রাজ্যে বাস করছেন। ক্রমশ ভাষায় ইংরেজি যে হারে ঢোকাচ্ছি, আমিও ব্যতিক্রম নই এবং তুমিও নও—তাতে বছর পঞ্চাশ পরে পিজিন ইংলিশ্ 'বাংরেজি' হবে বাংলার লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা। কলকাতায় একবার ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, সুরেন ব্যানার্জি রোডে যাব। সে বলে, কোথায় সেটা? বলেই গিয়ার টানল—ও! এস এন ব্যানার্জি রোড! যাই হোক, বেতলার জঙ্গলে পার্ক হোটেল থাকলে কোদালিয়ায় নিউ মার্কেটে আপত্তি কী? দুটোতেই যুক্তি আছে। বেতলা ন্যাশনাল পার্ক থেকে পার্ক কথাটা আসতেই পারে। কোদালিয়ায় নতুন সাজানো গোছানো একেলে রীতির বাজার 'নিউ মার্কেট' হবেই।

বকবকানিতে কান ঝালাপালা হলেও সময় কেটে গেল। একটা বাসস্টেশন চোখে পড়ল। অসংখ্য বাসের ভিড়। মানুষজন। ট্রাক-টেম্পো-সাইকেলরিকশো গিজগিজ। তারপর দোতালা নতুন বিশাল বাড়ির মাথায় 'নিউমার্কেট' সাইনবোর্ড। ভেতরে করিডরের দুধারে দোকানপাট। থরেথরে উজ্জ্বল ভোগ্যপণ্য সাজানো। মফস্বল বাংলা প্রচণ্ড বদলে গেছে বটে!

রিকশো থেকে কর্নেল দুধারে তাকাচ্ছিলেন। একটু পরে ডাকলেন—এস!

উল্টোদিকে একটা ডাক্তারখানায় ঢুকলাম আমরা। নেমপ্লেটে লেখা 'ডাঃ এন জি চক্রবর্তী' এবং একসার ইংরেজি হরফ। ভেতরে কাঠের পার্টিশন। সামনে ওযুধের আলমারি। এক যুবক ঝিমোচ্ছিল কাউন্টারের সামনে। কর্নেল বললেন—ডাক্তারবাবু আছেন?

সে আমাদের দিকে না তাকিয়েই বুড়ো আঙুল দিয়ে পার্টিশনের দিকটা দেখাল। আমরা সটান গিয়ে ঢুকলাম। ইনিও প্রবীণ মানুষ। কিন্তু চেহারায় গ্রাম্য ছাপ। কর্নেলকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। প্রায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন—গুড মর্নিং! হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ স্যার?

কর্নেলকে বোধ করি সায়েব ভেবেছিলেন ডাঃ নাড়ুগোপাল চক্রবর্তী। কর্নেল বসেই বিনা ভূমিকায় বললেন—আপনি রায়ভবনের জয়দেব রায়কে কি স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন, নাকি অন্য কিছু?

ডাক্তারবাবু গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে বললেন—আপনার পরিচয়?

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর নেমকার্ড বের করে দিলেন। ডাক্তারবাবু খুঁটিয়ে পড়ে বললেন—বুঝলাম না। আপনি কি আই বি অফিসার ইন ডিসগাইস?

—আমার দাড়ি টেনে দেখতে পারেন।

রসিকতায় ডাক্তারবাবু একটুও হাসলেন না। বললেন—নন্দের মার্ডারকেসের তদন্তে এসেছেন? এইমাত্র শুনলাম কমলেশ কবুল করেছে। তো এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?

—আপনি জয়দেববাবুকে কী ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন?

—ডেকাডিউরেবলিন।

—না ডাঃ চক্রবর্তী! আপনি দিয়েছিলেন নার্কোটিক ড্রাগ।

—ব্লান্ট লাই। কে বলেছে?

—ইঞ্জেকশনের কয়েকটা অ্যাম্পিউল বলেছে। বলে কর্নেল পকেট থেকে তিনটে অ্যাম্পিউল বের করলেন। ফের বললেন—জয়দেব রায়ের জানালার বাইরে পড়েছিল।

ডাক্তারবাবু গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরে বললেন—ওটা নার্ভের ওষুধ। অন্যায় করিনি।

—আপনি তো এম বি বি এস নন?

—আই অ্যাম আ রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার।

—আপনি হাজারিবাগ গভর্নমেন্ট হসপিট্যালে ডিসপেন্সিং কেমিস্ট্ ছিলেন। কোদালিয়ায় ফিরে মেডিক্যাল প্র্যাকটিস শুরু করেন?

ডাক্তারবাবুর মুখ সাদা হয়ে গেল। গলা ঝেড়ে বললেন—এ কেসের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? রুগ্ণ মানুষের চিকিৎসা করা অন্যায় নয়। মফস্বলে ডাক্তারের অভাব। আমি অভিজ্ঞ ডাক্তার। এলাকায় আমারা পপুলারিটি আছে।

—আপনি তো সোমদেববাবুর থিয়েটার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট?

—থিয়েটারে আমার আজীবন নেশা। কিন্তু নন্দের মার্ডারকেসের সঙ্গে...

—নাহ্। এ কেসের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নেই।

—তা হলে হঠাৎ ওসব প্রশ্ন কেন?

—আপনি সত্যিই নার্ভের ওষুধ ইনজেক্ট করেছিলেন জয়দেববাবুর শরীরে। তবে তার সঙ্গে মর্ফিয়া গ্রুপের যে ওষুধ ছিল, তার ক্রিয়া বিপজ্জনক। সেটা নার্কোটিক্স্ ছাড়া কিছু নয়। সুস্থ মস্তিষ্কের স্নায়ু ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। হ্যালুমিনেশন রোগ দেখা দেয়। ক্রমশ রোগী শিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়। রিয়্যাল-অ্যানরিয়্যালের তফাত বুঝতে পারে না। সে অবসেশনের মধ্যে থাকে। বিশেষ করে রাতের দিকে এ রোগের লক্ষণ বেড়ে যায়। আপনি এই বিখ্যাত গল্পটি নিশ্চয় জানেন, এক ভদ্রলোক রাত্রে নিজের পোশাক বাগানে পুঁতে রেখে আসতেন। দিনে সেই পোশাক খুঁজে না পেয়ে চাকরকে বকাবকি করতেন। আপনি নিশ্চয় মালো পঁতির 'দা ফেনোমেনোলজি অব পার্সেপশন' বইটা পড়েননি। ওতে এক রোগিণীর কথা আছে। তিনি দিনদুপুরেই চিৎকার করতেন, 'জানালার নিচে একটা লোক! জানালার নিচে একটা লোক!' অথচ কোনও লোককে দেখা যেতনা। কিন্তু রোগিণী তার চেহারা ও পোশাকের ডিটেলস বর্ণনা দিতেন। এই সব রোগীর ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ব্যাপার হল, এঁরা দীর্ঘকাল কোনও উপেক্ষা-তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভোগ করলে এঁদের একটা সাংঘাতিক অবসেশন তৈরি হয়। অবচেতনায় পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর অভিমান কোনও এক মুহূর্তে বার্স্ট করে। তখন তাঁরা এক অন্ধ শক্তির হাতের পুতুল মাত্র। তাঁরা জানেন না কী করছেন।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। ডাক্তারবাবু তেমনি গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে আছেন—পলকহীন। কোনও কথা বললেন না।

কর্নেল বেরিয়ে গিয়ে হনহন করে হাঁটতে থাকলেন। 'নিউমার্কেট' এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে নির্জন রাস্তায় তিনি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বাইনোকুলারে আকাশদর্শনে ব্যস্ত হলেন। বললাম—পাখি?

—আভাঁ গার্দ।

—তার মানে?

—ডার্লিং! এই প্রখ্যাত টার্মটি তোমার জানার কথা।

—কী আশ্চর্য! ওটা তো সমাজতত্ত্বের টার্ম। চিন্তার ক্ষেত্রে যারা এগিয়ে থাকে। অ্যাডভান্স গার্ডের ফরাসি বয়ান। আকাশে তারা থাকে না। তারা মাটির বাসিন্দা।

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে একটু হেসে বললেন—হিমালয় পেরিয়ে আসা সাইবেরীয় হাঁসের একটা আগাম ঝাঁক মালঞ্চীর বিলে যাচ্ছে। একমাস পরে ওরা আলিপুর চিড়িয়াখানার জলায় যাবে। যাই হোক, উত্তেজনার পর চমৎকার একটা রিলিফ পাওয়া গেল।

বলে আবার হাঁটতে থাকলেন। বললাম—আপনি সত্যিই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। ওই গ্রাম্য কোয়াক ডাক্তারবাবুকে অত সব হেভি তত্ত্ব বোঝানোর কি কোনও দরকার ছিল?

—ছিল। তবে গ্রাম্য কোয়াকদের এত ছোট করে দেখো না জয়ন্ত। জন্মগত প্রতিভা এঁদের কারও-কারও থাকে। অশিক্ষিত পটুত্ব বলে একটা কথা আছে। তার জোরে এঁদের কেউ-কেউ তথাকথিত পশ্চিমফেরত বড়-বড় ডিগ্রিধারী ডাক্তারদেরও কান কাটতে পারেন।

—হয় তো পারেন। কিন্তু বুঝতে পারছি না নাড়ুডাক্তার কোন স্বার্থে জয়দেব রায়কে পাগল করতে যাবেন।

—তুমি বড্ড অমনোযোগী, জয়ন্ত! উনি সোমদেবের থিয়েটার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। সোমদেবের প্ররোচনায় এ কাজটা করা ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক। আর জয়দেববাবু পাগল হয়ে গেলে তাঁর উইল অকেজো হয়ে যাবে। পূর্বপুরুষের অমন একটা বাড়ি...

দ্রুত বললাম—আই সি!

কর্নেল গলার স্বর নামিয়ে বললেন—শান্তিদেব বলছিলেন কেন তাঁর বড়দা আমাকে বলেছেন, 'বাবা পাগল হলে আমরা ভেসে যাব', এটা শান্তিদেব বুঝতে পারছেন না। মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কথাটা তা হলে চালাকি?

—পঁচাত্তর বছর বয়সী বুড়ো বাবা। বোঝা যাচ্ছে। একবার মাইনর স্ট্রোক হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনা যে-কোনও মুহূর্তে। কাজেই তাঁকে পাগল করে ফেললে যদি সম্পত্তিটা বাঁচানোর শক্ত চান্স পাওয়া যায়, ছাড়তে চাননি সোমদেববাবু। তাঁর মৃত্যুর পর কোর্টে উইল প্রোবেট করাতে হবে। তখন সোমদেব আপত্তি তুলে বলতে পারবেন, বাবা পাগল অবস্থায় উইল করেছিলেন। কাজেই উইলের বৈধতা নেই।

একটু হেসে বললাম—তাহলে সোমদেব আপনার কাছে গিয়ে ভুল করেছেন!

—নিজের ইচ্ছায় যাননি। কিছু তলিয়ে ভেবেও যাননি। রমার কৌশলে সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার ঘোষের নির্দেশেই আমার কাছে গিয়েছিলেন। ভুলে যেও না।

—হ্যাঁ। দ্যাটস রাইট। কিন্তু ডঃ ঘোষের কাছেই বা কেন গেলেন সোমদেব?

—বাবা যে সত্যি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, তার সার্টিফিকেট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ওঁর নার্সিংহোমে কিছুদিন রাখা হত। কিন্তু জয়দেববাবুর মানসিক বৈকল্য সারানোর আর কোনও উপায়ই নেই সম্ভবত। এ বয়সের শিথিল আর বিকল নার্ভকে সুস্থ করার মতো ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

একটু পরে দেখলাম, আমরা থানার সামনে এসে গেছি। বললাম—আবার থানায়?

—এস তো! বলে কর্নেল আমার হাত ধরে টানলেন। যেন আসামী ধরে নিয়ে যাচ্ছেন।

দোতলায় এবার অফিসার-ইন-চার্জের ঘরে গেলাম আমরা। উর্দিপরা অফিসার সম্ভাষণ করে বসতে বললেন। কর্নেল আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—জয়ন্ত চৌধুরি। সাংবাদিক। জয়ন্ত, ইনি অশোক মজুমদার।

ও সি হাসলেন। —এখানকার লোকে বলে বড়বাবু। 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলিতেছে' আর কী!

—দীপক নিশ্চয় আমার মুণ্ডুপাত করে গেছে?

—সি আই সায়েব একটু আগে বেরুলেন। গ্রামের দিকে একটা এনকোয়ারিতে—যাক্‌গে, ছোকরাকে এনে বসিয়ে রেখেছি দিব্যেশদার ঘরে। এখনই ওর একদঙ্গল লোক এসে ঝামেলা করছিল। দিব্যেশদাকে তো জানেন! বাঙাল বুলিতে তাদের সঙ্গে অনেক জোক-টোক করে সামাল দিয়েছে।

—তা হলে ওর ঘরেই যাই?

ও সি ব্যস্তভাবে বললেন—না, না। কত ভাগ্যে আপনার দর্শন পেয়েছি। মর্নিংয়ে এলেন, তখন তো এক কাপ চা-ও খেলেন না। সরি! আপনি তো কফি ছাড়া কিছু খান না।...

একটু পরে দিব্যেশবাবু এক কেতাদুরস্ত চেহারার যুবকের কাঁধে হাত রেখে এঘরে ঢুকলেন। একেবারে ফিল্মের হিরো। কিন্তু মুখটা গম্ভীর। মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। দিব্যেশবাবু সহাস্যে বললেন—'মুখার্জি কইয়া গেল, কর্নেলসায়েবরে অ্যারেস্ট করবা। আমি ব্যাক না করা পর্যন্ত বওয়াইয়া রাখবা। সি দা অডাসিটি! আমি কইলাম, ফোর্ট উইলিয়াম খবর পাইলে কমান্ডো আইয়া পড়ব।'

বলেই কাঞ্চনের দিকে ঘুরলেন। —ইনি ক্রিসমাসের সান্তাক্লজ নন ভাইটি! মিলিটারির কর্নেলসায়েব। না, না! ভয় পাইবা না। নামেই কর্নেল। ওই দেখ, গলায় কী ঝুলতাছে। পাখি দেখা যন্তর। পাখি ছাড়া কিছু দ্যাখেন না। মানুষজন ব্যাবাক। বও ভাইটি বও!'

কর্নেল বললেন—বসো, কাঞ্চন!

এমন ভঙ্গিতে বললেন যেন কতকালের চেনা। কাঞ্চন কুণ্ঠিতভাবে বসল।

কর্নেল বিনা ভূমিকায় বললেন—রমা আমাকে বলছিল, পারুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে পারু সুখী হত। কিন্তু পারুর বাবা একে মাস্টারমশাই, তাতে পাগল। রমার কাছেই শুনলাম, বিয়ের পরও পারুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছিল। রমা এ-ও বলল, তোমাদের গোপনে দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিত সে।

কর্নেল নিশ্চয় এতগুলো চমৎকার মিথ্যা আওড়ে গেলেন। কাঞ্চন মুখ নামিয়ে বসে রইল।

—পারু গলায় দড়ি দিয়ে মরত না, যদি সে-রাতে তুমি ওর কথামতো যেতে। রমা তোমাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করত। পারু তৈরি ছিল। তুমি গেলে না। কেন যাওনি কাঞ্চন? তুমি গেলে মেয়েটা সুইসাইড করত না।

কাঞ্চন মুখ তুলে আস্তে আস্তে বলল—গিয়েছিলাম।

—পারু কথামতো বাগানে অপেক্ষা করছিল?

—হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ আমাদের ওপর টর্চের আলো পড়ল। আমি নদীর দিকের দরজা খুলে পালিয়ে গেলাম।

—টর্চের আলো পড়েছিল?

—হ্যাঁ।

কর্নেল বললেন—এই যথেষ্ট। দিবোশ! কাঞ্চনকে ছুটি দাও...

॥ ছয় ॥

আমরা সাইকেল রিকশোয় চেপে রায়ভবনে ফিরছিলাম। পথে যেতে যেতে বললাম—রমা দেবীর নামে আপনি একরাশ মিথ্যা আওড়ে গেলেন দেখে অবাক লাগছিল।

কর্নেল একটু হাসলেন। —কোনও জিনিস সত্য কি না সেটা মিথ্যা দিয়েই বাজিয়ে নিতে হয়। নৈলে সত্য-মিথ্যার তফাত বোঝা যায় না। আমার থিওরি সত্য কি না, যাচাই করতে মিথ্যার দরকার ছিল।

—কী আপনার থিওরি?

—মাঝেমাঝে পারুর এই রাতের অভিসার খুনী টের পেয়েছিল। তাই সে সে-রাতে তৈরি ছিল। কাঞ্চন পালিয়ে যাওয়ার পর খুনী গিয়ে পড়ে পারুর মুখোমুখি। পারু সম্ভবত চলে আসার জন্য ঘুরে পা বাড়াতেই খুনী তার পিঠে মারাত্মক ইঞ্জেকশনের নিডল ঢুকিয়ে দেয়। পারু মারা পড়ে। তুমি লক্ষ্য করেছ কি নন্দের ঘর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে? পারু নিশ্চয় অন্তিম আর্তনাদ করেছিল। নন্দ ছুটে গিয়ে খুনী ও পারুর সামনে পড়ে। এ অবস্থায় যে কি না বাড়ির বংশগত পুরাতন ভৃত্য, সেই নন্দ কী করতে পারে? খুনী বাড়িরই লোক। তাকে তো সে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারে না। এ একটা পারিবারিক ট্র্যাজেডি নয় কি? অতএব নন্দ বাড়িরই অন্য কোনও লোকের সাহায্যে গলায় দড়ি বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে সাজায়। হ্যাঁ—কমলেশ যে ছবি এঁকে ব্যাপারটা দেখিয়েছে, সেই পদ্ধতিতেই কাজটা করা হয়। বাড়ির সাহায্যকারী লোকটি এবং নন্দ দুজনেরই স্বাভাবিক সন্দেহ হতে পারে, পারুকে কী ভাবে মারা হল? দেহে ক্ষতচিহ্ন নেই, অথচ মৃত!

—তাহলে ধরে নিচ্ছি বডিতে আঘাতের চিহ্ন খুঁজতে গিয়েই পিঠে ইঞ্জেকশনের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল ওরা। কিন্তু সেই চিহ্ন তো সূক্ষ্ম!

—জয়ন্ত! এভাবে অতর্কিতে দেহে ইঞ্জেকশনের নিড্‌ল ঢোকালে রক্তচিহ্ন থাকা স্বাভাবিক। কাজেই পিঠে কোনও ভোঁতা জিনিস ঘষে ছড়ে যাওয়ার ক্ষত তৈরি করে দুজনে।

সাহায্যকারী নিশ্চয় সোমদেব? নাকি শান্তিদেব?

কর্নেল চুপ করে রইলেন। একটু পরে বাইনোকুলারে আকাশ দেখতে থাকলেন। রায়ভবনের ফটকে রিকশো থেকে নেমে দেখলাম, রমা এদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। ভেতরে ঢুকলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বললেন—বাবামশাইয়ের আবার

পাগলামি বেড়ে গেছে। ওঁর ঘরে একটা মরচেধরা তলোয়ার আছে। সেটা দিয়ে আঙুল কেটে রক্তারক্তি করেছেন। টিংকুর জেঠুকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি দুঘণ্টা আগে। এখনও ফিরছেন না। এখনই এ টি এস এনে দেওয়া দরকার। টিটেনাস হয়ে যেতে পারে। ডেটল দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে অবশ্য।

আমরা জয়দেববাবুর ঘরে গেলাম। দেখলাম, ডানহাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে পট্টিবাঁধা। খাটে বসে ছোট্ট ব্রাশ দিয়ে একটা কালচে চাকতি সাফ করছেন। আমরা ঢোকামাত্র ফুঁসে উঠলেন—ট্রেসপাসার্স্ উইল বি প্রসিকিউটেড। গেট আউট! গেট আউট ফ্রম মাই মিউজিয়াম!

রমা দ্রুত বললেন—বাবামশাই! ইনি কর্নেলসায়েব আর ইনি কাগজের রিপোর্টার। এঁদের সঙ্গে আপনার তো আলাপ হয়েছে।

জয়দেব রায় একটা ছোট্ট শিশিতে ব্রাশ চুবিয়ে চাকতিতে ঘষতে ঘষতে ফের বললেন—ট্রেসপাসার্স্ উইল বি প্রসিকিউটেড।

কর্নেল বললেন—জয়দেববাবু, শুধু নিকোটোমাইন সলিউশন দিয়ে চাকতিটা সাফ হবে না। খানিকটা প্যারাফিন অয়েল মিশিয়ে নেবেন। নইলে হিতে বিপরীত হবে। সব সাইন মুছে যাবে।

জয়দেব রুষ্ট চোখে তাকিয়ে গর্জন করলেন—ডোন্ট ডিসটার্ব মি। গেট আউট! তারপর সেই 'পালযুগ বা গুপ্তযুগের' তলোয়ার তুলে উঠে দাঁড়ালেন।

আমরা বেরিয়ে এলাম। জয়দেব এসে দরজা জোরে বন্ধ করে দিলেন ভেতর থেকে। রমা কেঁদে ফেললেন। কর্নেল বললেন—কেঁদে কী হবে রমা? আমার সঙ্গে এস।

আমরা গেস্ট হাউসে উঠে এলাম। কর্নেল বসে একটা চুরুট ধরিয়ে রমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। রমা দ্বিধার সঙ্গে বসে বললেন —টিংকুর জেঠুর এত দেরি হচ্ছে কেন, বুঝতে পারছি না। নাড়ু-বাবুকে বললেই তো ছুটে আসবেন।

—নাড়ুবাবু আর এবাড়ির ছায়া মাড়াবেন না।

রমা চমকে উঠে বললেন—সেকি! কেন?

—উনি এ বাড়িরই একজনের চক্রান্তে তোমার শ্বশুরকে পাগল সাব্যস্ত করার জন্য নার্কোটিক ড্রাগ ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন। ওঁর মৃত্যুর পর কোদালিয়ার প্রত্ন-সংরক্ষণ সমিতি উইলের ভিত্তিতে বাড়ির দখল নিতে এলে আদালতে উইল চ্যালেঞ্জ করা যাবে যে, তোমার শ্বশুর উন্মাদ অবস্থায় উইল করে গেছেন।

রমা তাকিয়ে রইলেন। একটু পরে ফুঁপিয়ে উঠে মাথা নাড়লেন। —না। না। কে এমন চক্রান্ত করবে?

—তোমার ভাসুর এই কাজটি করেছেন। যাইহোক, তোমার শ্বশুরকে যত শিগগির পারো ডাঃ ঘোষের সাহায্য নিয়ে যে নার্সিং হোমে বা হাসপাতালে নার্কোটিক ড্রাগে আসক্ত রোগীদের চিকিৎসা হয়, সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করো। তোমার স্বামীকে বলো। তবে তোমার ভাসুর এই চক্রান্ত করেছিলেন, এ কথা যেন ভুলেও বোলো না। পারিবারিক অশান্তি বাড়বে।

রমা চোখ মুখে বললে—এ বাড়িতে আমার একটুও থাকতে ইচ্ছে করে না। টুংকুর বাবারও না। ফার্মহাউসে বাড়ি করা আছে। আমরা বরং সেখানেই চলে যাব।

—তাই যেও। সোমদেবের শাস্তি পাওয়া দরকার। আমি নিরুপায়। আইন নিজের পথে চলবে। সোমদেব এবং নাড়ুবাবু তার ফল ভুগবেন। আর শোনো, আমরা খেয়ে নিয়েই কলকাতা ফিরব।

রমা উঠে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। তারপর বললেন—কিন্তু কমলেশ পারু বা নন্দকে মেরেছে, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। সে এত ভাল...

কান্না সামলাতে না পেরে রমা বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল গোছগাছ শুরু করলেন। বললেন—স্নান করছি না। তুমিও কোরো না। সাড়ে বারাটায় একটা ট্রেন আছে। ওই ট্রেনটা ধরতেই হবে। কলকাতা ফিরে ট্রাঙ্ককলে দিব্যেশকে যা জানাবার জানাব। সোমদেব অ্যান্ড দ্যাট কোয়াক ডক্টর মাস্ট্ বি পানিশড।

—কিন্তু কমলেশ কি সত্যিই পারু এবং নন্দকে..

কর্নেল হঠাৎ চটে গেলেন। —ইউ ফুল! জয়দেববাবুর ঘরে নিকোটোমাইন সলিউশন দেখে এখনও বুঝতে পারছ না কী ঘটেছে? বুঝতে পারছ না তোমার হাত থেকে ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ কেড়ে কেন ছুঁড়ে ফেলতে হল জয়দেববাবুকে?

—মাই গুডনেস! তা হলে জয়দেববাবু নিজের মেয়েকে খুন করেছিলেন?

—দ্য সাইকিক কিলার'স ভায়োলেন্ট রিঅ্যাকশন। নন্দ সেই খুনের সাক্ষী। নন্দ পাগলা মনিবকে বাঁচাতে কমলেশের সাহায্য নিয়েছিল। জয়দেববাবুর উইলে তাঁর প্রিয় ছাত্র কমলেশ উত্তরাধিকারী। কাজেই তার বিরুদ্ধে অবসেশনে জয়দেবের কোনও ঘৃণা নেই, বরং আছে প্রগাঢ় স্নেহ।

কিন্তু নন্দ খুনের সাক্ষী হয়ে রইল। তা ছাড়া কল্পিত সিল চুরির অবসেশনে আক্রান্ত জয়দেব। তাই নন্দকে মরতে হল। শ্বশুরকে বাঁচাতে কমলেশ আগের পদ্ধতিতে নন্দের বডি ঝোলাল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না মর্গের নতুন ডাক্তারের সতর্কতায়। তখন কমলেশ সমস্ত দায় নিজের কাঁধে নিল। তোমার মনে পড়ছে গতরাতে দীপক মুখার্জিকে বলছিলাম, 'ক্ষুদিরামস্ আর স্টিল বর্ন্ অ্যান্ড ডাই।'

—কিন্তু রমা বলছেন, সে রাতে কমলেশ ও নন্দ বাগানে যায়। পরে কমলেশ পালিয়ে আসে।

—সরল ব্যাখ্যা সম্ভব। দুজনে নদীর ঘাটে জ্যোৎস্না রাতে বেড়াতে যেত—রমাই বলেছে। জয়দেব ঘাটে ওত পেতে ছিলেন। নন্দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইঞ্জেকশনের নিডল ঢুকিয়ে দেন। হতবুদ্ধি কমলেশ পালিয়ে আসে। পরে বুদ্ধি করে সোমদেবের থিয়েটারের আসবাবের ঘর থেকে দড়ি নিয়ে গিয়ে নন্দের বডি একই পদ্ধতিতে ঝোলায়।

উত্তেজনায় একটা সিগারেট ধরাতে হল। আজকাল সিগারেট কদাচিৎ টানি। বললাম—কিন্তু কমলেশ নির্দোষ। তাকে বাঁচাবেন না?

—কমলেশ বেঁচে যাবে। মানিক চ্যাটার্জিরা আছে। তুমি শুনেছ, ইতিমধ্যে পলিটিক্যাল প্রেসার এসেছে। এস ডি পি ও প্রেসারের মুখে পড়েছেন। এটা আইনের দিক থেকে

অন্যায়। কিন্তু মানুষের জন্য আইন, না আইনের জন্য মানুষ, ডার্লিং? একজন নির্দো সৎ বিবেকবান যুবককে বাঁচাতে আইনকে কেউ যদি লাথি মারে—পলিটিক্যাল প্রেস তো দূরের কথা, আই ওয়েলকাম এনি সর্ট অব ড্যাম থিং।

একটু হেসে বলল—খুনের রহস্যটা চাপা থেকে যাবে?

—আই কোট জয়দেব রায়। 'সমাজের হিতসাধনের জন্য সবকিছু করা চলে রহস্য তুমি-আমি জানলাম। দ্যাটস এনাফ। রহস্য চাপা থেকে বরং এই বাড়িটা এক মিউজিয়াম হোক। এখানে একটা প্রত্ন-গবেষণাকেন্দ্র হোক। দেশবিদেশের পণ্ডিত আসুন। সেই মহৎ উদ্দেশ্যের স্বার্থে একটা কেন, একশো রহস্য চাপা রাখতে আমা আপত্তি নেই।

বলে কর্নেল ব্যালকনিতে গেলেন। সেখান থেকে ফের বললেন—হতভাগিনী পা আর হতভাগ্য নন্দের জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে ডার্লিং! কিন্তু তাদের মৃত্যুর শোধ নিতে একজন বৃদ্ধ সাইকিক কিলারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে লাভ কী? এর জন্য প্রকৃত দোষী তো সোমদেব এবং নাড়ু ডাক্তার। তাদেরই শাস্তি হওয়ার দরকার। জয়দেববাবু যদি চিকিৎসায় সেরে ওঠেন এবং স্মৃতি ফিরে পান, তাহলে অজ্ঞানে অবচেতন হিংসায় যে সাংঘাতিক অপরাধ করে ফেলেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত নিজেই করবেন। লেট আস ওয়েট অ্যান্ড সি।...

কলকাতায় ফেরার পরদিন বিকেলে অফিস থেকে কর্নেলকে ফোন করলাম। আমার সাড়া পেয়েই বৃদ্ধ রহস্যভেদী বললেন—এবার দৈনিক সত্যসেবককে খরোষ্ঠীলিপিরহস্য উপহার দিতে পারো ডার্লিং! সোমদেব রায় এবং ডাঃ নাড়ুগোপাল চক্রবর্তীকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছেন। জয়দেব রায় কলকাতায় সাইকিয়াট্রিক ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছেন।

বললাম—শুধু দুটো পয়েন্ট ব্যাখ্যা করুন। সে রাতে জয়দেববাবু টর্চ জ্বেলে বাগানে কেন গিয়েছিলেন?

—ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ খুঁজতে।

—গেস্টরুমের সিঁড়ির নিচের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল কে?

—আবার কে? জয়দেব রায়। সারারাত অবসেসনের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে উনি জ্যান্ত প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াতেন। তোমাকে বলেছিলাম, শিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীর কাছে বাস্তব-অবাস্তব একাকার হয়ে যায়। সে কী করছে নিজেই জানে না। পরে যখন জানতে পারে কী করেছে, যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে। প্রত্ন-তলোয়ার দিয়ে জয়দেবের হাতের আঙুল কাটার চেষ্টা সেই প্রতিক্রিয়া। সেই রোগী চেতনা-অবচেতনার মধ্যে সবসময় ছোটাছুটি করে বেড়ায়। আর একটা কথা। সোমদেব হাতে ছড়ি রাখেন। ওটা ওঁর আত্মরক্ষার অস্ত্র।

—থ্যাংকস বুঝেছি।

টেলিফোন ছেড়ে কাগজের জন্য 'স্টোরি' লিখতে প্যাড টেনে নিলাম।...

# কর্নেলের জার্নাল থেকে

[হো]টেল দা শার্কের দোতলার ব্যালকনিতে বসে চুরুট টানছিলাম। তখন রাত প্রায় [দ]শটা! সামনে একটা বালিয়াড়ির ওধারে সমুদ্র। ডানদিকে টানা ঝাউবন চলে গেছে [প্র]ায় আধ কিলোমিটার। সমুদ্রের শব্দের সঙ্গে ঝাউবনের শব্দ মিলেমিশে এক রহস্যময় [অ]পার্থিব অর্কেস্ট্রা শোন যায়! যত রাত বাড়ে, অর্কেস্ট্রা আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে। [ত]ন্ময় হয়ে শুনছিলাম।.

হঠাৎ ঝাউবনের ভেতর টর্চের আলোর ঝলকানি।

গত রাতেও এই আলোর ঝলকানি দেখেছি। ভেবেছিলাম কেউ বা কারা রাতের [স]মুদ্র দেখার জন্য বিচে বসেছিল। এতক্ষণে ফিরে আসছে। কোনও দম্পতি, কিংবা কোনও প্রেমিক-প্রেমিকা, অথবা কোনও নিঃসঙ্গ মানুষ।

একটু পরে অবাক হলাম। আলোটা গত রাতে তিনবার জ্বলে উঠতে দেখেছি। আজও তেমনি তিনবার জ্বলল তারপর আর কোনও আলো জ্বলল না। ওদিকটা ঘন অন্ধকার। ঝাউবনটা এই হোটেলের সামনাসামনি ডানদিকে যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানে খোলামেলা বালিয়াড়ি। হোটেলের আলোয় জায়গাটা মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যায়! ঝাউবন থেকে কেউ এলেই চোখে পড়ার কথা। কিন্তু কাল রাতের মতো আজও কাকেও দেখতে পেলাম না।

দিনে দেখেছি, ঝাউবন থেকে সোজা নেমে আসার কোনও পথ নেই। নিচে ঘন কেয়াবন আর গুল্মজাতীয় জঙ্গল। সাপের উৎপাত থাকা সম্ভব। সোজাসুজি জঙ্গল ভেঙে সমুদ্রের সমান্তরাল পিচ রাস্তায় ওঠা যায়। কিন্তু ভ্রমণবিলাসীদের পক্ষে সেটা রীতিমতো একটা অ্যাডভেঞ্চারের শামিল।

ধরা যাক, কেউ বা কারা অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ নিতে জঙ্গল ভেঙে রাস্তায় উঠল। কিন্তু হাতে যখন টর্চ আছে, তখন আলো সে জ্বালবেই।

অথচ আর আলোর পাত্তা নেই।

দ্বিতীয়ত, আলোটা তিনবার জ্বলতে দেখলাম পর পর দুটো রাত।

কোনও গোপন সংকেত নাকি?

চন্দনপুর-অন-সিতে অ্যান্টি-ড্রাগ সেমিনারে যোগ দিতে এসেছি। উদ্বোধন করে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেমিনার ব্যাপারটা আমি মোটেও পছন্দ করি না কিন্তু আমার এক বন্ধু ডঃ শক্তিপদ ব্রহ্মের অনুরোধ (তাঁর মাদকবিরোধী সমিতিই এর উদ্যোক্তা) ঠেলতে

পারিনি। এ ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। চন্দনপুর-অন-সিতে সমুদ্রের বনান্ত আমাকে আকর্ষণ করে। কয়েকবারই নানা সুযোগে এখানে তাই এসেছি। এলাকাটা আমার নখদর্পণে।

আলোর ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামানো নিরর্থক! সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন ঝাউবনে এসে যেন শোকের হাহাকারে পরিণত হচ্ছে, এর চেয়ে আকর্ষণীয় আর কি হতে পারে?

একটু পরে দরজায় কেউ নক করল. বিরক্ত হয়ে উঠে গেলাম। দরজা খুলে দেখি ডঃ ব্রহ্ম। বললেন, "শুয়ে পড়েছিলেন নাকি?"

বললাম, "নাহ্। আসুন।"

ডঃ ব্রহ্ম চাপা গলায় বললেন, "একটা জরুরি দরকারে আসতে হলো।"

দরজা এঁটে ওঁকে ব্যালকনিতে নিয়ে এলাম। বললাম, "আপনাকে একটু উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। শরীর খারাপ নয় তো?"

ডঃ ব্রহ্ম আস্তে বললেন, "না। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করছি দুদিন থেকে।"

"ঝাউবনে টর্চের আলো?"

"আলো? ঝাউবনে?" ডঃ ব্রহ্ম একটু থামলেন। "নাহ্। আলোটালো নয়। ডঃ মৈত্রের সঙ্গে যে মহিলা এসেছে, সম্ভবত উনি তাঁর স্ত্রী নন।"

একটু অবাক হয়ে বললাম, "আপনি অধ্যাপিকা মহিলার কথা বলছেন কি?"

"হ্যাঁ। প্রথমত, মহিলার পদবী দাশগুপ্তা। দ্বিতীয়ত, আমাকে ক্ষমা করবেন, অমিতা দাশগুপ্তাকে আমি এক যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছি। দে ওয়ার কিসিং ইচ আদার। পার্ভার্টেড মহিলা।" ডঃ ব্রহ্মের কথায় ঘৃণার ছাপ।

"যুবকটি কে?"

"ডঃ মৈত্রের সঙ্গে এসেছে। পঁচিশের মধ্যে বয়স। এদিকে ডঃ মৈত্র আমার বয়সী। পঞ্চাশোর্ধ্ব। স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছেন অধ্যাপিকা দাশগুপ্তার। তাঁর বয়স তিরিশের বেশি নয়।"

হাসতে হাসতে বললাম, "তাতে কী? শুনুন ডঃ ব্রহ্ম, ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলিয়ে অকারণ—"

আমাকে থামিয়ে ডঃ ব্রহ্ম বললেন, "আমি একজন মর্যালিস্ট, কর্নেল সরকার। তাছাড়া এই অ্যান্টি-ড্রাগ ক্যাম্পেনে মর্যালিটির ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। এখন কথা হলো, সর্ষের মধ্যে ভূত থাকা কি বাঞ্ছনীয়? যুবকটিকে দেখে আবার সন্দেহ হয়, সে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট। ওর চেহারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন।"

চুরুটে জোরালো টান দিয়ে বললাম, "আমিও কতকটা ড্রাগ অ্যাডিক্ট নই কি ডঃ ব্রহ্ম? এই চুরুট এবং প্রচুর কফি আমার এই বয়সে ভীষণ ক্ষতিকর। তবু দেখুন এ দুটো ছাড়লে আমার জীবন যেন অনুর্বর হয়ে যাবে। চিন্তাভাবনা থেমে যাবে মনে হয়—যা কি না যে কোনও নেশার ক্ষেত্রে একটা মানসিকতা।"

ডঃ ব্রহ্ম হাসলেন। "নাহ্ কর্নেল সরকার! চুরুট বা কফি নার্কোটিকসের আওতায় পড়ে না।"

বললাম, "যুবকটির নাম কী জানেন?"

"কৌশলে ডঃ মৈত্রের কাছে জেনে নিয়েছি। আশিস সেন। সে নাকি ডঃ মৈত্রের ল্যাবরেটরির অ্যাসিস্ট্যান্ট। আপনি তো সেমিনারে ডঃ মৈত্রের মুখে শুনেছেন, উনি অ্যান্টি-ড্রাগ প্রবণতা সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করছেন। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা।"

"হ্যাঁ। একটা ওষুধ আবিষ্কার করতে চান। যা ইঞ্জেক্ট করলে নাকি ড্রাগ-অ্যাডিক্ট নেশা ছেড়ে দেবে এবং তার স্বাভাবিক দেহমন ফিরে পাবে।"

ডঃ ব্রহ্ম আস্তে বললেন, "যাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট মাদকাসক্ত, তিনি কী করে অমন বড়-বড় কথা বলেন?"

"ডঃ ব্রহ্ম! এমন তো হতে পারে উনি ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্টের ওপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন?"

ডঃ ব্রহ্ম একটু চুপ করে থেকে বললেন, "মে বি। বাট আই কান্ট টলারেট দ্যাট পার্ভার্টেড লেডি-অধ্যাপিকা অমিতা দাশগুপ্তা! সেমিনার কাল শেষ হচ্ছে। কলকাতায় ফিরে মহিলার মেম্বারশিপ ক্যান্সেলের জন্য মিটিং ডাকব।"

বলেই ডঃ ব্রহ্ম "গুডনাইট" জানিয়ে চলে গেলেন। জানি প্রচণ্ড নীতিবাগীশ মানুষ উনি। ডঃ মৈত্র আমার সঙ্গে কথা না বললেও কিংবা কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলেও আশিসকে আমি লক্ষ্য করেছি। শান্ত উদাসীন প্রকৃতির যুবক। সম্ভবত কবিতা লেখে। কারণ ওর হাতে কবিতার বই দেখেছি। আজকাল শুধু কবিরাই কবিতা পড়ে।

কিন্তু তার চেহারায় মাদকাসক্তের ছাপ তো লক্ষ্য করিনি।

ডঃ ব্রহ্ম তাকে এবং মিসেস দাশগুপ্তাকে চুমু খেতে দেখেছেন! সত্যিই দেখেছেন, নাকি—

দরজায় আবার কেউ নক করল।

খুলে দেখি, ডঃ সুদর্শন মৈত্র। নমস্কার করে বললেন, "অসময়ে একটু বিরক্ত করতে এলাম।"

"না, না। আমি এগারোটার আগে শুই না। আসুন।"

ব্যালকনিতে বসে ডঃ মৈত্র একটু হেসে বললেন, "দেশবিদেশে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার রহস্যভেদী হিসেবে সুপরিচিত। এ হেন মানুষের কাছে যদি একটা রহস্যভেদের জন্য অনুরোধ জানাই, আশা করি বিমুখ করবেন না।"

একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, "দেখুন ডঃ মৈত্র, আমার বয়স হয়েছে। দাড়ি এবং টাকের অবস্থা লক্ষ্য করুন।"

ডঃ মৈত্র প্রায় অট্টহাসি হাসলেন এবার। "আমি জানি, এ বয়সেও আপনি সিংহের চেয়ে শক্তিমান! এনিওয়ে, আমার রহস্যটা সামান্য।"

অগত্যা বললাম, "বলুন ডঃ মৈত্র।"

ডঃ মৈত্র চাপা স্বরে বললেন, "এই সেমিনারটা হোক্স বলে মনে হচ্ছে আমার। এর উদ্যোক্তা মাদকবিরোধী সমিতি। তার চেয়ারম্যান ডঃ শক্তিপদ ব্রহ্ম গত রাতে এবং আজ কিছুক্ষণ আগে চুপিচুপি কোথায় বেরিয়েছিলেন? উনি বেরিয়ে যাওয়ার পরই বা, ওই ঝাউবনে তিনবার আলোর সিগন্যাল দেখা যায় কেন?"

চমকে উঠলাম। কিন্তু উত্তেজনা চেপে বললাম, "আপনি কি ওঁর প্রতি লক্ষ্য রাখেন"

"রাখি বলতে পারেন।"

"বিশেষ কোনও কারণ আছে?"

"আছে। এখানে গত পরশু আমি সস্ত্রীক পৌঁছেছি—"

"জাস্ট আ কোয়েশ্চন, প্লিজ আনসার ইট। আপনার স্ত্রী আপনার পদবী নেননি, এর কারণ কি নেহাত অফিসিয়্যাল অর টেকনিক্যাল?"

"দ্যাটস রাইট কর্নেল সরকার। আমরা একটু দেরিতে বিয়ে করেছি। সদ্য দুমাস আগে। এবার গিয়ে নোটারি পাবলিকের থ্রু দিয়ে কোর্টে অমিতা এফিডেবিট দিয়ে পদবি বদলাবে।"

"হুঁ, বলুন!"

"গত পরশু পৌঁছে ক্যান্টিনে খেতে গিয়েছিলাম। আমরা উঠেছি স্যুট নাম্বার ফোরে। নিচের তলায়। তো খেয়ে ফিরে দেখি, আমার ব্রিফকেস খোলা। ওতে আমার সেমিনার পেপারের দশটা কপি ছিল। একটা নেই। কাকেও বলিনি। সামান্য ব্যাপার। ভাবলাম আমারও ভুল হতে পারে। যাই হোক, গতকাল বিকেলে দেখি ডঃ ব্রহ্মের ঘরের পেছনে সেই পেপার—মোট ছটা জেরক্স করা পাতা কুচিকুচি হয়ে পড়ে আছে। আজ মর্নিং সেসনে ডঃ ব্রহ্ম আমার থিম নিয়েই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। হাউ ইট ইজ পসিবিল? ওঁর সাবজেক্ট তো সম্পূর্ণ আলাদা।"

"আপনার অ্যাসিস্ট্যান্টকে সঙ্গে এনেছেন দেখেছি!"

"হ্যাঁ। আশিস অত্যন্ত বিশ্বাসী ছেলে।"

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "আমি কী করতে পারি, বলুন ডঃ মৈত্র?"

ডঃ মৈত্র ফিসফিস করে বললেন, "ডঃ ব্রহ্ম সম্ভবত এখানে সেমিনারের ছলে ড্রাগপাচারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এসেছেন! আপনি ওঁর দিকে লক্ষ্য রাখুন!"

ডঃ মৈত্র তখনই চলে গেলেন।...

কলকাতা ছেড়ে বাইরে গেলেই মর্নিংওয়াক না করে পারি না। সঙ্গে থাকে প্রজাপতিধরা নেট এবং স্টিক। স্টিকটি ছড়ির মতো ব্যবহার করা যায়। বাইনোকুলার এবং ক্যামেরাও গলা থেকে ঝোলে। ভোর ছ'টায় উঠে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পিচরাস্তা ধরে এক কিলোমিটার হেঁটে বাঁদিকে গুল্মঝোপ ভেঙে বালিয়াড়িতে উঠলাম। আধ কিলোমিটার হাঁটার পর ঝাউবনের ভেতর দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখলাম। সমুদ্র থেকে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড লাল চাকা এক লাফে আকাশে উঠল। আদিগন্ত সমুদ্র লাল হয়ে গেল। এ এক অলৌকিক দৃশ্য!

ক্যামেরায় ছবি তুলে ঝাউবনের ভেতর দিকে হাঁটতে থাকলাম। ঝাউবনের মাটিতে অজস্র পায়ের ছাপ। অনেকখানি হাঁটার পর বাঁদিকের নিচে কেয়াঝোপে একপাটি স্লিপার চোখে পড়ল। লাল দু'ফিতের মেয়েদের স্লিপার।

স্লিপারটা ছেঁড়া নয়। তাই নেমে গিয়ে ওটা কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলাম। তারপর হঠাৎ মাথায় একটা অদ্ভুত খেয়াল চাপল। ওটা কুড়িয়ে নিয়ে বালিতে পুঁতে একটা শুকনো ডাল ফেলে রাখলাম, যাতে পরে জায়গাটা চিনতে পারি।

জানি না কেন এটা করলাম।

আবার ঝাউবনে উঠে কয়েক পা হাঁটার পর চোখে পড়ল বাঁদিকে, নিচে একটা কাঁটাঝোপে কী একটা জিনিস আটকে আছে। সূর্যের প্রথম আলোয় ইঞ্চি দুই লম্বা জিনিসটা ঝিকমিক করছে। নেমে গিয়ে দেখি, নীল শাড়ির একটু অংশ।

কিন্তু ওই অংশটুকু কোনও পুরনো শাড়ির নয়। তুলে নিয়ে টেনে দেখলাম, আমার ধারণা ঠিক। ফাইবারগুলো শক্ত এবং সিন্থেটিক ফাইবার।

তারপরই মনে পড়ে গেল, অধ্যাপিকা অমিতা দাশগুপ্তার পরনে গতকাল বিকেলে নীল শাড়ি দেখেছিলাম।

ব্যাপারটা খাতিয়ে দেখা দরকার। কাপড়টুকু পকেটস্থ করলাম। তারপর আবার ঝাউবনে উঠে কিছুটা এগিয়ে ডাইনে সমুদ্রের বিচে নেমে গেলাম।

বিচে ভিড় জমে গেছে। প্রথম সকালের টাটকা সমুদ্র দেখার নেশা মানুষজনকে পেয়ে বসেছে। নুলিয়ারা কাঠের ভেলা ভাসিয়ে ব্রেকওয়াটার পেরিয়ে মধ্যসমুদ্রে পৌঁছুনোর জন্য লড়াই করছে। সমুদ্র ওদের ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু ওরা সমুদ্রে যাবেই যাবে। না গেলে সারাদিন উপোস।

ভিড় থেকে দূরে একলা দাঁড়িয়ে আছেন ডঃ শক্তিপদ ব্রহ্ম। কাছে গেলে আমাকে দেখে সম্ভাষণ করলেন, "গুড মর্নিং!"

"মর্নিং ডঃ ব্রহ্ম!"

ডঃ ব্রহ্ম বাঁকা হেসে আমাকে ইশারায় দেখালেন, ডঃ মৈত্র এবং আশিস পুরনো লাইটহাউসের দিকে এগিয়ে চলেছেন। লাইটহাউসটা পূর্বে এবং এখান থেকে বড় জোর শ'পাঁচেক মিটার দূরে। বাইনোকুলারে ওঁদের দেখে একটু উদ্বিগ্ন হলাম। দুজনের মুখের একটা পাশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লেন্স অ্যাডজাস্ট করলে মুখের অংশ আরও স্পষ্ট হলো। দুটি মুখেই কী এক বিহ্বলতার ছাপ। দুজনে লাইটহাউসের ওধারে অদৃশ্য হলেন।

ডঃ ব্রহ্ম আস্তে বললেন, "কী বুঝলেন বলুন কর্নেল সরকার?"

বাইনোকুলার নামিয়ে রেখে বললাম, "কিছু বুঝলাম না।"

"আপনি বাইনোকুলারে দেখেও কিছু বুঝলেন না?" হাসলেন ডঃ ব্রহ্ম। "আমি কিন্তু বুঝেছি।"

"কী বুঝেছেন?"

"মান-অভিমানের পালা চলেছে। শ্রীমতী সম্ভবত রাগ করে ওখানে কোথাও বসে আছেন!"

"দেখেছেন যেতে?"

মাথা নাড়লেন ডঃ ব্রহ্ম। "নাহ্। ওইরকমভাবে দুই পুরুষের যাওয়া দেখে তা-ই মনে হচ্ছিল।"

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "আচ্ছা ডঃ ব্রহ্ম, শুনেছি ডঃ মৈত্র যে গবেষণাটা করছেন, সেটা নাকি বৈপ্লবিক ব্যাপার ঘটাবে?"

"বোগাস। আমার ধারণা, ভদ্রলোক বিদেশ থেকে কারও থিসিস চুরি করে এনেছেন।"

হাসতে হাসতে বললাম, "আপনি ওঁর ওপর কেন যেন রুষ্ট!"

"হব না রুষ্ট?" ডঃ ব্রহ্ম প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন। "একে-ওকে বলে বেড়াচ্ছেন আমি ওঁর সেমিনার পেপারের কপি চুরি করে সেটা নষ্ট করেছি।"

"কীভাবে নষ্ট করেছেন?"

ডঃ ব্রহ্ম অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসলেন। "ছিঁড়ে কুচিকুচি করেছি নাকি। আমার ধারণা, ওই ছোকরাকে দিয়ে একটা কপি ছিঁড়ে ডঃ মৈত্র আমার ঘরের জানালার পেছনে ফেলতে বলেছিলেন।"

"কুচিগুলো পড়েছিল তাহলে?"

"ছিল। এটাই আশ্চর্য! কেন আমি ওসব ট্র্যাপে হাত দিতে যাব বলুন। আমার সাবজেক্ট তো আলাদা।"

"ডঃ ব্রহ্ম, ওঁর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?"

"মুখোমুখি আলাপ এখানে এসে। ওঁর নাম রেকমেন্ড করেছিলেন আমাদের সমিতির একজন মেম্বার। আমি ভুল করে ফেলেছি।"

"অধ্যাপিকা দাশগুপ্তার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ কতদিন আগে?"

"মাস তিনেক। উনি কাগজে সমিতির বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করেছিলেন।"

"তখন উনি অবিবাহিতা ছিলেন কি?"

"হ্যাঁঃ" বলে ডঃ ব্রহ্ম পা বাড়ালেন। "আসি কর্নেল সরকার! সকাল ন'টায় সভা বসবে। প্রিপারেশন দরকার। আপনি এই সেশনে অবশ্য থাকবেন যেন।"

ডঃ ব্রহ্ম চলে গেলেন। বাইনোকুলারে আবার লাইটহাউসের দিকটা দেখছিলাম। ডঃ মৈত্র ফিরে আসছেন। পেছনে আশিস সেন। দুটি মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। উদ্বেগের ছাপ গাঢ়। মনে মনে চাইছিলাম, এই সুন্দর সকালে যেন কোনও দুঃসংবাদ শুনতে না হয়।

একটু পরে ওঁরা মোড় নিয়ে বালিয়াড়িতে উঠলেন। তখন ওঁদের অনুসরণ করলাম। হোটেল দা শার্কের কাছাকাছি গিয়ে ওঁদের নাগাল পেলাম। বললাম, "গুড মর্নিং ডঃ মৈত্র!"

ডঃ মৈত্র আস্তে বললেন, "মর্নিং!"

"আপনারা লাইটহাউস দেখতে গিয়েছিলেন!"

আশিস কী বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিল। ডঃ মৈত্র তাকে ইশারায় চলে যেতে বললেন। সে চলে গেল। পিচরাস্তার মোড়ে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেপ্টেম্বরের

ঝলমলে সূর্য হঠাৎ মেঘে চাপা পড়ল। ডঃ মৈত্র আমার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে বললেন, "একটা গণ্ডগোলে পড়েছি কর্নেল সরকার!"

"আপনার স্ত্রী—"

আমার কথার ওপর ডঃ মৈত্র বললেন, "ঘুম থেকে উঠে তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না। হোটেলের কেউ তাকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। অবশ্য আমার স্যুটের পেছনে বাউন্ডারি ওয়ালের খানিকটা অংশ ভাঙা। একজন মানুষ অনায়াসে গলে যেতে পারে।"

"রাত্রে কি আপনাদের মধ্যে কোনও—সরি! আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো অনুচিত!"

ডঃ মৈত্র আস্তে গম্ভীর মুখে বললেন, "আপনি প্রশ্নটা তুলতেই পারেন। কারণ আপনি একজন রহস্যভেদী। গত রাতে আপনার ঘর থেকে ফেরার পর অমিতার সঙ্গে একটু তর্কাতর্কি বেধেছিল। কী নিয়ে, তা-ও বলা দরকার। অমিতা আমার পেপারস হাতড়ে কিছু খুঁজছিল। আশিস ইশারায় সেটা বুঝিয়ে না দিলে জানতে পারতাম না। এই ছেলেটা আমার প্রহরী বলতে পারেন। সে পাশের সিঙ্গলরুমে থাকে।"

"আশিস—" একটু অবাক হয়ে বললাম, "আশিস কি বোবা-কালা?"

"ঠিক ধরেছেন। কিন্তু সে মূক-বধির স্কুলে পড়াশুনা করেছে। সাইন-ল্যাংগুয়েজে কথা বলতে পারে। ওই সাইন-ল্যাংগুয়েজ আমিও জানি।"

"হুঁ, আশিস কীভাবে জানল, মিসেস অমিতা আপনার পেপার হাতড়ে কিছু খুঁজছিলেন?"

"আশিস তখন আমাদের স্যুটে ছিল। বোবাকালা বলে অমিতা তাকে গ্রাহ্য করেনি।" ডঃ মৈত্র পা বাড়ালেন হোটেলের দিকে। "আমি অবশ্য অমিতাকে সেজন্য তত কিছু বলিনি। শুধু বলেছিলাম, কোনও পেপার দরকার হলে আমাকে বললেই তো হয়। তার কাছে আমার গোপনীয় কিছু থাকতে পারে না। অমিতা কেন কে জানে, ভীষণ চটে গেল।"

"আপনারা লাইটহাউসের দিকে ওঁকে খুঁজতে গেলেন কেন?"

ডঃ মৈত্র নিচের দিকে দৃষ্টি রেখে হাঁটছিলেন। বললেন, "কাল বিকেলে আশিসকে নিয়ে অমিতা ওখানে গিয়েছিল। তাই ভাবলাম—যাই হোক, মর্নিং সেশনে যাচ্ছেন তো?"

"নাহ্! আমি এ বেলা প্রজাপতির ছবি তুলতে বেরুব। কেয়াবনের দিকটায় অনেক প্রজাপতি দেখেছি।"

"কখন বেরুবেন?"

"ব্রেকফাস্ট করার পর।"

"আমি মর্নিং সেশন মিস করব না। আর মিনিট পনের দেরি। আপনি কাইন্ডলি দেখবেন, যদি অমিতা ওদিকে গিয়ে থাকে।"

ওঁর কথার ওপর বললাম, "অবশ্যই।"...

ব্রেকফাস্ট করে সাড়ে আটটায় বেরোলাম। সেই জুতো পড়ে থাকা জায়গাটা তন্নতন্ন

খুঁজে আর কিছু দেখতে পেলাম না। ঝাউবনে উঠে কিছুটা চলার পর হঠাৎ কী একটা চকচকে জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। জিনিসটা একটা ঝাউগাছের গোড়ায় পড়ে আছে। রোদে চকচক করছে। কাছে গিয়ে দেখি, একটা ঘড়ি। চেন খুলে পড়ে গেছে কারও হাত থেকে। ঘড়িটা জাপানী এবং বেশ দামী। পুরুষদের মতো ঘড়ি মেয়েরাও অনেকে আজকাল পরেন।

পকেটে চালান করে চারপাশটা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলাম। টের পেলাম আমি উত্তেজিত। প্রায় আধঘণ্টার বেশি প্রখর চোখে খোঁজাখুঁজি করে হাল ছেড়ে দিলাম। এতক্ষণে প্রশ্নটা তীব্র হয়ে বিঁধছিল—অধ্যাপিকা অমিতা দাশগুপ্তাকে কি খুন করা হয়েছে গতরাতে?

দু কিলোমিটার দূরে একটা নদী এসে সমুদ্রে মিশেছে। সেখানে বার্ডস স্যাংচুয়ারি। অনেকক্ষণ পাখি দেখে এবং ফিল্মের একটা রোল প্রায় শেষ করে ছবি তুলে পিচ রাস্তা ধরে ফিরছিলাম হোটেলের দিকে। এক কিমি আসার পর ডাইনে বালিয়াড়ি ও ঝাউবনের মিলনস্থলে দেখি, কয়েকটা শকুন বসে আছে। থমকে দাঁড়ালাম। আকাশে আরও এক ঝাঁক শকুন। ডানার শব্দ করে একে-একে এসে বসছে। ব্যাপারটা দেখতে হয়।

এখানে কয়েকটা কাঠবাদামের গাছ আছে। শকুনগুলো সেইসব গাছে বসে আছে। গুল্মঝোপের ভেতর অতি কষ্টে এগিয়ে গেলাম। খানিকটা জায়গা বালিতে ভর্তি। কোনও গাছ বা এক চিলতে ঘাসও গজায়নি। একদঙ্গল কুকুর বালি আঁচড়াচ্ছে। প্রজাপতি ধরা নেটের স্টিক দিয়ে কুকুরগুলোকে তাড়ালাম। তারপর থমকে দাঁড়ালাম।

একরাশ কালো চুল বেরিয়ে পড়েছে। দেখে আমার মাথার ভেতর ঠাণ্ডা হিম ঢিল-গড়িয়ে গেল। পিঠের কিটব্যাগ থেকে ভাঁজ করা ছুরি বের করলাম। অনেক কাঁটাঝোঁপ কেটে ভালো করে পুঁতে দিলাম চারদিকে।

হোটেলে ফিরেই ফোন করলাম পুলিশকে। তখন সেমিনার পুরোদমে চলেছে সরকারি মেরিন হাউসের হলঘরে। সাড়ে এগারোটা বাজে। পুলিশ অফিসার পি আর দাস আমার পরিচিত। ব্যাপারটা আমার কাছে জেনে নিয়ে জিপ ছুটিয়ে অকুস্থলে গেলেন। আমি গেলাম না। বোবাকালা যুবকটিকে খুঁজছিলাম। একটু পরে বাইনোকুলারে দেখলাম সে সি-বিচে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে চলে গেলাম।

বোবা-কালাদের দু'হাতের আঙুলের সাহায্যে সাইন-ল্যাংগুয়েজ শেখানো হয়। আমার সব বিষয়ে একটু বাতিক বা নেশা আছে। দেখা যাক, ওর সঙ্গে চিহ্ন-ভাষায় কথা বলতে পারি কি না। আমার নিজের প্রতিভায় নিজেই অবাক হলাম। সে চমৎকার সাড়া দিল। সেই চিহ্ন-ভাষায় আলাপটা এরকম।

"তোমার নাম কি আশিস?"

"হ্যাঁ। আপনি কে?"

"কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।" নামটা বোঝাতে অনেক কসরত করতে হলো। মিলিটারি ব্যাপারটা সে ভালোই বুঝল। তবে অবসরপ্রাপ্ত জেনে একটু হতাশ হলো।

সে আমার সম্পর্কে আরও জানতে চাইছিল। তাকে সরাসরি অধ্যাপিকার কথা বললাম। সে বলল, "উনি হয়তো রাগ করে চলে গেছেন।"

কিটব্যাগ থেকে একপাটি স্লিপার, শাড়ির টুকরো এবং ঘড়িটা দেখালাম। অমনি ও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সাইন-ল্যাংগুয়েজ ছেড়ে গলার ভেতর অদ্ভুত শব্দ করতে থাকল। তারপর দৌড়ে চলে গেল। পিচ রাস্তায় গিয়ে সে সেমিনার হলের দিকে ছুটল। আমি হতাশ হয়ে নিজের স্যুটে ফিরে এলাম।...

সারা চদনপুর-অন-সি ভেঙে পড়েছিল। সবখানে ভিড়, জটলা, জল্পনাকল্পনা। ডঃ মৈত্রের অভিযোগে পুলিশ ডঃ ব্রহ্মকে গ্রেফতার করল। গ্রেফতারের অবশ্য ভিত্তি ছিল। ডঃ ব্রহ্মের ঘরে ডঃ মৈত্রের হারিয়ে যাওয়া একটা অ্যান্টি-ড্রাগ মানসিকতা তৈরির ওষুধের ফরমুলা পাওয়া গেছে। ডঃ ব্রহ্ম তীব্র আপত্তি জানিয়ে বলছিলেন, "ডঃ মৈত্র ওটা আশিস বা ওঁর স্ত্রীকে দিয়ে পাচার করেছেন।" কিন্তু আশিস বোবাকালা। সে সাইন-ল্যাংগুয়েজে জানাল, কাজটা সে করেনি। আর মৃতা অমিতার মুখ থেকে জানার কোনও উপায় নেই। তবে আরও সাংঘাতিক প্রমাণ হলো, ঘড়িটা ডঃ ব্রহ্মেরই। ডঃ মৈত্র আমাকে সাক্ষী মেনে রাতের ঝাউবনে আলোর সংকেতের কথাও পুলিশকে জানিয়েছিলেন।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে দেখি, ডঃ মৈত্র এবং আশিস লাইটহাউসের দিকে চলেছেন। অনেকটা ঘুরে বালিয়াড়ির আড়ালে ওদের অনুসরণ করলাম।

লাইটহাউসের নিচেই সমুদ্র। অনেক পাথর পড়ে আছে। তাই ওখানে ব্রেকওয়াটারের গর্জন এবং আস্ফালন প্রচণ্ড। হঠাৎ দেখলাম, আশিস ডঃ মৈত্রকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল। ডঃ মৈত্র টাল খেয়ে একপাশে পড়লেন। তারপর দৌড়ে পালিয়ে এলেন।

আশিস চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

এর কী ব্যাখ্যা হতে পারে? ডঃ মৈত্র চলে আসার পর আমি আশিসের কাছে গেলাম। আমাকে দেখে সে সাইন-ল্যাংগুয়েজে বলল, "ডঃ মৈত্র আমাকে একটু হলেই নিচে ফেলে দিতেন।"

অবাক হয়ে বললাম, "কিন্তু আমি তো দেখছিলাম তুমিই ওঁকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলার চেষ্টা করছিলে!"

"আপনি ভুল দেখেছেন। উনি আমাকে ফেলে দিচ্ছিলেন। আমি বাধা দিয়েছি।"

"আশিস! তুমি কি অমিতাকে ভালোবাসতে?"

আশিস হকচকিয়ে গেল এই আকস্মিক প্রশ্নে। একটু পরে তার চোখে জল দেখলাম। সে বলল, "হ্যাঁ।"

"উনি তো তোমার চেয়ে বয়সে বড়।"

"না। আমরা প্রায় সমবয়সী।" সে বয়সও বুঝিয়ে দিল। তার বয়স আটাশ বছর। অমিতাকে একটু বয়স্ক দেখালেও তার বয়স সাতাশ বছর ন-দশ মাসের বেশি নয়। আশিস আরও বলল, "তার সঙ্গে অমিতার বিয়ের কথা ছিল। অমিতার ইচ্ছা সেটা। কিন্তু অমিতার মা বোবাকালার সঙ্গে সুশিক্ষিতা মেয়ের বিয়েতে আপত্তি তোলেন। আত্মহত্যার ভয় দেখান। তাই আমিই অমিতাকে নিবৃত্ত করেছিলাম। দু'মাস আগে

ডঃ মৈত্রের সঙ্গে অমিতার আলাপ-পরিচয় হয়। আমিই অমিতাকে বলি, ওঁকে বিয়ে করো। তোমার বিদেশে গিয়ে রিসার্চের সুযোগ হবে। তারপর অমিতার কথায় আমাকে ডঃ মৈত্র ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নেন।"

"আশিস! রাতে ঝাউবনে কোনও আলো দেখেছ? গত রাত এবং আগের রাতে?"

"না।"

"ডঃ ব্রহ্মের সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?"

"নাক-গলানো লোক। খুব নীতিবাগীশ।"

"অমিতাকে কি তিনি খুন করতে পারেন?"

একটু চুপ করে থেকে আশিস জানাল, তেমন কোনও কারণ সে খুঁজে পাচ্ছে না।

"তোমাদের গোপনে পরস্পরকে চুমু খেতে দেখেছেন।"

"তাকে কী? বেশ করেছি।"

"ডঃ মৈত্র ঈর্ষাবশে অমিতাকে খুন করতে পারেন কি?"

"জানি না। তবে ডঃ মৈত্র ভীতু লোক। অমিতাকে ভয় করে চলতেন।"

একটা চুরুট ধরিয়ে নিতে অসুবিধা হচ্ছিল। প্রচণ্ড বাতাস। লাইটহাউসের আড়ালে গেলাম। সেই সময় আশিস হনহন করে চলে গেল।

ডঃ ব্রহ্ম কি উগ্রনীতিবাগীশ বলেই অমিতাকে সহ্য করতে পারছিলেন না? নাহ্, এই তুচ্ছ কারণে কেউ নরহত্যা করতে পারে না। দ্বিতীয় এবং খাঁটি কারণ হলো, অ্যান্টি-ড্রাগ ওষুধ তৈরির ফরমুলা ডঃ মৈত্রের ঘর থেকে চুরি করার সময় সম্ভবত অমিতা দেখে ফেলেছিলেন ডঃ ব্রহ্মকে?...

সেমিনার বন্ধ হয়ে গেছে। পণ্ডিতজনেরা সবাই লাঞ্চের পর বাসে বা নিজের গাড়িতে ফিরে গেছেন। ডঃ মৈত্রকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, আশিসকে খুঁজে পাচ্ছেন না এবং তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন। পুলিশকে জানাবেন ভাবছেন।

লাঞ্চের পর একটু জিরিয়ে নিয়ে থানায় গেলাম। পুলিশ অফিসার মিঃ দাস আমাকে সম্ভাষণ করে বললেন, "হাই ওল্ড বস! আপনিই যেখানেই যান, সেখানেই ডেডবডি পড়ে বলে পুলিশমহলে কিংবদন্তি চালু আছে। আশা করি, খুনখারাপির গন্ধ পেয়ে চন্দনপুর-অন-সিতে হাজির হননি?"

"নাহ্। সেমিনারে আমাকে যোগ দিতে অনুরোধ করেছিল ডঃ ব্রহ্ম।"

"কর্নেল! প্লিজ, একটু ঝেড়ে কাসুন।"

"কিছু বুঝতে পারছি না মিঃ দাস। আমি ডঃ ব্রহ্মের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"এখনই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওঁকে এখন জেরা করা হচ্ছে!"

কিছুক্ষণ পরে হাজতে ঢুকলাম। ডঃ ব্রহ্ম গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে হাউমাউ করে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেললেন।

বললাম, "ডঃ ব্রহ্ম আপনি একজন পণ্ডিত মানুষ। ভেঙে পড়া আপনার শোভা পায় না! আমার প্রশ্নের জবাব দিন। প্লিজ, যা বলবেন, সত্য বলবেন।"

"বলুন, কী জানতে চান।" ডঃ ব্রহ্ম চোখ মুছে বললেন, "আমি মিথ্যাবাদী নই।"

"আপনার ঘড়ি ওখানে গেল কী করে?"

"ঘড়িটা গতরাতে আপনার ঘরে যাওয়ার সময় টেবিলে খুলে রেখেছিলাম। ফিরে এসে পাইনি। কিন্তু এ নিয়ে হইচই করিনি। শুধু ম্যানেজারকে বলেছিলাম কথাটা। ম্যানেজার বলেছিলেন, এমন অভিযোগ এই প্রথম পেলাম। আমাদের কর্মচারীরা বিশ্বস্ত। তবে জিজ্ঞেস করে দেখব।"

"ঝাউবনে রাতে কোনও আলো দেখেননি বলছিলেন আমাকে।"

"হ্যাঁ কোনও আলো দেখিনি।"

"কিন্তু ডঃ মৈত্র দেখেছিলেন।"

"দেখতে পারে।"

"ওঁর ওষুধের ফরমুলা আপনার ঘরে গেল কী করে?"

"বলেছি। আশিস বা অমিতা দাশগুপ্তা—" বলে চুপ করলেন ডঃ ব্রহ্ম। একটু পরে বললেন, "মনে পড়ছে। গতকাল ইভনিংয়ে অমিতা এসেছিলেন আমার সঙ্গে আজ সকালের সেশন নিয়ে আলোচনা করতে। তখনই রেখে যেতে পারেন স্বামীর হুকুমে।"

"কে অমিতাকে খুন করে পুঁতে রেখে আসতে পারে বলে আপনার ধারণা?"

"ডঃ মৈত্র।"

"কেন?"

"স্ত্রী ব্যভিচারিণী। এটাই কি যথেষ্ট কারণ নয়?"

"থ্যাংকস ডঃ ব্রহ্ম! চলি।"...

বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে সেখানে গেলাম, যেখানে অমিতার লাশ পুঁতে রাখা হয়েছিল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে—হয়তো ইনটুইশন, হঠাৎ মনে হলো, কেউ আমাকে দেখছে। তখনই বাইনোকুলারে চারদিক খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম। সামনে কিছু দূরে বাঁদিকে কেয়াঝোপের আড়ালে কেউ বসে আছে। সে আমার দিকে ঘুরলে দেখি, আশিস। তার হাতে একটা ভোজালি। চমকে উঠলাম।

একটা ঘন ঝোপের আড়ালে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়লাম।

একটু পরে দেখি হনহন করে ডঃ মৈত্র এগিয়ে আসছেন ঝাউবনের দিক থেকে। তাঁর হাতে রিভলভার। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাকে খুঁজছেন যেন। খুঁজতে খুঁজতে নিচের জঙ্গলে নামলেন। তারপর যেখানে অমিতার লাশ পোঁতা ছিল, তার একটু তফাতে গুঁড়ি মেরে বসে জুতোর ডগা দিয়ে বালি সরাতে থাকলেন। একটা ব্রিফকেস বেরুল। ব্রিফকেসটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, আশিস ভোজালি হাতে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল। ডঃ মৈত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "ডঃ মৈত্র।"

দুজনেই ঘুরলেন আমার দিকে। আশিস আমাকে দেখে পালাতে যাচ্ছিল। ডঃ মৈত্র তার দিকে রিভলভার তাক করলে আবার বললাম, "ডঃ মৈত্র!"

আশিস পালিয়ে গেল। ডঃ মৈত্র বললেন, "দেখুন! দেখুন শয়তানটার কীর্তি!

আমাকে খুন করার জন্য এখানে ওত পেতে বসেছিল। কারণ ও জানত, অমিতার হারানো ব্রিফকেস খুঁজতে আমি এখানে আসব! তবে আমিও তৈরি হয়ে এসেছিলাম।”

“রিভলভারটা আমাকে দিন ডঃ মৈত্র। নইলে আপনার রিভলভার ধরা হাতে আমি গুলি করব।”

আমার হাতে রিভলভার দেখে ডঃ মৈত্র তাঁর রিভলভার ফেলে দিলেন। এগিয়ে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে কিটব্যাগে ঢোকালাম। তারপর ডঃ মৈত্রের শার্টের কলার খামচে ধরলাম আচমকা। ডঃ মৈত্র বললেন, “এ কী!”

“ডঃ মৈত্র! স্ত্রী হত্যার অভিযোগে আপনাকে গ্রেফতার করা হবে। চুপচাপ আমার সঙ্গে চলুন।”

“আশ্চর্য! কী বলছেন আপনি?”

“ঝাউবনে আলোর সিগন্যাল দিয়ে আপনি আমাকে বোকা বানাতে চেয়েছিলেন। অমিতার অ্যান্টি-ড্রাগ ওষুধের ফরমুলা চুরির জন্য আপনি তাকে বিয়ে করেছিলেন। জানতেন, আপনার স্ত্রী আশিসের প্রতি আসক্ত। তবু আপনার মনে বিকার ঘটেনি। গত রাতে ঝাউবনে আলো জ্বেলে তারপর আপনি আমার কাছে গিয়েছিলেন। তারপর অমিতাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ইঞ্জেকশন করে মেরে তার বডি বাউন্ডারি ওয়ালের ভাঙা জায়গা দিয়ে বাইরে ফেলেন। সেখানে কিছু চিহ্ন আছে।”

মিঃ দাসকে আভাস দিয়ে এসেছিলাম। তাই কথা বলে সময় কাটাচ্ছিলাম। পুলিশের জিপ এসে রাস্তায় থামল। সদলবলে ছুটে এলেন মিঃ দাস। ডঃ মৈত্রের হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দিলেন।

বললেন “ব্রিফকেসটা এখানে পুঁতে রেখে আরও ধোঁকা দিতে চেয়েছিলেন মৈত্র মশাই। তাঁর ইচ্ছা ছিল, পুলিশ এটা আবিষ্কার করুক। তা হলে ডঃ ব্রহ্মের ঘাড়ে দোষটা পড়বে। আসলে ডঃ ব্রহ্মের ঘরে পাওয়া ফরমুলাটা বোগাস। এই ব্রিফকেসেই অমিতার আসল ফরমুলা আছে। এটা অমিতারই ব্রিফকেস।”

এতক্ষণে আশিস এল। হাতে ভোজালি নেই। একপাটি স্লিপার। চোখে জল।...

---